

مَذَانِيَّةِ الْبَرِّ بِهَدْوَرِ مُؤْمِنِيَّةِ الْقَعْدَةِ

তাফহীমুল  
কুরআন

সাহিয়েদ  
আবুল আলা  
মওদুদী  
রহ.

### অতিভিত্তিক সূরা-সূচী

নং	নাম	খণ্ড	পৃষ্ঠা	পারা
১।	আল ফাতেহা	১ম	৩৯	১ম
২।	আল বাকারাহ	..	৪৪	১ম-৩য়
৩।	আলে ইমরান	২য়	১	৩য়-৪থ
৪।	আল নেসা	..		৪থ-৬ষ্ঠ
৫।	আল মা-য়েদাহ	৩য়	১	৬ষ্ঠ-৭ম
৬।	আল আন'আম	..	৯৫	৭ম-৮ম
৭।	আল জা'রাফ	৪য়	১	৮ম-৯ম
৮।	আল আনফাল	..	১৩০	৯ম-১০ম
৯।	আত্ তাওবা	৫ম	১	১০ম-১১শ
১০।	ইউনুস	..	১০৪	১১শ
১১।	হুদ	৬ষ্ঠ	১	১১শ-১২শ
১২।	ইউসুফ	..	৬৬	১২শ-১৩শ
১৩।	আর্ রা�'দ	..	১৩৮	১৩শ
১৪।	ইব্রাহীম	..	১৬৯	১৩শ
১৫।	আল হিজর	৭ম	১	১৩শ-১৪শ
১৬।	আন্ নাহল	..	২৭	১৪শ
১৭।	বনী ইসরাইল	..	৯৫	১৫ শ-১৬শ
১৮।	আল কাহফ	..	১৭৫	১৫শ-১৬শ
১৯।	মারিয়াম	৮ম	১	১৬শ
২০।	তা-হা	..	৩৫	১৬শ
২১।	আল আবিয়া	..	১০৩	১৭শ
২২।	আল হাজ্জ	..	১৬৪	১৭শ
২৩।	আল মু'মিনুন	৯ম	১	১৮শ
২৪।	আন নূর	..	৫৮	১৮শ
২৫।	আল ফুরকান	১০ম	১	১৮শ-১৯শ
২৬।	আশ শ'আরা	..	৫৩	১৯শ
২৭।	আন নাম্র	..	১৪৭	১৯শ-২০শ
২৮।	আল কাসাস	..	২১৬	২০শ
২৯।	আল 'আনকাবৃত	১১শ	১	২০শ-২১শ

৩০।	আর রূম	„	৫৯	২১শ
৩১।	লুকমান	„	১০৬	২১শ
৩২।	আস্ সাজদাহ	„	১৩৫	২১শ
৩৩।	আল আহ্যাৰ	১২শ	১	২১শ-২২শ
৩৪।	আস সাৰা	„	১৪৯	২২শ
৩৫।	ফাতিৰ	„	১৯৯	২২শ
৩৬।	ইয়া-সীন	১৩শ	১	২২শ-২৩শ
৩৭।	আস্ সা-ফ্যা-ত	„	৩৭	২৩শ
৩৮।	সা-দ	„	৮২	২৩শ
৩৯।	আয যুমাৰ	„	১২৬	২৩শ-২৪শ
৪০।	আল মু'মিন		১৬৩	২৪শ
৪১।	হা-মীম আস সাজদাহ	১৪শ	১	২৪শ-২৫শ
৪২।	আশ শূৰা	„	৪৪	২৫শ
৪৩।	আয যুখৱফ	„	৯৬	২৫শ
৪৪।	আদ দুখান	„	১৩৫	২৫শ
৪৫।	আল জাসিয়াহ	„	১৫৬	২৫শ
৪৬।	আল আহক্কাফ	„	১৭৮	২৬শ
৪৭।	মুহাম্মাদ	১৫শ	১	২৬শ
৪৮।	আল ফাতেহ	„	৩০	২৬শ
৪৯।	আল হজুৱাত	„	৬৫	২৬শ
৫০।	কৃষ্ণ	„	১০৫	২৬শ
৫১।	আয যারিয়াত	„	১৩০	২৬শ-২৭শ
৫২।	আত্ তূর	„	১৬০	২৭শ
৫৩।	আন্ নাজুম	১৬শ	১	২৭শ
৫৪।	আল কুমার	„	৪৩	২৭শ
৫৫।	আর রাহমান	„	৬১	২৭শ
৫৬।	আল ওয়াকিয়া	„	৯৩	২৭শ
৫৭।	আল হাদীদ	„	১১৯	২৭শ
৫৮।	আল মুজাদাহ	„	১৬২	২৮শ
৫৯।	আল হাশেব	১৭শ	১	২৮শ
৬০।	আল মুমতাহানা	„	৫৫	২৮শ
৬১।	আস সফ	„	৮৯	২৮শ
৬২।	আল জুমআ	„	১২১	২৮শ
৬৩।	আল মুনাফিকুন	„	১৫১	২৮শ

৬৪।	আত তাগাবুন	১৬৭	২৮শ
৬৫।	আত তালাক	১৯৮	২৮শ
৬৬।	আত তাহরীম	২৩২	২৮শ
৬৭।	আল মূলক্.	১৮শ	২৯শ
৬৮।	আল কলম	১৮	২৯শ
৬৯।	আল হাক্কাহ	৩৬	২৯শ
৭০।	আল মা'আরিজ	৪৪	২৯শ
৭১।	বৃহ	৫৬	২৯শ
৭২।	আল জিন	৬৭	২৯শ
৭৩।	আল মুয়াম্বিল	৮২	২৯শ
৭৪।	আল মুদ্দাস্সির	৯৫	২৯শ
৭৫।	আল কিয়ামাহ	১১৭	২৯শ
৭৬।	আদ দাহর	১৩৭	২৯শ
৭৭।	আল মুরসালাত	১৬৭	২৯শ
৭৮।	আন নাবা	১৯শ	১
৭৯।	আন নায়িয়াত	১৬	৩০শ
৮০।	আবাসা	৩১	৩০শ
৮১।	আত তাকবীর	৪৩	৩০শ
৮২।	আল ইনফিতার	৫৩	৩০শ
৮৩।	আল মুতাফ্ফিফীন	৬০	৩০শ
৮৪।	আল ইনশিকাক	৬৭	৩০শ
৮৫।	অল বুরুজ	৭৪	৩০শ
৮৬।	আত তারেক	৮৩	৩০শ
৮৭।	আল আ'লা	৯০	৩০শ
৮৮।	আল গাশিয়া	১০০	৩০শ
৮৯।	আল ফজর	১০৬	৩০শ
৯০।	আল বালাদ	১১৭	৩০শ
৯১।	আল শামস	১৩০	৩০শ
৯২।	আল লাইল	১৪১	৩০শ
৯৩।	আদ দুহা	১৫০	৩০শ
৯৪।	আলাম নাশ্রাহ	১৫৯	৩০শ
৯৫।	আত্তীন	১৬৭	৩০শ
৯৬।	আল আলাক	১৭৫	৩০শ
৯৭।	আল কাদর	১৮৪	৩০শ

১৮। আল বাইয়েনাহ	„	১৯০	৩০শ
১৯। আল যিলয়াল	„	১৯৮	৩০শ
১০০। আল আদিয়াত	„	২০৮	৩০শ
১০১। আল কারিয়া	„	২১৪	৩০শ
১০২। আত তাকাসুর	„	২১৮	৩০শ
১০৩। আল আসর	„	২২৪	৩০শ
১০৪। আল হমায়া	„	২৩২	৩০শ
১০৫। আল ফীল	„	২৩৭	৩০শ
১০৬। কুরাইশ	১৯শ	২০১	৩০শ
১০৭। আল মাউন	„	২০৮	৩০শ
১০৮। আল কাওসার	„	২৬৮	৩০শ
১০৯। আল কাফেরুন	„	২৮২	৩০শ
১১০। আন নসর	„	২৯৫	৩০শ
১১১। আল লাহাব	„	৩০৩	৩০শ
১১২। আল ইখলাস	„	৩১৩	৩০শ
১১৩। আল ফালাক	„	৩২৮	৩০শ
১১৪। আন নাস	„	৩৫৭	৩০শ

## অনুবাদকের কথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহির তাফহীমুল কুরআন একটি অনন্য সাধারণ তাফসীর গ্রন্থ। কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দু'টি অংশই এখানে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অনুবাদের ক্ষেত্রে গতানুগতিক শান্তিক তরঙ্গমার পদ্ধতি পরিহার করে তিনি ভাবার্থ প্রকাশমূলক স্বচ্ছ অনুবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

এ ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য সর্বজন বিদিত। ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার সাথে সাথে উদ্ভূত ভাষায় ও সাহিত্যে তিনি যে উচ্চস্থানে বিরাজ করছেন তার কারণে, তাঁর এই স্বচ্ছ অনুবাদ একটি সাফল্যের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মূলত তাঁর উচ্চপর্যায়ের ইন্দৃষ্টি যোগ্যতার কারণেই এটা সভ্যবপর হয়েছে। কুরআনের এই স্বচ্ছ অনুবাদকে বাংলায় ভাষাস্তরিত করার সময় আমরা ভাষার প্রাঞ্জলতা ও গতিশীলতার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রেখেছি। যথাসম্ভব সহজ ভাষায় একে ঢালবার চেষ্টা করেছি। সেখক যে উদ্দেশ্যে কুরআনের এ অনুবাদ করেছেন বাংলাতেও তাঁর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার দিকে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি অথবা পাণ্ডিত্য প্রকাশের পদ্ধতি অবলম্বন না করে পাঠকের স্বদয়ের অঙ্ককার কৃষ্ণতাতে আলোক সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। কুরআনের মূল বক্তব্য সুন্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং কুরআনকে হিদায়াতের গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপিত করাই তাঁর লক্ষ। আধুনিক জীবন যে জটিলতা ও অঙ্গুত্বের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে কুরআনের মতো মহাগ্রন্থ মুসলিমানদের কাছে থাকা সত্ত্বেও এবং হাজার হাজার লাখে লাখে মুসলিমান প্রতিদিন এ গ্রন্থটি পাঠ ও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জীবনে কোন বিপুর সূচিত হতে পারছে না এবং তারা কুরআনের ভিত্তিতে কোন গতিশীল, সমৃদ্ধ ও অভিশক্তি সম্পর্ক সমাজ গঠনে আগ্রহী ও উদ্যোগী হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে তাফহীমুল কুরআন বিরাট সাফল্যের মাপকাটি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাফহীমের একজন সচেতন মুসলিম পাঠক কুরআনের দাওয়াত নিজের স্বদয়ের গভীরে অনুভব করতে পারেন। তাফহীম পাঠের সময় একজন পাঠক ইসলামী আন্দোলনের সমস্ত চড়াই-উত্তরাই, খাড়ি ও উপত্যকার গহীন পথ অতিক্রম করতে থাকেন, যে পথে কুরআন নায়িলের সময় নবী এবং তাঁর সাহাবীগণ অতিক্রম করেছিলেন। উপরন্তু পাঠক নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের একজন সক্রিয় নায়কের ভূমিকায় অনুভব করতে থাকেন। তিনি মনে করতে থাকেন, কুরআন যেন এখনি এই মুহূর্তে তাঁরই জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য নায়িল হয়েছে। কুরআনের দাওয়াতের এই প্রাণবন্ত উপস্থাপনা তাফহীমুল কুরআনের একক বৈশিষ্ট্য। আধুনিক যানসে কুরআনের বক্তব্য ও দাওয়াতের নকশা গভীরভাবে ঘোদাই করার জন্য হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য ও গবেষণামূলক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তাফহীমের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাইবেলের যথোপযুক্ত ও সহায়ক ব্যবহার। প্রাচীন তাফসীরকারদের কেউ কেউ কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাইবেলের যত্নত্ব ব্যবহার করে অথবা বিভূতিনা ও জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। এদিক দিয়ে

তাফহীমে বাইবেলের ব্যবহার যথেষ্ট সংযত ও যুক্তিশাহু। আর আমাদের জীবনে যে বিষয়টির কোন প্রয়োগিক গুরুত্ব নেই তেমন কোন বিষয় নিয়ে অথবা শান্তিক ও তাত্ত্বিক গবেষণায় তাফহীমে কালঙ্কেপন করা হয়নি।

উলামায়ে মুতাকান্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীনের মধ্যে প্রচলিত কুরআন ব্যাখ্যার স্বীকৃত মূল নীতিগুলোই মাওলানা মওদুদী তাঁর এই গ্রন্থে অনুসরণ করেছেন। এর বাইরে নতুন কোন নীতি তিনি উন্নাবন করেননি বা কোথাও কোন মনগড়া ব্যাখ্যাও তিনি দেননি। তাফহীমের জনপ্রিয়তা অনুমান করার জন্য কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রায় অর্ধ ডজন বড় বড় ভাষায় এ গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে।

১৩৬১ হিজরীর মহররম মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৯৪২) মাওলানা মওদুদী তাঁর এই বিশ্ববিদ্যালয় তাফসীরটি লেখার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর সাধনার পর ১৯৭২ সালে ছয় বৎসরে প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ এ গ্রন্থটির কাজ তিনি সমাপ্ত করেন।

বাংলায় এ পর্যন্ত প্রায় তিরিশটিরও বেশী কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের সংখ্যা দশটির কম নয়। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর ছয়টি। এ ছয়টির মধ্যে উদ্বৃত্ত থেকে অনুদিত হয়েছে তাফহীমুল কুরআন সহ তিনটি সুবিধ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থগুলো সবই বাংলায় বহুল পঠিত জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ বাংলা ভাষায় কুরআনী জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করেছে।

## প্রসঙ্গ কথা

উলামা ও কুরআন গবেষকদের প্রয়োজন পূর্ণ করা এ তাফসীরটির উদ্দেশ্য নয়। অথবা আরবী ভাষা ও দীনী তা'লীমের পাঠ শেষ করার পর যারা কুরআন মজীদের গভীর অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন করতে চান তাদের জন্যও এটি লেখা হয়নি। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ তাদের এ প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম। এ তাফসীরটির মাধ্যমে আমি যাদের খেদমত করতে চাই তাঁরা হচ্ছেন মাঝারি পর্যায়ের শিখিত লোক। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাদের তেমন কোন দখল নেই। কুরআনী জ্ঞানের যে বিরাট ভাগীর আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে তা থেকে লাভবান হবার সামর্থ ও যোগ্যতা তাদের নেই। সর্বাংগে তাদের প্রয়োজনই আমার সামনে রয়েছে। এ কারণে তাফসীর সংক্রান্ত অনেক গভীর তত্ত্ব-আলোচনায় আমি হাত দিইনি। ইল্মে তাফসীরের দৃষ্টিতে সেগুলো অত্যধিক গুরুত্বহীন কিন্তু এই শ্রেণীটির জন্য অপ্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমার সামনে রয়েছে সেটি হচ্ছে, একজন সাধারণ পাঠক যেন এ কিতাবটি পড়ার পর কুরআনের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ দ্বার্থহীনভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। কুরআন তার ওপর যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে চায় এ কিতাবটি পড়ার পর তার ওপর যেন ঠিক তেমনি প্রভাব পড়ে। কুরআন পড়তে গিয়ে যেখানে তার মনে সন্দেহ-সংশ্য জাগবে এবং পুরু ভেসে উঠবে সেখানে এ কিতাবটি সাথে সাথেই তার জবাব দিয়ে যাবে এবং সকল প্রকার সন্দেহের কালিমা মুক্ত করে তার মনের আকাশকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও নির্মল করে তুলবে। সংক্ষেপে এতটুকু বলতে পারি, এটা আমার একটা প্রচেষ্টা। এতে আমি কৃতটুকু সফল হয়েছি তা বিদ্যম্ভ পাঠকগণই বলতে পারবেন।

## কুরআনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশ

কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি এখানে শাস্তির অনুবাদের পদ্ধতি পরিহার করে স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এর পেছনে আমার শাস্তির অনুবাদ পদ্ধতিকে ভুল মনে করার মত কোন ধারণা কার্যকর নেই। বরং মিলাতে ইসলামিয়ার বড় বড় মনীয়ী এবং শ্রেষ্ঠ ইসলামী জ্ঞানসম্পদ আলেমগণ বিভিন্ন ভাষায় এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। তাই এ পথে নতুন করে অগ্রসর হবার তেমন কোন প্রয়োজন আমি দেখিনি। তবে এমন কিছু প্রয়োজন আছে যা শাস্তির অনুবাদে পূর্ণ হয় না এবং হতে পারে না। স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশের মাধ্যমে আমি সেগুলোকে পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি। শাস্তির অনুবাদের আসল লাভ হচ্ছে এই যে, পাঠক কুরআনের প্রতিটি শব্দের মানে জানতে পারে। প্রতিটি আয়াতের নীচে তার অনুবাদ পড়ে তার মধ্যে কি কথা বলা হয়েছে তা জানতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিটির এই লাভজনক দিকের সাথে এর মধ্যে

এমন কিছু অভাব রয়ে গেছে যার ফলে একজন আরবী অনভিজ্ঞ পাঠক কুরআন মজীদ থেকে ভালোভাবে উপকৃত হতে পারে না।

১. শাদিক অনুবাদ পড়তে গিয়ে সর্বপ্রথম রচনার গতীশীলতা, বর্ণনার শক্তি, ভাষার অলংকারিত্ব ও বক্তব্যের প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার অভাব অনুভূত হয়। কুরআনের প্রতিটি ছন্দের নীচে শাদিক অনুবাদের আকারে পাঠক এমন একটি নিষ্প্রাণ রচনার সাথে পরিচিত হয়, যা পড়ার পর তার প্রাণ মেঢে ওঠে না, গায়ের পশম খাড়া হয়ে যায় না, চোখ দিয়ে অশ্রদ্ধারা প্রবাহিত হয় না এবং তার আবেগের সমুদ্রে তরংগও সৃষ্টি হয় না। কতকগুলো নিষ্প্রাণ বাক্য পড়ার পর সে মোটেও অনুভব করে না যে, কোন কস্তুরী তার বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তিকে জয় করে হৃদয় ও মনের গভীরে নেমে যাচ্ছে। এই ধরনের কোন প্রতিক্রিয়া হওয়া তো দূরের কথা বরং অনুবাদ পড়ার সময় অনেক সময় মানুষ ভাবতে থাকে, এটি কি সেই গ্রন্থ যার একটি বাক্যের অনুরূপ একটি বাক্য রচনা করার জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল? এর কারণ, শাদিক অনুবাদ সবসময় নিরস হয়। এর মাধ্যমে মূল বিষয়ের রসাস্থাদন কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। কুরআনের মূল রচনার প্রতিটি বাক্য যে গভীর সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ অনুবাদে তার সামান্যতম অংশও অন্তরভুক্ত হতে পারে না। অবচ কুরআনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তার পরিত্র ও নিষ্কলুষ শিক্ষা এবং তার উন্নত বিষয়বস্তুর অবদান যতটুকু তার সাহিত্যের অবদানও সে তুলনায় মোটেই কম নয়। কুরআনের এ বস্তুটিই তো পাষাণ হৃদয় মানুষের দিলও মোমের মতো নরম করে দেয়। এটিই বজ্জ্বাতের মতো আরবের সমগ্র ভূখণকে কাপিয়ে তোলে। এর চরম শক্রাও এর প্রভাব বিস্তারের যাদুকরী ক্ষমতার শীর্কৃতি দিতো। তারা এর ভয়ে সদা সন্তুষ্ট থাকতো। কারণ তারা মনে করতো, যে ব্যক্তি একবার এই যাদুকরী বাণী শুনবে সে এই বাণীর কাছে তার হৃদয়-মন বিক্রি করে বসবে। কুরআনের মধ্যে যদি এই সাহিত্যের অলংকার না থাকতো এবং অনুবাদের ভাষার মতো নিরস ও অলংকারহীন ভাষায় তা নাযিল হতো, তাহলে কুরআনের পরশে আরববাসীদের হৃদয় কোন দিন উপও হতো না, কোন দিন তাদের দিল নরম হতো না।

২. শাদিক অনুবাদ প্রভাবহীন হবার আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, সাধারণত এই অনুবাদ মূলের প্রতিটি লাইনের নীচে বসানো হয়। অথবা নতুন ষ্টাইল অনুযায়ী পাতাকে মাঝখান থেকে ভালো বামে দু'ভাগে ভাগ করে একদিকে আল্লাহর কালাম এবং অন্যদিকে তার অনুবাদ বসানো হয়। শাদিক অনুবাদ পড়ার ও শেখার জন্য এ ব্যবস্থা তো ভালই। কিন্তু অন্যান্য বই একনাগাড়ে পড়ে মানুষ যেমন প্রভাবিত হয় এখানে তেমনটি হওয়া সম্ভবপর হয় না। কারণ এখানে ধারাবাহিকভাবে একটি বক্তব্য পড়ার সুযোগ নেই। বার বার মাঝখানে অন্য একটি অপরিচিত ভাষা এসে যাচ্ছে। কাজেই অনুবাদের বক্তব্য বার বার হোচ্চট খেয়ে যাচ্ছে। ইংরেজী অনুবাদগুলোয় এর চাইতেও বেশী প্রভাবহীনতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কারণ সেখানে বাইবেলের অনুকরণে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের অনুবাদ নয়র ভিত্তিক করা হয়েছে। আপনি কোন একটি চমৎকার প্রবক্ষের প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা আলাদা করে নিখুন। তারপর ওপরে নীচে তার গায়ে নৃবর লাগিয়ে পড়ুন। আপনি নিজেই অনুভব করবেন, সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে লিখিত রচনাটি যেতাবে আপনাকে প্রভাবিত করতো, এই পৃথক পৃথক বাক্যগুলোর জন্য তার অর্ধেক প্রভাবও আপনার ওপর পড়েন।

৩. শান্তিক অনুবাদের প্রভাবহীন হবার তৃতীয় একটি বড় কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআন একটি রচনার আকারে নয় বরং ভাষণের আকারে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই ভাষাভুক্তির করার সময় রচনার ভাষাকে যদি বজ্রুতার ভাষায় রূপান্তরিত না করা হয় এবং যেখানে যেমন আছে ঠিক তেমনটি রেখে হবহ অনুবাদ করা হয় তাহলে সমস্ত রচনাটিই অসংলগ্ন এবং বজ্রব্যগুলো পারস্পরিক সম্পর্কহীন হয়ে পড়বে।

৪. সবাই জানেন, কুরআন মঙ্গীদ শুরুতে শিখিত পৃষ্ঠিকারে প্রকাশিত হয়নি। বরং ইসলামী দাওয়াত প্রসংগে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি ভাষণ নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করা হতো এবং তিনি ভাষণ আকারে তা লোকদের শুনিয়ে দিতেন। প্রবক্তৃর ভাষা ও বজ্রুতার ভাষার মধ্যে স্বত্ত্বাবিকভাবে অনেক বড় পার্থক্য থাকে। যেমন প্রবক্তৃ লেখার সময় পাঠক সামনে থাকে না। তাই সেখানে কোন সংশয়ের উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়। কিন্তু বজ্রুতার সময় শ্রোতা তথা সংশয়ী নিজেই সামনে হায়ির থাকে। তাই সেখানে সাধারণত এভাবে বলার প্রয়োজন হয় না যে, “লোকেরা একথা দেখ থাকে।” বরং বজ্রুত তার বজ্রুতার মাঝখানে প্রসংগক্রমে এমন একটি কথা বলে যায় যা সন্দেহ পোষণকারীর সন্দেহ দ্বারা করতে সাহায্য করে। প্রবক্তৃর বেলায় বজ্রব্যের বাইরে কিন্তু তার সাথে নিকট সম্পর্ক রাখে এমন কোন কথা বলতে হলে তাকে প্রসংগক্রমে উল্লেখ করে কোন না কোনভাবে প্রবক্তৃর মূল বজ্রব্য থেকে আলাদা করে লিখতে হয় যাতে বজ্রব্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ না হয়। অন্যদিকে বজ্রুতার মধ্যে শুধুমাত্র বজ্রুতার ধরন ও ভঙ্গী পরিবর্তন করে একজন বজ্রুত বিরাট বিরাট প্রাসংগিক বজ্রব্য বলে যেতে পারেন। শ্রোতারা এই বজ্রব্যের মধ্যে কোথাও সম্পর্কহীনতা খুঁজে পাবে না। প্রবক্তৃ পরিবেশের সাথে বজ্রব্যের সম্পর্ক জোড়ার জন্য শব্দের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বজ্রুতায় পরিবেশ নিজেই বজ্রব্যের সাথে নিজের সম্পর্ক জুড়ে নেয়। সেখানে পরিবেশের দিকে ইঞ্জিত না করেই যেসব কথা বলা হয় তাদের মধ্যে কোন শূন্যতা অনুভূত হয় না। বজ্রুতায় বজ্রুত ও শ্রোতার বারবার পরিবর্তন হয়। বজ্রুত নিজের শক্তিশালী বজ্রব্যের মাধ্যমে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো একটি দলের উল্লেখ করে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে। কখনো তাকে মধ্যম পুরুষ হিসেবে উপস্থাপিত করে সরাসরি সংশোধন করে। কখনো বজ্রব্য পেশ করে এক বচনে। আবার কখনো বহুবচন ব্যবহার করতে থাকে। কখনো বজ্রুত নিজেই সরাসরি বলতে থাকে, আবার কখনো অন্যের পক্ষ থেকে বলতে থাকে। কখনো সে উচ্চতর ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে আবার কখনো সেই উচ্চতর ক্ষমতা নিজেই তার মুখ দিয়ে বলতে থাকে। এ জিনিসটি বজ্রুতায় একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রবক্তৃ এসে এটি সম্পূর্ণ একটি অসম্পর্কিত বস্তুতে পরিণত হয়। এ কারণে কোন বজ্রুতাকে প্রবক্তৃ আকারে সিখলে পড়ার সময় তার মধ্যে বেশ সম্পর্কহীনতা অনুভূত হতে থাকে। মূল বজ্রুতার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে পাঠকের দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে এই সম্পর্কহীনতার অনুভূতিও ততই বাড়তে থাকে। অর্জু লোকেরা কুরআন মঙ্গীদে যে অসংলগ্নতার অভিযোগ করে তার ভিত্তিও এখানেই। সেখানে ব্যাখ্যামূলক টীকার দায়মে বজ্রব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টিট করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কারণ কুরআনের আসল বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার ক্ষম-বেশী করা হারাম। কিন্তু অন্য কোন ভাষায় কুরআনের অর্থ প্রকাশ করার সময় বজ্রুতার ভাষাকে সতর্কতার সাথে প্রবক্তৃর ভাষায় রূপান্তরিত করে অতি সহজে এই অসংলগ্নতা দূর করা যেতে পারে।

৫. কুরআন মণীদের সূরাগুলো আসলে ছিল এক একটি ভাষণ। ইসলামী দাওয়াতের বিশেষ একটি পর্যায়ে একটি বিশেষ সময়ে প্রতিটি সূরা নাফিল হয়েছিল। প্রতিটি সূরা নাফিলের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট ছিল। কিছু বিশেষ অবস্থায় এই ধরনের বক্তব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তখন এগুলো নাফিল হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপট ও নাফিলের উপরাফ্ফের সাথে কুরআনের সূরাগুলো এত গভীর সম্পর্কযুক্ত যে, সেগুলো থেকে আলাদা হয়ে নিছক শান্তিক অনুবাদ কারোর সামনে রাখা হবে অনেক কথা সে একেবারেই বুঝতে পারবে না। আবার অনেক কথার উচ্চে অর্থ বুঝবে কুরআনের পূর্ণ বক্তব্য সঙ্গত কোথাও তার আয়তাধীন হবে না। আরো কুরআনের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দূর করার জন্য তাফসীরের সাহায্য নিতে হয়। কারণ মূল কুরআনে কোন কিছু বৃক্ষ করা যেতে পারে না। কিন্তু অন্য ভাষায় কুরআনের ভাব প্রকাশ করার সময় আমরা আধ্যাত্মিক কালামকে তার প্রেক্ষাপট ও নাফিলের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করতে পারি। এভাবে পাঠক তার পরিপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

৬. কুরআন সহজ সরল আরো ভাষায় অবভৌত হওয়ে সেখানে একটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রচলিত শব্দকে তার অভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছে। শান্তিক অনুবাদ করার সময় তার মধ্যে এই পারিভাষিক ভাষার ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এই ভাবধারা ফুটিয়ে না তোলা হলে অনেক সময় পাঠকরা বিভিন্ন সংক্ষেপ ও ভুল ধারণার সম্মুখীন হয়। যেমন কুরআনে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হচ্ছে “কুফর”। কুরআনে এ শব্দটি যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মূল আরো অভিধানে এবং আমাদের ফকীহ ও ন্যায় শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় ব্যবহৃত অর্থের সাথে তার কোন মিল নেই। আবার কুরআনেও সর্বত্র এটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও এর অর্থ পরিপূর্ণ ইমানবিহীন অবস্থা। কোথাও এর অর্থ নিছক অঙ্গীকার। কোথাও একে অকৃতক্ষত ও উপকার ভূলে যাওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোথাও প্রিমানের বিভিন্ন দাবীর মধ্য থেকে কোন দাবী পূরণ না করাকে কুফরী বলা হয়েছে। কোথাও আর্কীদাগত স্থীরূপ কিন্তু কর্মগত অঙ্গীকৃতি বা নাফরমানী অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোথাও বাহ্যিক শান্তিগত্য কিন্তু প্রচলন অবিশ্বাসকে কুফরী বলা হয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন জাতগায় যদি আমরা ‘কুফরী’ শব্দের অর্থ ‘কুফরী’ নিখে যেতে থাকি বা এর কোন একটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে থাকি তাহলে নিম্নলিখে অনুবাদ সঠিক হবে। কিন্তু পাঠকগণ কোথাও এর সঠিক অর্থ থেকে বর্ণিত ধারণেন, কোথাও তারা ভুল ধারণার শিকার হবেন, আবার কোথাও সন্দেহ-সংশয়ের সামগ্রে হাবড়ুবু থাবেন।

শান্তিক অনুবাদের পদ্ধতিতে এই ক্ষটি ও অভাবগুলো দূর করার জন্য আমি মুক্ত ও স্বচ্ছল অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশের পথ বেছে নিয়েছি। কুরআনের শব্দাবলীকে ভাষাস্তরিত করার পরিবর্তে কুরআনের একটি বাক্য পড়ার পর তার যে অর্থ আমার মনে বাসা বেঁধেছে এবং মনের উপর তার যে প্রভাব পড়েছে, তাকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নিজের ভাষায় প্রেরণ করেছি। লেখ্য ভাষায় শাব্দাবিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষণের মধ্যকার পারম্পরিক সম্পর্ক ডুলে ধরেছি। আধ্যাত্মিক কালামের অর্থ, উদ্দেশ্য ও ধর্ম দ্ব্যুদ্ধীনভাবে সুস্পষ্ট করার সাথে সাথে তার রাজকীয় মর্যাদা ও গান্তীর্ঘ এবং ভাব প্রকাশের প্রচণ্ড

শক্তিকে যথাস্বত্ত্ব উপস্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এই ধরনের মুক্ত ও শুচ্ছদ্দ অনুবাদের জন্য শব্দের শৃংখলে বন্দী না থেকে মূল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালানোই ছিল অপরিহার্য। কিন্তু যেহেতু আগ্নাহর কালামের ব্যাপার, সে জন্য আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এ পথে পা বাঢ়িয়েছি। আমার পক্ষ থেকে যতদ্ব সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব তা করেছি। কুরআন তার বক্তব্যকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যতটুকু স্বাধীনতা দেয় তার সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করিনি।

আবার কুরআনকে পুরোপুরি বুঝার জন্য তার প্রতিটি বাণীর পটভূমি পাঠকের সামনে থাকা প্রয়োজন। মুক্ত ও শুচ্ছদ্দ অনুবাদ এবং ভাবার্থ প্রকাশের মাধ্যমে তা পুরোপুরি সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি সূরার শুরুতে আমি একটি ভূমিকা সংযুক্ত করেছি। সেখানে সংজ্ঞাব্য সকল প্রকার অনুসন্ধান চালিয়ে আমি বিভিন্ন বিষয় নির্দিষ্ট ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। যেমন, স্থশ্রুষ্ট সূরাটি কোনু সময় নাযিল হয়েছিল। তখন কি অবহা ছিল? ইসলামী আলোচন তখন কোনু পর্যায়ে ছিল? তার প্রয়োজন ও চাহিদা কি ছিল? সে সময় কোনু কোনু সমস্যা দেখা দিয়েছিল? এ ছাড়াও কোথাও কোনু বিশেষ আয়াতের অর্থব্য সমষ্টির নাযিলের কোনু পৃথক উপলক্ষ থাকলে সেখানেই টীকার মধ্যে তা বলে দিয়েছি।

টীকায় এমন কোনু কথা আমি আলোচনা করিনি যার ফলে পাঠকের দৃষ্টি কুরআন থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে পারে। যেখানে আমি অনুভব করেছি সাধারণ পাঠক এখানে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চান অথবা তার মনে কোনু প্রশ্ন দেখা দেবে বা তিনি কোনু সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হবেন, সেখানে আমি টীকা নিখেছি এবং ব্যাখ্যা সংযোজন করেছি। আবার যেখানে আমার মনে আশংকা জেগেছে যে, পাঠক এখানে কোনু শুরুত্ব না দিয়ে সোজা এগিয়ে যাবে এবং কুরআনের বাণীর মর্মার্থ তার কাছে অস্পষ্ট থেকে যাবে সেখানে আমি টীকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি।

যারা এই কিতাবটি থেকে ফায়দা হাসিল করতে চান তাদেরকে আমি করেক্টি প্রারম্ভ দেবো। প্রথমে সূরার শুরুত্বে সংযোজিত ভূমিকা তথা প্রসংগ ও পূর্ব আলোচনাটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন। যতক্ষণ, ঐ সূরাটি অধ্যয়ন করতে থাকেন ততক্ষণ মাঝে মাঝে ঐ ভূমিকাটি দেখতে থাকেন। তারপর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কুরআন মজীদের যতটুকু পড়েন তার প্রতিটি আয়াতের শান্তিক অনুবাদ প্রথমে পড়ে নিন। এ উদ্দেশ্যে মাত্তাষায় বা অন্য কোনু ভাষায় আপনার পছন্দসই যে কোনু অনুবাদের সাহায্য নিন। এটুকু হয়ে যাবার পর তাফহীমুল কুরআনের শুচ্ছদ্দ অনুবাদটি ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যতদ্ব প্রয়োজন একটি ধারাবাহিক রচনার মতো পড়ে নিন। এভাবে কুরআনের ঐ অংশের বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য একই সময় আপনার মনে ভেসে উঠবে। এরপর প্রত্যেকটি আয়াতকে বিস্তারিতভাবে বুঝার জন্য টীকা ও ব্যাখ্যা পড়তে থাকুন। এভাবে পড়তে থাকলে আমি মনে করি একজন সাধারণ পাঠক কুরআন মজীদ সম্পর্কে একজন আলেমের সম্পর্কায়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম না হলেও একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে ইনশাআগ্নাহ যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

আমি ১৩৬১ হিজরীর মুহররম (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ খ.) মাসে এ গ্রন্থের কাজ শুরু করি। ৫ বছরের অধিককাল ত্রুট্যগত এ কাজ চালু থাকে এবং সূরা ইউসুফ-এর তরজমা ও ব্যাখ্যা পর্যন্ত হয়ে যায়। অতপর এমন কিছু পরিস্থিতির উভে ঘটে যে পরিস্থিতিতে

আমার না কিছু লেখার সুযোগ হয়েছে আর না এমন অবকাশ হয়েছে যে, পূর্বের কাজটুকু দ্বিতীয়বার দেখে গহ্নকারে প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলতে পারি। একে সৌভাগ্যই বলুন অথবা দৃঙ্গাগ্যই বলুন ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হঠাতে এমন সুযোগ এসে গেল যে, আমাকে জননিরাপত্তা আইনে (Public Safety Act) প্রেক্ষিতার করে জেলে পাঠানো হলো, আর এখানেই আমি সে অবকাশ পেয়ে গেলাম যা এ গহ্নকে প্রকাশের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল। আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করি যেন আমার ধন্মের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং আল্লাহর বান্দাদের কুরআন বুঝায় এ গহ্ন সহায়ক প্রমাণিত হয়।

وَمَا تُوفِيقٌ إِلَّا بِالْأَعْلَى الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

আবুল আ'লা

নিউ সেইল জেল, মুলতান

১৭ ফিলকদ ১৩৬৮ হিঃ

(১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খ.)

## ভূমিকা

শিরোনামে 'ভূমিকা' শব্দটি দেখে আমি কুরআন মজীদের ভূমিকা লিখতে বসে গেছি বলে ভূল ধারণা করার কোন কারণ নেই। এটা কুরআনের নয় বরং তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা। দু'টি উদ্দেশ্য সামনে দেখে আমি এ ভূমিকা লেখায় হাত দিয়েছি।

**এক :** কুরআন অধ্যয়নের আগে একজন সাধারণ পাঠককে এমন কিছু কথা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যেগুলো শুরুতেই জেনে নিলে তার পক্ষে কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হয়ে যায়। নয়তো কুরআন অধ্যয়নের মাঝখানে বারবার একথাণ্ডলো তার মনে সন্দেহ সঞ্চার করতে পারে। অনেক সময় শুধুমাত্র এগুলো না বুঝার কারণে মানুষ কুরআনের অন্তরনিহিত অর্থের কেবলমাত্র উপরিভাগে আসতে থাকে বছরের পর বছর ধরে। তেতরে প্রবেশ করার আর কোন পথই খুঁজে পায় না।

**দুই :** কুরআন বুঝার চেষ্টা করার সময় মানুষের মনে যে প্রশ্নগুলোর উদয় হয় সর্বপ্রথম সেগুলোর জবাব দিতে হবে। এ ভূমিকায় আমি কেবলমাত্র এমন প্রশ্নের জবাব দেবো যেগুলো প্রথম প্রথম আমার মনে জেগেছিল অথবা পরে আমার সামনে আসে।

## কুরআন পাঠকের সংকট

সাধারণত আমরা যেসব বই পড়ে থাকি তাতে থাকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু। একটি বিশেষ রচনাশৈলীর আওতায় এ বিষয়বস্তুর ওপর ধারাবাহিকভাবে তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং বিভিন্ন মতামত ও যুক্তির অবতারণা করা হয়। এ জন্য কুরআনের সাথে এখনো পরিচয় হয়নি এমন কোন ব্যক্তি যখন প্রথমবার এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে যান তখন তিনি একটি চিরাচরিত আশা নিয়েই এগিয়ে যান। তিনি মনে করেন, সাধারণ গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও প্রথম বিষয়বস্তু নির্ধারিত থাকবে, তারপর মূল আলোচ্য বিষয়কে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে বিন্যাসের ক্রমানুসারে এক একটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হবে। এভাবে জীবনের এক একটি বিভাগকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে সে সম্পর্কে পূর্বোক্ত বিন্যাসের ক্রমানুসারে বিধান ও নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু গ্রন্থটি যুলে পড়া শুন্ন করার পর তিনি দেখেন সম্পূর্ণ তিনি এক চিত্র। তিনি এখানে দেখেন এমন একটি বর্ণনাভঙ্গী যার সাথে ইতিপূর্বে তার কোন পরিচয় ছিল না। এখানে তিনি দেখেন আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়বস্তু, নৈতিক বিধি-নির্দেশ, শরীয়াতের বিধান, দাওয়াত, উপদেশ, সতর্কবাণী, সমালোচনা-পর্যালোচনা, নিদা-তিরঙ্গার, ভীতি প্রদর্শন, সুসংবাদ, সাম্মান, যুক্তি-প্রমাণ, সাক্ষ এবং ঐতিহাসিক কাহিনী ও প্রাচীন প্রতৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি ইঞ্জিত। এগুলো বার বার একের পর এক আসছে। একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন শব্দের মোড়কে পুনর্বক্ত করা হচ্ছে। একটি বিষয়বস্তুর পর আর একটি এবং তারপর আকাঞ্চিতভাবে তৃতীয় আর একটি বিষয়বস্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে। বরং

কখনো কখনো একটি বিষয়বস্তুর মাঝখানে দ্বিতীয় একটি বিষয়বস্তু অকস্মাত লাফিয়ে পড়ছে। বাক্যের প্রথম পূর্ব্ব ও দ্বিতীয় পূর্ব্বের দিক পরিবর্তন হচ্ছে বার বার এবং বক্তব্য বার বার মোড় পরিবর্তন করছে। বিষয়বস্তুগুলোকে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করার কোনো চিহ্নও কোথাও নেই। ইতিহাস লেখার পদ্ধতিতে কোথাও ইতিহাস লেখা হয়নি। দর্শন ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের ভাষায় লেখা হয়নি। মানুষ ও বিশ্ব-জাহানের বস্তু ও পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু জীববিদ্যা ও পদার্থ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে করা হয়নি। সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু তাতে সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। আইনগত বিধান ও আইনের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে আইনবিদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে। নৈতিকতার যে শিক্ষা বিবৃত হয়েছে তার বর্ণনাভঙ্গী নৈতিক দর্শন সম্পর্কিত বইপত্রে আলোচিত বর্ণনাভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সাধারণভাবে বইপত্রে যেতাবে লেখা হয় এসব কিছুই তার বিপরীত। এ দৃশ্য একজন পাঠককে বিব্রত করে। তিনি মনে করতে থাকেন, এটি একটি অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত বক্তব্যের সমষ্টি। এখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য ‘খণ্ড রচনা’ একত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে এগুলোকে ধারাবাহিক রচনা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিরোধিতার দৃষ্টিতে কুরআন অয়য়নকারীরা এর উপর রাখেন তাদের সকল আপত্তি, অভিযোগ ও সন্দেহ-সংশয়ের তিত। অন্যদিকে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারীরা কখনো অর্ধের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে সন্দেহ সংশয় থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন। কখনো কখনো তারা—এই আপাত অবিন্যস্ত উপস্থাপনার ব্যাখ্যা করে নিজেদের মনকে বুঝাতে সক্ষম হন। কখনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে যোগসূত্র অনুসন্ধান করে অদ্ভুত ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আবার কখনো ‘খণ্ড রচনার’ মতবাদটি গ্রহণ করে মেন, যার ফলে প্রত্যক্ষটি আয়াত তার পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা হয়ে বক্তব্য উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অর্থ প্রকাশ করতে থাকে।

আবার একটি বইকে তালোভাবে বুঝতে হলে পাঠককে জানতে হবে তার বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, মূল বক্তব্য ও দারী এবং তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। সেই সাথে তার বর্ণনা পদ্ধতির সাথেও পরিচিত হতে হবে। তার পরিভাষা ও বিশেষ বিশ্লেষণ রীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। শব্দের উপরি কাঠামোর পেছনে তার বর্ণনাগুলো যেসব অবস্থা ও বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত সেগুলোও চোখের সামনে থাকতে হবে। সাধারণত যেসব বই আমরা পড়ে থাকি তার মধ্যে এগুলো সহজেই পাওয়া যায়। কাজেই তাদের বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হয় না। কিন্তু অন্যান্য বইতে আমরা এগুলো যেতাবে পেতে অভ্যন্ত কুরআনে ঠিক সেতাবে পাওয়া যায় না। তাই একজন সাধারণ বই পাঠকের মানসিকতা নিয়ে যখন আমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকেন তখন তিনি খুঁজে পান না এই কিতাবের বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিও তার কাছে নতুন ও অপরিচিত মনে হয়। অধিকাংশ জায়গায় এর বাক্য ও বক্তব্যগুলোর পটভূমিও তার চোখের আড়ালে থাকে। ফলে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আয়াতের মধ্যে জ্ঞানের যে উজ্জ্বল মুভ্যমালা জড়িয়ে রয়েছে তা থেকে কম বেশী কিছুটা লাভবান হওয়া সত্ত্বেও পাঠক আগ্রাহীর কালামের যথার্থ অন্তরনিহিত প্রাণসত্ত্বের সন্ধান পায় না। এ ক্ষেত্রে কিতাবের জ্ঞান লাভ

করার পরিবর্তে তাকে নিছক কিভাবে কতিপয় বিস্ফিষ্ট তত্ত্ব ও উপদেশাবলী লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বরং কুরআন অধ্যয়নের পর যেসব লোকের মনে নানা কারণে সন্দেহ জাগে তাদের অধিকাংশের বিভাস্তির একটি কারণ হচ্ছে এই হয়, কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করার ব্যাপারে এই মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের জানা থাকে না। এরপরও কুরআন পড়তে গিয়ে তারা দেখে তার পাতায় পাতায় বিভিন্ন বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে। বহু আয়াতের গভীর অর্থ তাদের কাছে অনুধাবিত থেকে গেছে। অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে তারা জ্ঞানগত বক্তব্য পেয়েছে কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষিতে এই বক্তব্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ বেমানান মনে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বর্ণনাভঙ্গীর সাথে অপরিচিত থাকার কারণে আয়াতের আসল অর্থ থেকে তারা অন্যদিকে সরে গিয়েছে এবং অধিকাংশ স্থানে পটভূমি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে এভাবে তারা মারাত্মক ধরনের বিভাস্তির শিকার হয়েছে।

### সংকট উত্তরণের উপায়

কুরআন কোন্ ধরনের কিভাব? এটি কিভাবে অবর্তীণ হলো? এর সংকলন ও বিন্যাসের পদ্ধতি কি ছিল? এর বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় কি? কোন্ বক্তব্য ও লক্ষ বিন্দুকে ধিরে এর সমস্ত জ্ঞানচন্দন আবর্তিত হয়েছে? কোন্ কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে এর অসংখ্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিষয়াবলী সম্পর্কিত? নিজের বক্তব্য উপস্থাপন ও সপ্রমাণ করার জন্য এতে কোন্ ধরনের বর্ণনাধারা ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন পদ্ধতি অবলাভিত হয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর এবং এই ধরনের আরো কিছু প্রয়োজনীয় প্রয়োর সুস্পষ্ট জবাব যদি পাঠক শুরুতেই পেয়ে যান তাহলে তিনি বহুবিধ আশংকা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। তার জন্য কুরআনের অর্থ অনুধাবন ও তার মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পথ প্রশ্নত হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদে প্রচলিত গ্রন্থের ন্যায় রচনা বিন্যাসের সন্ধান করেন এবং এর পাতায় তার সাক্ষাত না পেয়ে চতুর্দিকে হাতড়তে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়েন, কুরআন সম্পর্কিত এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব জানা না থাকাই তার মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ। ‘ধর্ম সম্পর্কিত’ একটি বই পড়তে যাচ্ছেন—এই ধারণা নিয়ে তিনি কুরআন পড়তে শুরু করেন। ‘ধর্ম সম্পর্কিত’ এবং ‘বই’ এ দু’টোর ব্যাপারে তার মনে সাধারণত ধর্ম ও বই সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাই বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু যখন সেখানে নিজের মানসিক ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র তিনি দেখতে পান তখন তাঁর কাছে সেটি সম্পূর্ণ ভূপরিচিত মনে হতে থাকে। আলোচ্য বিষয়ের মূল কথার নাগাল না পাওয়ার কারণে প্রতিটি বাকের মধ্যে তিনি এমনভাবে বিভাস্তের মতো ঘোরাফেরা করতে থাকেন যেন মনে হয় তিনি কোন নতুন শহরের গলি পথে পথহারা এক নবাগত পথিক। এই পথ হারার বিভাস্তি থেকে তিনি বাঁচতে পারেন যদি তাঁকে পূর্বাহ্নেই একথা বলে দেয়া হয় যে, আপনি যে কিভাবটি পড়তে যাচ্ছেন সেটি বইপত্রের জগতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব বই। এটির রচনাপদ্ধতিও স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিষয়বস্তু, বক্তব্য বিষয় ও আলোচনা বিন্যাসের দিক দিয়েও এখানে সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতি অবসরিত হয়েছে। কাজেই এতদিন পর্যন্ত নানা ধরনের বইপত্র পড়ে আপনার মনে বই সম্পর্কে যে একটি কাঠামোগত ধারণা গড়ে উঠেছে, এ কিভাবটি বুঝার ব্যাপারে তা আপনার কোন কাজে

০<sup>০</sup> লাগবে না। বরং উলটো এ ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একে বুঝতে হলে নিজের মনের মধ্যে আগে থেকেই যেসব ধারণা ও কল্পনা বাসা বৈধে আছে সেগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে এবং এই কিভাবের অভিনব বৈশিষ্টকে নিজের মনের মধ্যে গৈরে নিতে হবে।

এ প্রসংগে পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনের সাথে পরিচিত হতে হবে। এর প্রতি তার বিশ্বাস থাকা না থাকার প্রশ্ন এখানে নেই। তবে এ কিভাবকে বুঝতে হলে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে এ কিভাব নিজে এবং এর উপস্থাপক হয়রত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মূল বিষয় বিবৃত করেছেন তা গ্রহণ করতে হবে। এ মূল বিষয় নিম্নরূপ :

১. সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রতু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জ্ঞান, বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মনের মধ্যে পার্থক্য করার, নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকলন করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরনের স্বাধীনতা (Autonomy) দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি পদে অভিযন্ত করেছেন।

২. মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব-জাহানের প্রতু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে একথা দৃঢ় বন্ধমূল করে দিয়েছিলেন : আমিই তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্য তোমরা স্বাধীন ব্রেছাচায়ী নও, কারোর অধীনও নও এবং আমার ছাড়া আর কারোর তোমাদের বন্দেগী, পৃজা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই। দুনিয়ার এই জীবনে তোমাদেরকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য পরীক্ষাকাল। এই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাঁচাই বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ। তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিই : তোমরা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমরা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এই চেতনা সহকারে জীবন যাপন করবে যেন আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। বিপরীত পক্ষে এর খেকে তিনির প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তির। প্রথম কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমরা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিচিন্তা শান্ত করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরস্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জামাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আবেরাতে প্রবেশকালে সেখানে জাহানাম নামক চিরস্তন মরমজ্বালা দৃঃখ-কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্তে তোমরা নিষ্কিঞ্চ হবে।

৩. একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব-জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানব জাতির দুই সদস্য (আদম ও হাওয়া) বিশিষ্ট প্রথম গ্রন্থকে তিনি পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এই বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের দুনিয়ার সমষ্ট

কাজ-কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এই প্রাথমিক বংশধররা মূর্তা, অজ্ঞতা, ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি হননি। আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে। তারা সত্যকে জানতেন; তাদেরকে জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর আনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের স্তুতানন্দেরও আল্লাহর অনুগত বালাহ (মুসলিম) হিসেবে জীবন যাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনচারণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবন পদ্ধতি (অর্থাৎ ধীন) থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফলতির ঘূর্মে আচ্ছর হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানী প্রোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানবিক ও অমানবিক এবং কানুনিক ও বন্তুগত বিভিন্ন সত্যকে আল্লাহর সাথে তাঁর কাজ-কারবারে শরীরীক করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের (আল ইল্ম) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কম্বনা, ভাববাদ, মনগড়া যতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি (শরীয়াত) পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোকপ্রবণতা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরী করেছে যার ফলে আল্লাহর এই যৌন জুলুম-নিপীড়নে ভরে গেছে।

৪. আল্লাহ যদি তাঁর স্টাসুলত ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদেরকে জ্ঞেরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে স্থায়িভে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতা দান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে খৎস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানব জাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঝস্যশীল। সৃষ্টির প্রথমদিন থেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অঙ্কুষ রেখে কাজের মাধ্যমে যেসব সুযোগ-সুবিধে দেয়া হবে তার মধ্য দিয়েই তিনি তাকে পথনির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানব জাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর উপর ইমান রাখতেন এবং তাঁর স্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন যাপনের সঠিক বিধান এদেরকে দান করে তিনি বন্নী আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

৫. এরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই ধীনের তথা জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী তাঁরা সবাই ছিলেন একই হেদয়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির যে চিরস্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন

তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দীন ও হেদয়াতের দিকে আহবান জ্ঞানান। তারপর যারা এ আহবান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উদ্ঘাতে পরিণত করেন যারা নিজেরা হন আল্লাহর আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরক্তাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সূচারুপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে মানব গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উদ্ঘাতে মুসলিমার অঙ্গীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোন কোন উদ্ঘাত আল্লাহ প্রদত্ত হেদয়াতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশন ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।

৬. সবশেষে বিশ্ব-জাহানের প্রত্বু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের প্রথেক্ষ উদ্ঘাতদেরকেও তিনি আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জ্ঞানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হেদয়াত পৌছিয়ে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হেদয়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উদ্ঘাতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ যেন একদিকে আল্লাহর হেদয়াতের ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংক্ষার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে। এই দাওয়াত ও হেদয়াতের কিতাব হচ্ছে এই কুরআন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের ওপর আল্লাহ এই কিতাবটি অবতীর্ণ করেন।

### কুরআনের মূল আলোচ্য

কুরআন সম্পর্কিত এই মৌলিক ও প্রাথমিক কথাগুলো জেনে নেয়ার পর পাঠকের জন্য এই কিতাবের বিষয়বস্তু, এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্যবিন্দু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়ে যায়।

এর বিষয়বস্তু মানুষ। প্রকৃত ও জাজ্জল্যমান সত্ত্বের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ কিম্বা—একথাই কুরআনের মূল বিষয়বস্তু।

এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আগাত দৃষ্টি, আদাজ-অনুমান নির্ভরতা অথবা প্রত্যির দাসত্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা, নিজের অস্তিত্ব ও নিজের পার্থিব জীবন সম্পর্কে যেসব মতবাদ গড়ে তুলেছে এবং এই মতবাদগুলোর ভিত্তিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে যথার্থ জাজ্জল্যমান সত্ত্বের দৃষ্টিতে তা সবই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং পরিণতির দিক দিয়ে তা মানুষের জন্য ধৰ্মস্কর। আসল সত্য তাই যা মানুষকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করার সময় আল্লাহ

নিজেই বলে দিয়েছিলেন। আর এই আসল সত্ত্বের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য ইতিপূর্বে সঠিক কর্মনীতি নামে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতির আলোচনা করা হয়েছে তাই সঠিক, নির্ভুল ও শুভ পরিণতির দাবীদার।

এ চূড়ান্ত লক্ষ্য ও বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি অবলম্বনের প্রতি আহবান জানানো এবং আগ্নাহীর হেদোয়াতকে দ্ব্যাখ্যানভাবে পেশ করা। মানুষ নিজের গাফলতি ও অসতর্কতার দরম্বন এগুলো হারিয়ে ফেলেছে এবং তার শয়তানী প্রবৃত্তির কারণে সে এগুলোকে বিভিন্ন সময় বিকৃত করার কাজই করে এসেছে।

এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কুরআন পাঠ করতে থাকলে দেখা যাবে এই কিভাবটি তার সমগ্র পরিসরে কোথাও তার বিষয়বস্তু, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং মূল লক্ষ্য ও বক্তব্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে পড়েনি। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বিভিন্ন ধরনের বিষয়াবলী তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত আছে যেমন একটি মৌতির মালার বিভিন্ন রংয়ের ছেট বড় মৌতি একটি সূতোর বাঁধনে এক সাথে একত্রে একটি নিবিড় সম্পর্কে গাঁথা থাকে। কুরআনে আলোচনা করা হয় পুরুষী ও আকাশের গঠনাকৃতির, মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া পদ্ধতি এবং বিশ্ব-জগতের নির্দশনসমূহ পর্যবেক্ষণের ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিকে ঘটনাবলীর। কুরআনে বিভিন্ন জাতির আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা হয়। অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা করা হয়। এই সাথে অন্যান্য আরো বহু জিনিসের উল্লেখও করা হয়। কিন্তু মানুষকে পদার্থ বিদ্যা, জীব বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন বা অন্য কোন বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনে এগুলো আলোচনা করা হয়নি। বরং প্রকৃত ও জাঙ্গল্যমান সত্য সম্পর্কে মানুষের ভূল ধারণা দূর করা, যথার্থ সত্যটি মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া, যথার্থ সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভাবি ও অশুভ পরিণতি সৃষ্টি করে তুলে ধরা এবং সত্ত্বের অনুরূপ ও শুভ পরিণতির অধিকারী কর্মনীতির দিকে মানুষকে আহবান করাই এর উদ্দেশ্য। এ কারণেই এতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা কেবলমাত্র ততটুকুই এবং সেই ভঙ্গিমায় করা হয়েছে যতটুকু এবং যে ভঙ্গিমায় আলোচনা করা তার মূল লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন মতো এসব বিষয়ের আলোচনা করার পর কুরআন সবসময় অপ্রয়োজনীয় বিশ্বারিত আলোচনা বাদ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে। একটি সুগভীর ঐক্য ও একাত্মতা সহকারে তার সমস্ত আলোচনা ‘ইসলামী দাওয়াত’-এর কেন্দ্রবিন্দুতে ঘূরছে।

### কুরআন নায়িলের পদ্ধতি

কিন্তু কুরআনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বিন্যাস রীতি ও তার বহুতর আলোচ্য বিষয়কে পুরোপুরি হ্রদয়ংগ্রহ করতে হলে তার অবতরণের রীতি-পদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানপাত করতে হবে।

মহান আগ্নাহ এই কুরআনটি একবারে লিখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে দিয়ে এর বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে একটি বিশেষ জীবন ধারার দিকে আহবান জানাবার নির্দেশ দেননি। এটি আদৌ তেমন ধরনের কোন কিতাব নয়।

অনুরূপভাবে এই কিভাবে প্রচলিত রচনা পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করা হয়নি। এ জন্য রচনা বিন্যাসের প্রচলিত পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে বই লেখা হয় তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আসলে এটি একটি অভিনব ধরনের কিভাব। মহান আল্লাহ আরব দেশের মক্কা নগরীতে তাঁর এক বাসাকে নবী করে পাঠালেন। নিজের শহর ও গোত্র (কুরাইশ) থেকে দাওয়াতের সূচনা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। এ কাজ শুরু করার জন্য প্রথম দিকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিধানগুলোই তাঁকে দেয়া হলো। এ বিধানগুলো ছিল প্রধানত তিনটি বিষয়বস্তু সংযুক্ত।

এক : নবীকে শিক্ষা দান। এই বিরাট ও মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি নিজেকে কিভাবে তৈরি করবেন এবং কোন পদ্ধতিতে কাজ করবেন তা তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হলো।

দুই : যথার্থ সত্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাবলী সরবরাহ এবং সত্য সম্পর্কে চারপাশের লোকদের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো পাওয়া যেতো সংক্ষেপে সেগুলো খণ্ডন। এগুলোর কারণে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করতো।

তিনি : সঠিক কর্মনীতির দিকে আহাবান। আল্লাহর বিধানের যেসব মৌলিক চরিত্র নীতির অনুসরণ মানুষের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বার্তাবহ সেগুলো বিবৃত করা হলো।

### ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্ব

প্রথম দিকের এ বাণীগুলো দাওয়াতের সূচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় ছেট ছেট সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। এগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্চল, মিটি-মধুর, ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী এবং যে জাতিকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে তাদের রূচি অনুযায়ী সর্বোত্তম সাহিত্যরস সমৃদ্ধ। ফলে একথাণ্ডে মনে গেঁথে যেতো তীরের মতো। ভাষার ঝংকার ও সুর লালিতের কারণে এগুলোর দিকে কান নিজে নিজেই অতি দ্রুত আকৃষ্ট হতো। সময়োপযোগী এবং মনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবার কারণে জিহ্বা স্বত্ত্বাত্ত্বাবে এগুলোর পুনরাবৃত্তি করতো। আবার এতে স্থানীয় প্রভাব ছিল অনেক বেশী। বিশ্বজনীন সত্য বর্ণনা করা হলেও সে জন্য ব্যক্তি, প্রমাণ ও উদাহরণ গ্রহণ করা হতো এমন নিকটতম পরিবেশ থেকে যার সাথে শ্রোতারা ভালোভাবে পরিচিত ছিল। তাদেরই ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাদেরই প্রতিদিনের দেখা নির্দেশনসমূহ এবং তাদেরই আকীদাগত, নৈতিক ও সামাজিক ত্রুটিগুলোর ওপর ছিল সমস্ত আলোচনার ভিত্তি। এভাবে এর প্রভাব গ্রহণ করার জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল।

ইসলামী দাওয়াতের এ সূচনা পর্বটি প্রায় চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত জারী ছিল। এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

১. কতিপয় সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি ইসলামী দাওয়াত গ্রহণ করেন। তাঁরা ‘মুসলিম উম্মাহ’ নামে একটি উন্নত গড়ে তুলতে প্রস্তুত হল।

২. বিপুল সংখ্যক লোক মূর্খতা স্বার্থাঙ্কৰা বা বাপ-দাদার রসম রেওয়াজের প্রতি অক্ষ আসঙ্গির কারণে এই দাওয়াতের বিরোধিতা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

৩. মুক্তি ও কুরাইশদের সীমানা পেরিয়ে এই নতুন দাওয়াতের ধ্রনি প্রতিষ্ঠানিত হতে থাকে অপেক্ষাকৃত বিশাল বিস্তৃত এলাকায়।

### ইসলামী দাওয়াতের হিতীয় অধ্যায়

এখান থেকে এই দাওয়াতের হিতীয় অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। এ পর্যায়ে ইসলামের এই আন্দোলন ও পুরাতন জাহেলিয়াতের মধ্যে একটি কঠিন প্রাণান্তকর সংঘাত সৃষ্টি হয়। আট নয় বছর পর্যন্ত এ সংঘাত চলতে থাকে। কেবল মুক্তির ও কুরাইশ গোত্রের লোকেরাই নয় বরং কিটীর্ণ আরব ভূ-খণ্ডের অধিকাংশ এলাকার যেসব লোক পুরাতন জাহেলিয়াতকে অপরিবর্তিত রাখতে চাইছিল তারা সবাই বল প্রয়োগ করে এই আন্দোলনটির কঠরোধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। একে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তারা সব রকমের অস্ত্র ব্যবহার করে। মিথ্য প্রচারণা চালায়। অভিযোগ, সন্দেহ, সংশয় ও আপত্তি উৎপন্ন করে অস্থ্য। সাধারণ মানুষের মনে নানান প্রয়োচনার বীজ বপন করে। অপরিচিত লোকেরা যাতে নবী সান্নাত্বাহ আলাইহি ওয়া সান্নামের কথা শুনতে না পারে সে জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর চালায় বর্বর পাশবিক নির্যাতন। তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট করে। তাদের ওপর এত বেশী উৎসীড়ন নির্যাতন চালায় যার ফলে তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে অনেক লোক দু'দুবার নিজেদের দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরাত করে যেতে বাধ্য হয়, অবশেষে তাদের সবাইকে মদীনার দিকে হিজরাত করতে হয়। কিন্তু এই কঠিন ও ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সম্বৃদ্ধ এ আন্দোলনটি বিস্তার শীত করতে থাকে। যুক্তি এমন কোন বৎশ ও পরিবার ছিল না যার কোন না কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেনি। অধিকাংশ ইসলাম' বিরোধী ভাই-ভাইপো, পুত্র-কন্যা, তফী-তফীপতি ইসলামী দাওয়াতের কেবল অনুসন্ধানীই ছিল না বরং প্রাণ উৎসর্গকারী কর্মীর ভূমিকা পালন করছিল এবং তাদের কলিজার টুকরা স্থানরাই তাদের বিরুদ্ধে সংঘাতের হিবার প্রস্তুতি নিয়েছিল—এটিই ছিল তাদের শক্তির তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা ও তিক্ষ্ণতার কারণ। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যারা পুরাতন জাহেলিয়াতের সাথে সম্পর্ক ছিল করে এই নবজাত আন্দোলনে যোগদান করছিল, তারা ইতিপূর্বেও তাদের সমাজের সর্বোত্তম লোক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। অতপর এই আন্দোলনে যোগদান করে তারা এতই সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও পৃত চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছিল যে, দুনিয়াবাসীর চোখে এই আন্দোলনের শেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য অনুভূত হওয়া ছাড়া পত্যন্তর ছিল না। যে দাওয়াত এ ধরনের লোকদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তাদেরকে এহেন উরত পর্যায়ের মানবিক শুণ সম্পর্ক করে তুলছিল তার শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়াবাসীর চোখে সমৃজ্জল হয়ে উঠাই ছিল ব্রহ্মাবিক।

এই সুনীঘ ও তীব্র সংঘাতকালীন সময়ে মহান আল্লাহ পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের নবীর ওপর এমনসব আবেগময় ভাষণ অবর্তীণ করতে থাকেন যার মধ্যে ছিল শ্রোতৃবিনীর গতিময়তা, বন্যার প্রচণ্ড শক্তি এবং আঙুনের তীক্ষ্ণতা ও তেজময়তার প্রভাব। এই ভাষণগুলোর মাধ্যমে একদিকে ইমানদারদেরকে জানানো হয়েছে তাদের প্রাথমিক

দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের মধ্যে দলীয় চেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে তাক্ষণ্যা, উন্নত চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও পবিত্র-নিষ্কলুষ স্বত্বাব-প্রকৃতি ও আচরণবিধি শেখানো হয়েছে। আগ্নাহর সত্য দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি তাদেরকে জানানো হয়েছে। সাফল্যদানের অংগীকার ও জান্মাত লাভের সুসংবাদ দান করে তাদের হিম্মত ও মনোবল সুদৃঢ় করা হয়েছে। আগ্নাহর পথে দৈর্ঘ্য, সহিষ্ণুতা, অবিচলতা ও উন্নত মনোবলসহকারে সংগ্রাম-সাধনা চালিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে উদ্দীপিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রাণ উৎসর্গীতার এমন বিপুল আবেগ ও উদ্দীপনা যার ফলে তারা সব রকমের বিপদের মোকাবিলা করতে এবং বিরোধিতার উত্তৃঙ্গ তুফানের সামনে অটল-অচল পাহাড়ের মতো দৌড়িয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছিল। অন্যদিকে বিরোধিতাকারী, সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত এবং গাফলতির ঘূমে অচেতন জনসমাজকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এমন সব জাতির মর্মান্তিক ও ধৰ্মসকর পরিণতির চিত্র ত্লে ধরে যাদের ইতিহাসের সাথে তারা পরিচিত ছিল। যেসব ধৰ্মস্থান্ত জনপদের উপর দিয়ে সফর ব্যাপদেশে দিনরাত তাদের যাওয়া-আসা করতে হতো তাদের ধৰ্মসাবশেষগুলো দেখিয়ে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া হয়েছে। পৃথিবী ও আকাশের উন্মুক্ত পরিসরে দিনরাত যেসব শত শত হাজার হাজার সুস্পষ্ট নির্দর্শন তাদের চোখের সামনে বিরাজ করছিল এবং নিজেদের জীবনে যেগুলোর প্রভাব তারা হরহামেশা অনুভব করছিল, সেগুলো থেকে তাদেরকে তাওহীদ ও আখরোত্তের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, শিরক ও ষেছ্ছাচারিতা এবং পরকাল অধীকার ও বাপ-দাদাদের ভান্ত পথের অঙ্ক অনুস্তির ভূলগুলো ত্লে ধরা হয়েছে এমন সব দ্যুর্ধীন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে যেগুলো সহজে মন-মন্তিককে প্রভাবিত করতে পারে। তারপর তাদের প্রত্যেকটি সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে। যেসব জটিল মানসিক সমস্যায় তারা নিজেরা ভুগছিল এবং অন্যদের মনেও যেসব সমস্যার আবর্ত সৃষ্টি করতে চাইছিল সেগুলোর কুয়াশা থেকে তাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেছে। এভাবে সবদিক দিয়ে ঘেরাও করে এমন সুকঠিনভাবে জাহেলিয়াতকে পাকড়াও করা হয়েছে যার ফলে বৃদ্ধি-চিন্তা ও মননের জগতে তার শাস ফেলার জন্য এক ইঞ্চি পরিমাণ জ্ঞায়গাও থাকেনি। এই সাথে তাদের ভয় দেখানো হয়েছে আগ্নাহর ক্ষেত্রে, কিয়ামতের বিচারের ভয়াবহতার ও জাহানারের শান্তির। অসৎ চরিত্র, ভুল জীবনধারা, জাহেলী রাতিনীতি, সত্যের দুশ্মনি ও মুসলিম নিমীড়নের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যেসব বড় বড় মূলনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ায় হামেশা আগ্নাহর প্রিয় ও মনোনীত সৎ ও উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি রচিত হয়ে এসেছে সেগুলো তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে।

এ পর্যাটি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরে দাওয়াত অধিকতর ব্যাপক হতে চলেছে। একদিকে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এবং অন্যদিকে বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে চলেছে। বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন কর্মধারার অধিকারী গোত্র ও দলগুলোর মুখ্যমূখ্য হতে হয়েছে। সেই অনুযায়ী আগ্নাহর পক্ষ থেকে আগত বাণিসমূহের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র বাড়তে থেকেছে।

এই হচ্ছে কুরআন মজীদে অংকিত মক্কী জীবনের পটভূমি।

## দাওয়াতের তৃতীয় অধ্যায়

যক্ষায় এই আন্দোলন তের বছর সক্রিয় থাকার পর হঠাতে স মদীনায় সন্দান পেলো একটি কেন্দ্রে। সমগ্র আরব ভূখণ্ডে থেকে এক এক করে নিজের সমস্ত অনুসারীদেরকে সেখানে একত্র করে নিজের সমুদয় শক্তিকে একটি কেন্দ্রে একীভূত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের অধিকাংশ অনুসারী হিজরাত করে মদীনা পৌছে গেলেন। এভাবে ইসলামী দাওয়াত তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করলো।

এই পর্যায়ে অবস্থার চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেলো। মুসলিম উমাই একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল হলো। পুরাতন জাহেলিয়াতের ধারকদের সাথে শুরু হলো সশস্ত্র সংঘাত। আগের নবীদের উমাতের (ইহুদী ও নাসারা) সাথেও সংঘাত বাধলো। উমাতে মুসলিমার আভ্যন্তরীন ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করলো বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক। তাদের সাথেও লড়তে হলো। দশ বছরের কঠিন সংঘর্ষ-সংঘাতের পথ পেরিয়ে এই আন্দোলন সাফল্যের মন্দিরে পৌছে গেলো। সমগ্র আরব ভূখণ্ডে বিস্তৃত হলো তার আধিপত্য। তার সামনে খুলে গেলো বিশ্বজনীন দাওয়াত ও সংক্ষারের দুয়ার। এই পর্যায়টিও কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। প্রত্যেক স্তরে ছিল এই আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বিষয়গুলো। এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এমন সব তায়গ ও বক্তব্য অবতীর্ণ হতে থাকলো, যেগুলো কখনো হতো অনলবঢ়ী বক্তৃতার মতো, কখনো হাত্যির হতো সেগুলো রাজকীয় ফরমান ও নির্দেশের চেহারা নিয়ে, আবার কখনো শিক্ষকের শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা এবং সংক্ষারকের উপদেশ দান ও বুঝাবার প্রচেষ্টা তার মধ্যে ফুটে উঠতো। দল ও রাষ্ট্র এবং সৎ ও সুন্দর নাগরিক জীবন কিভাবে গড়ে তুলতে হবে, জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলো কোনু নীতি ও শৃঙ্খল-বিধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মুনাফিকদের সাথে কোনু ধরনের ব্যবহার করতে হবে, যিষ্ঠী কাফের, আহলি কিতাব, যুদ্ধরত শক্তি এবং চুক্তি সূত্রে আবক্ষ জাতিদের ব্যাপারে কোনু ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করা হবে এবং সুসংগঠিত ইমানদারদের এই দলটি দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রাপ্ত করার জন্য নিজেকে কিভাবে তৈরি করবে—এসব কথা সেখানে বিবৃত হতো। এই বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা ও তরবিয়ত (টেনিং) দান করা হতো, তাদের দুর্বলতাগুলো দূর করা হতো, আল্লাহর পথে জ্ঞান-মাল দিয়ে জিহাদ করতে তাদেরকে উদ্দৃঢ় করা হতো, জয়-পরাজয়, আরাম-মুসিবত, দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র-সচ্ছলতা, নিরাপত্তা-ভীতি ইত্যাদি সব ধরনের অবস্থায় সেই অবস্থার উপযোগী নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া হতো। তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর ইসলামিক হয়ে ইসলামী দাওয়াত ও সংক্ষারের কাজ সম্পাদন করার যোগ্যতা সম্পন্ন করে তৈরি করা হতো। অন্যদিকে আহলে কিতাব, মুনাফিক, মুশর্রিক ও কাফের ইত্যাদি যারা ঈমানের পরিসরের বাইরে অবস্থান করছিল, তাদের সবাইকে তাদের তিনি অবস্থার প্রেক্ষিতে বুঝাবার, হন্দয়গ্রাহী ভাষায় দাওয়াত দেয়ার, কঠোরভাবে তিরস্কার ও উপদেশ দান করার, আল্লাহর আয়াবের ভয় দেখাবার এবং শিক্ষণীয় অবস্থা ঘটনাবলী থেকে উপদেশ

ও শিক্ষাদান করার চেষ্টা করা হতো। এভাবে সত্যকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে তাদের সামনে কোনো জড়তা বা অস্পষ্টতা থাকেনি।

এই হচ্ছে কুরআন মজীদের মাদানী সুরাওলোর প্রেক্ষাপট।

### কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী

এ বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একটি দাওয়াতের বাণী নিয়ে কুরআন মজীদ নাখিল হওয়া শুরু হয়। দাওয়াতটি শুরু হবার পর থেকে নিয়ে তার পূর্ণতার ছড়ান্ত মনযিলে পৌছ পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছরে তাকে যেসব পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করতে হয় তাদের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাখিল হতে থাকে। কাজেই ডট্টেরেট ডিজী লাভ করার জন্য যেসব বইপত্র লেখা হয় সেগুলোর মতো রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করার কায়দা এখানে অবলম্বিত হয়নি। আবার এই দাওয়াতের ক্রমোলভির সাথে সাথে কুরআনের ছোট বড় যে সমস্ত অংশ নাখিল হয় সেগুলোও কোন পৃষ্ঠিকার আকারে থকাশিত হতো না বরং বক্তৃতা ও বিবৃতির আকারে বর্ণনা করা হতো এবং সেভাবে প্রচারণ করা হতো। তাই সেগুলোর মধ্যে মৃত হয়ে উঠেছে লেখার নয়, বক্তৃতার ভঙ্গীমা। তারপর এই বক্তৃতাও কোন অধ্যাপকের নয় বরং একজন আহবায়কের বক্তৃতার মতো হিল। মন, মন্ত্রিক, বুদ্ধি ও আবেগ সবার কাছেই সে আবেদন জানাতো। তাকে সব ইকুমের মানসিকতার মুখোয়াখি হতে হতো। নিজের দাওয়াত ও প্রচার এবং কার্যকর আন্দোলনের ব্যাপারে তাকে অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থায় কাজ করতে হতো। সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজের কথা মনের মধ্যে বসিয়ে দেয়া, চিন্তার জগত বদলে দেয়া, আবেগের সমন্বে তরঙ্গ সৃষ্টি করা, বিরোধিতার পাহাড় ভেঙ্গে ফেলা, সহযোগীদের সংশোধন করা ও প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের মধ্যে প্রেরণা, উদ্বীপনা ও দৃঢ় সংকৰণ সৃষ্টি করা, শক্রদের বন্ধু ও অবীকারকারীদের শীকারকারীতে পরিণত করা, বিরোধীদের যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করা এবং তাদের নেতৃত্ব শক্তি ছিপিত করা—এভাবে তাকে এমন সব কাজ করতে হতো, যা একটি দাওয়াতের ধারক বাহক এবং একটি আন্দোলনের নেতার জন্য অপরিহার্য। এ জন্য মহান আল্লাহ এই কাজ ও দায়িত্ব প্রসঙ্গে তাঁর নবীর ওপর যে সমস্ত ভাষণ নাখিল করেছেন তাঁর ধরন ও প্রকৃতি একটি দাওয়াতের উপযোগীই হয়েছে। সেখানে কলেজের অধ্যাপক সুলভ বক্তৃতাভঙ্গী অনুসন্ধান করা উচিত নয়।

এখান থেকে আর একটি বিষয়ও সহজে বুঝতে পারা যায়। সেটি হচ্ছে, কুরআনে একই বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন স্থানে বারবার কেন এসেছে? একটি দাওয়াত ও একটি বাস্তব-সক্রিয় আন্দোলনের কতগুলো স্থাভাবিক চাহিদা ও দাবী রয়েছে। এই আন্দোলন যে সময় যে পর্যায়ে অবস্থান করে সে সময় সেই পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যীল কথাই বলতে হবে। যতক্ষণ দাওয়াত এক পর্যায়ে অবস্থান করে ততক্ষণ পরবর্তী পর্যায়গুলোর প্রসংগ সেখানে উত্থাপিত হতে পারবে না। বরং সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের কথাই বারবার আলোচিত হতে হবে। এতে কয়েক মাস বা কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলেও তাঁর পরোয়া করা যাবে না। আবার একই বাক্যের মধ্যে একই ধরনের কথার একই ভঙ্গীমায় পুনরাবৃত্তি চলতে থাকলে তা শুনতে শুনতে কান পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে বিরক্তি সঞ্চার হয়। তাই

প্রতি পর্যায়ে যে কথগুলো বারবার বলার প্রয়োজন দেখা দেবে সেগুলোকে প্রতি বার নতুন শব্দের মোড়কে, নতুন ভঙ্গীমায় এবং রঙে সাজিয়ে, নতুন কায়দায় মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে যাতে সেগুলো সূखকর ভাবাবেশে মনে বন্ধমূল হয়ে যায় এবং দাওয়াতের এক একটি মনযিল সুন্দর হতে থাকে। এই সাথে দাওয়াতের ভিত্তি যেসব বিশ্বাস ও মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে প্রথম পদক্ষেপ থেকে নিয়ে শেষ মনযিল পর্যন্ত কোনক্রমেই দৃষ্টির আড়াল করা যাবে না। বরং দাওয়াতের প্রতি পর্যায়ে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি হতে হবে। এ কারণে দেখা যায়, ইসলামী দাওয়াতের এক পর্যায়ে কুরআন মজীদের যতগুলো সুরা নাযিল হয়েছে তার সবগুলোর মধ্যে সাধারণত একই ধরনের বিষয়বস্তু শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গীর খোলস পরিবর্তন করে এসেছে। তবে তাওয়াইদ, আল্লাহর শুণ্যবলী, আখেরাত, আখেরাতের জবাবদিহি, কিয়ামতে পুরুষার ও শান্তি, রিসালাত, কিতাবের ওপর ঈমান, তাকওয়া, সবর, তাওয়াকুল এবং এ ধরনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের আলোচনা সারা কুরআনে সর্বত্র বার বার দেখা যায়। কারণ এই আদোলনের কোন পর্যায়ের এই মৌলিক বিষয়গুলো থেকে চোখ বন্ধ করে রাখাকে বরদাশত করা হয়নি। এই মৌলিক চিহ্ন ও ধ্যান-ধারণাগুলো সামান্য দুর্বল হয়ে পড়ে ইসলামের এই আদোলন কথনে তার যথার্থ প্রাণশক্তি সহকারে গতিশীল হতে পারতো না।

### এহেন বিন্যাসের কারণ

যে ক্রমিকধারায় কুরআন নাযিল হয়েছিল একে গহ্য আকারে বিন্যন্ত ও লিপিবদ্ধ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ধারা অঙ্গুল রাখেননি কেন এ প্রশ্নের জবাব একটু চিহ্ন করলে আমদের এ বর্ণনায়ই পাওয়া যাবে।

ওপরের আলোচনায় আপনারা জেনেছেন, তেইশ বছর ধরে কুরআন নাযিল হয়েছে। যে ক্রমানুসারে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা ও অগ্রগতি হয়েছে সেই ক্রমানুসারেই কুরআন নাযিল হতে থেকেছে। এখন সহজেই অনুমান করা যায়, দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করার পর কুরআনের নাযিলকৃত অংশগুলোর এমন ধরনের বিন্যাস যা কেবল দাওয়াতের ক্রমোত্তরি সাথে সম্পর্কিত ছিল—কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। এখন তাদের জন্য দাওয়াত পূর্ণতা লাভের পর সৃষ্টি অবস্থার অধিকতর উপযোগী একটি নতুন ধরনের বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল। কারণ শুরুতে সে এমন সব লোককে সর্বপ্রথম দাওয়াত দেয় যারা ছিল ইসলামের সাথে সম্পূর্ণরূপে প্রপরিচিত। তাই তখন একেবারে গোড়া থেকেই শিক্ষা ও উপদেশ দানের কাজ শুরু হয়। কিন্তু দাওয়াত পরিপূর্ণতা লাভ করার পর তার প্রথম লক্ষ্য হয় এমন সব লোক যারা তার ওপর ঈমান এনে একটি উত্থাতের অন্তরভুক্ত হয়েছে এবং যাদের ওপর এই কাজ জারী রাখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দাওয়াতকে চিহ্ন ও কর্মধারা উভয় দিক দিয়ে পূর্ণতা দান করার পর তাদের হাতে সোপন্দ করেছিলেন। এখন নিশ্চিতরূপে সর্বপ্রথম তাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিজেদের জীবন যাপনের জন্য আইন-কানুন এবং পূর্ববর্তী নবীদের উত্থাতদের মধ্যে যে সমস্ত ফিত্না সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে তালোতাবে জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারপর ইসলামের সাথে অপরিচিত দুনিয়াবাসীদের কাছে আল্লাহর বিধান পেশ করার জন্য তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তাহাড়া কুরআন মজীদ যে ধরনের কিতাব কোন ব্যক্তি গভীর মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করার পর একথা তার সামনে সৃষ্টি হয়ে উঠবে যে, একই ধরনের বিষয়বস্তুকে এক জায়গায় একত্র করার বিষয়টি কুরআনের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের প্রকৃতিই দাবী করে, তার পাঠকের সামনে মাদানী পর্যায়ের কথা মক্কী যুগের শিক্ষার মধ্যে, মক্কী পর্যায়ের কথা মাদানী যুগের বক্তৃতাবলীর মধ্যে এবং প্রাথমিক যুগের আলোচনা শেষ যুগের উপদেশাবলীর মধ্যে এবং শেষ যুগের বিধানসমূহ সূচনাকালের শিক্ষাবলীর পাশাপাশি বার বার আলোচিত হবে। এভাবে ইসলামের পূর্ণ, ব্যাপকতর ও সামগ্রিক চিত্র তার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। ইসলামের একটি দিক তার চোখের সামনে থাকবে এবং অন্য দিকটি থাকবে তার চোখের আড়ালে, কখনো এমনটি যেন না হয়।

তারপরও কুরআন যে ক্রমানুসারে নাযিল হয়েছিল যদি সেভাবেই তাকে বিন্যস্ত করা হতো তাহলে পরবর্তীকালে আগত লোকদের জন্য তা কেবল সেই অবস্থায় অর্থপূর্ণ হতে পারতো যখন কুরআনের সাথে সাথে তার নাযিলের ইতিহাস এবং তার এক একটি অংশের নাযিল হওয়ার অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত লিখে দেয়া হতো। এ অবস্থায় তা পরিশিষ্ট আকারে কুরআনের একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হতো। মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী একত্র করে বিন্যস্ত ও সংরক্ষণ করেছিলেন এটি ছিল তার পরিপন্থী। আল্লাহর কালামকে নির্ভেজাল অবস্থায় অন্য কোন কালাম, বাণী বা কথার মিশ্রণ বা অন্তরভুক্ত ছাড়াই সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত করাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ কালাম পাঠ করবে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, নারী, পুরুষ, নগরবাসী, গ্রামবাসী, শিক্ষিত সুবী, পঙ্গিত, সাধারণ শিক্ষিত নিবিশেষে সকল শরের মানুষ। সর্বযুগে, সর্বকালে সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় তারা এ কালাম পড়বে। সর্বস্তরের বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পর্ক মানুষ কমপক্ষে এতটুকু কথা অবিশ্য জেনে নেবে যে তাদের মহান প্রভু তাদের কাছে কি চান এবং কি চান না। বলা বাহুল্য যদি এই সমগ্র কালামের সাথে একটি সুনীর ইতিহাসও জুড়ে দেয়া থাকতো এবং তা পাঠ করাও সবার জন্য অপরিহার্য গণ্য করা হতো তাহলে এ কালামকে সুবিন্যস্ত ও সুসংরক্ষিত করার পেছনে মহান আল্লাহর যে উদ্দেশ্য ছিল তা ব্যর্থ হয়ে যেতো।

আসলে কুরআনের বর্তমান বিন্যাসকে যারা আপত্তিকর মনে করেন তারা এই কিতাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কেবল অনবিহিতই নন বরং তারা এই বিভিন্নির শিকার হয়েছেন বলে মনে হয় যে, এ কিতাবটি কেবল মাত্র ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য অবর্তীণ হয়েছে।

কুরআনের বর্তমান বিন্যাস সম্পর্কে পাঠকদের আর একটি কথা জেনে নেয়া উচিত। এই বিন্যাস পরবর্তীকালের লোকদের হাতে সাধিত হয়নি। বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কুরআনের আয়তগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত ও সংযোজিত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর চিরাচরিত নিয়ম ছিল, কোন সূরা নাযিল হলে তিনি তখনই নিজের কোন কাতেবকে (কুরআন লেখক) ডেকে নিতেন এবং সূরার আয়তগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করাতেন। এরপর নির্দেশ দিতেন, এ সূরাটি অমুক সূরার পরে বা অমুক সূরার আগে বসাও। অনুরূপভাবে কখনো কুরআনের কিছু অংশ নাযিল হতো। এটাকে একটি স্বতন্ত্র সূরায় পরিণত করার উদ্দেশ্য থাকতো না। সে ক্ষেত্রে তিনি নির্দেশ

দিতেন, একে অমুক সূরার অমুক স্থানে সরিবেশ করো। অতপর এই বিন্যাস অনুযায়ী তিনি নিজে নামাযেও পড়তেন। অন্যান্য সময় কুরআন মজীদ তেলাওয়াতও করতেন। এই বিন্যাস অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম কুরআন মজীদ কঠস্থও করতেন। কাজেই কুরআনের বিন্যাস একটি প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। যেদিন কুরআন মজীদের নাযিলের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় সেদিন তার বিন্যাসও সম্পূর্ণ হয়ে যায়। যিনি এটি নাযিল করেছিলেন তিনি এটি বিন্যন্তও করেন। যাঁর হৃদয়ের পরদায় এটি নাযিল করেছিলেন তাঁরই হাতে এটি বিন্যন্তও করান। এর মধ্যে অনুপবেশ বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার ও ক্ষমতাই কারোর ছিল না।

### কুরআন কিভাবে সংকলিত হলো

যেহেতু নামায শুরু থেকেই মুসলমানদের উপর ফরয ছিল<sup>১</sup> এবং কুরআন পাঠকে নামাযের একটি অপরিহার্য অংশ গণ্য করা হয়েছিল, তাই কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে কুরআন কঠস্থ করার প্রক্রিয়াও জারী হয়ে গিয়েছিল। কুরআন যতটুকু নাযিল হয়ে যেতো মুসলমানরা ততটুকু কঠস্থও করে ফেলতো। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে নিজের কাতেবদের সাহায্যে খেজুর পাতা, হাড় ও পাথর খণ্ডের উপর কুরআন লেখার যে ব্যবস্থা করেছিলেন কেবলমাত্র তার উপর কুরআনের হেফায়ত নির্ভরশীল ছিল না বরং নাযিল হবার সাথে সাথেই শত শত থেকে হাজার হাজার এবং হাজার হাজার থেকে লাখো লাখো হৃদয়ে তার নকশা আঁকা হয়ে যেতো। এর মধ্যে একটি শব্দেরও হেরফের করার ক্ষমতা কোন শয়তানেরও ছিল না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিকালের পর আরবদেশে বেশ কিছু লোক ‘মুরতাদ’ হয়ে গেলো। তাদের দমন করা এবং একদল মুসলমানের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিঙ্গ হতে হলো। এসব যুদ্ধে এমন অনেক সাহাবা শহীদ হয়ে গেলেন যাদের সমগ্র কুরআন কঠস্থ ছিল। এ ঘটনায় হ্যরত উমরের (রা) মনে চিন্তা জাগলো, কুরআনের হেফায়তের ব্যাপারে কেবলমাত্র একটি মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল থাকা সংগত নয়। শুধু দিলের উপর কুরআনের বাণী অংকিত থাকলে হবে না তাকে কাগজের পাতায়ও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তদানীন্তন খলীফা হ্যরত আবু বকরের (রা) কাছে তিনি বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন। কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর তিনিও তাঁর সাথে একমত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাতেব (সেক্রেটারী) হ্যরত যায়েদকে (রা) এ কাজে নিযুক্ত করলেন। এ জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হলো তা হলো এই : একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব বিচ্ছিন্ন বস্তুর উপর কুরআন লিখে গেছেন সেগুলো সংযোগ করা। অন্যদিকে সাহাবীদের মধ্যে যার যার কাছে কুরআনের

১. উল্লেখ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাতের কয়েক বছর পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। কিন্তু সাধারণতাবে নামায ফরয হিল প্রথম দিন থেকেই। ইসলামের জীবনের এমন একটি মূরূতও অতিক্রান্ত হয়নি যখন নামায ফরয হয়নি।

যেসব বিচ্ছিন্ন অংশ লিখিত আছে তাদের কাছ থেকে সেগুলোও সংগ্রহ করা।<sup>১</sup> এই সাথে কুরআনের হাফেয়দের থেকেও সাহায্য নেয়া। এই তিনটি মাধ্যমকে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে নির্ভুল হবার ব্যাপারে শক্তকরা একশ' ভাগ নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করার পর কুরআনের এক একটি হরফ, শব্দ ও বাক্য গ্রহণকারে লিপিবদ্ধ করা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কুরআন মজীদের একটি নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংকলন তৈরি করে উচ্চুল মু'মেনীন হ্যরত হাফসা রাদিয়াগ্লাহ আনহার কাছে রেখে দেয়া হলো। সবাইকে তার অনুলিপি করার অথবা তার সাথে যাচাই করে নিজের পাঞ্জুলিপি সংশোধন করে নেয়ার সাধারণ অনুমতি দেয়া হলো।

একই ভাষা হওয়া সন্তোষ আমাদের দেশের বিভিন্ন শহর ও জেলার কথ্যভাষার মধ্যে যেমন পার্থক্য দেখা যায় আরবের বিভিন্ন এলাকার ও গোত্রের কথ্যভাষার মধ্যেও তেমনি পার্থক্য ছিল। মক্কার কুরাইশেরা যে ভাষায় কথা বলতো কুরআন মজীদ সেই ভাষায় নাযিল হয়। কিন্তু প্রথম দিকে বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রের লোকদের তাদের নিজ নিজ উচ্চারণ ও বাক্তব্যে অনুযায়ী তা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কারণ এভাবে পড়ায় অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য হতো না। কেবলমাত্র বাক্য তাদের জন্য একটু কোমল ও মোলায়েম হয়ে যেতো। কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলাম বিস্তার লাভ করলো। আরববাসীরা নিজেদের মরম্ভূমির এলাকা পেরিয়ে দুনিয়ার একটি বিশাল বিস্তীর্ণ অংশ জয় করলো। অন্যান্য দেশের ও জাতির লোকেরা ইসলামের চতৃঃসীমার মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। আরব ও অন্যান্য অন্যান্য দেশের ব্যাপকতর মিশ্রণে আরবী ভাষা প্রভাবিত হতে থাকলো। এ সময় আশংকা দেখা দিল, এখনো যদি বিভিন্ন উচ্চারণ ও বাকরীতিতে কুরআন পড়ার অনুমতি অব্যাহত রাখা হয়, তাহলে এর ফলে নানা ধরনের ফেননা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অপরিচিত পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে শুনে সে সেচ্ছাকৃতভাবে কুরআনে বিকৃতি সাধন করছে বলে তার সাথে বিরোধে ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। অথবা এই শান্তিক পার্থক্য ধীরে ধীরে বাস্তব বিকৃতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। অথবা আরব অন্যান্য দেশের ফলে যেসব লোকের ভাষা বিকৃত হবে তারা নিজেদের বিকৃত ভাষা অনুযায়ী কুরআনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে তার বাক সৌন্দর্যের বিকৃতি সাধন করবে। এ সমস্ত কারণে হ্যরত উসমান রাদিয়াগ্লাহ আনহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের সাথে প্রারম্ভ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় একমাত্র হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াগ্লাহ আনহর নির্দেশে লিখিত কুরআন মজীদের নোস্থা (অনুলিপিই) চালু করা হবে। এ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত উচ্চারণ ও বাকরীতিতে লিখিত নোস্থাৰ প্রকাশ ও পাঠ নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করা হবে।

১. নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, রসূলের (সা) জীবদ্ধশায়ই বিভিন্ন সাহায্য কুরআন বা তার বিভিন্ন অংশ লিখে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে হ্যরত উসমান (রা), হ্যরত আলী (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা), হ্যরত সালেম মাওলা হ্যাইফা (রা), হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হ্যরত মুআয় ইবনে জাবাল (রা), হ্যরত উবাই ইবনে কাব (রা) এবং হ্যরত আবু যায়েদ কায়েস ইবনিস সাকান রাদিয়াগ্লাহ আনহর নাম পাওয়া যায়।

আজ যে কুরআন মজীদটি আমাদের হাতে আছে সেটি হ্যরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নোস্থার অনুলিপি। এই অনুলিপিটি হ্যরত উসমান (রা) সরকারী ব্যবস্থাপনায় সারা দুনিয়ার দেশে দেশে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমানেও দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে কুরআনের সেই প্রামাণ্য নোস্থাগুলো পাওয়া যায়। কুরআন মজীদ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবার ব্যাপারে যদি কারোর মনে সামান্যতমও সংশয় থাকে তাহলে মানসিক সংশয় দূর করার জন্য তিনি পঞ্চম আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার কোন বই বিক্রিতার দোকান থেকে এক খণ্ড কুরআন মজীদ কিনে নিতে পারেন। তারপর সেখান থেকে চলে আসতে পারেন ইলোনেশিয়ার জাভায়। জাভার কোন হাফেয়ের মুখে কুরআনের পাঠ শুনে পঞ্চম আফ্রিকা থেকে কেনা তাঁর হাতের নোস্থাটির সাথে তা মিলিয়ে দেখতে পারেন। অতপর দুনিয়ার বড় বড় গ্রন্থাগারগুলোয় হ্যরত উসমানের (রা) আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তকার যতগুলো কুরআনের নোস্থা রক্ষিত আছে সবগুলোর সাথে সেটি মিলাতে পারেন। তিনি যদি তার মধ্যে কোন একটি হরফ নোকৃতার পার্থক্য দেখতে পান তাহলে সারা দুনিয়াকে এই অভিনব আবিকারের খবরটি জানানো তাঁর অবশ্যি কর্তব্য। কুরআন আগ্রাহীর পক্ষ থেকে নায়িল হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহকারী সন্দেহ করতে পারেন। কিন্তু যে কুরআনটি আমাদের হাতে আছে সেটি সামান্যতম হেরফের ও পরিবর্তন ছাড়াই মূহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লামের ওপর যে কুরআনটি নায়িল হয়েছিল এবং যেটি তিনি দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন তারই হ্বহ অনুলিপি, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এমন অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সংস্কৃতি সত্য দুনিয়ার ইতিহাসে আর হিতীয়টি পাওয়া যাবে না। এরপরও যদি কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে বলতে হয়, দুনিয়ায় কোন কালে রোমান সাম্রাজ্য বলে কোন সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং মোগল রাজবংশ কোন দিন ভারত শাসন করেছেন অথবা দুনিয়ায় নেপোলিয়ান নামক কোন ব্যক্তি ছিলেন—এ ব্যাপারেও তিনি অবশ্যি সন্দেহ পোষণ করবেন। এ ধরনের ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা জ্ঞানের নয়, বরং অভিজ্ঞতারই প্রমাণ।

### কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

কুরআন একটি অসাধারণ গ্রন্থ। দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ অসংখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআনের দিকে এগিয়ে আসে। এদের সবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোন পরামর্শ দেয়া মানুষের পক্ষে সঙ্গবপর নয়। এ বিপুল সংখ্যক অনুসন্ধানীদের মধ্যে যারা একে বুঝতে চান এবং এ কিভাবটি মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কোনু ধরনের ভূমিকা পালন করে এবং তাকে কিভাবে পথ দেখায় একথা যারা জানতে চান আমি কেবল তাদের ব্যাপারেই আগ্রহী। এ ধরনের লোকদের কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আমি এখানে কিছু পরামর্শ দেবো। আর এই সংগে সাধারণত লোকেরা এ ব্যাপারে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তারও সমাধান করার চেষ্টা করবো।

কোন ব্যক্তি কুরআনের ওপর ঈমান রাখুন আর নাই রাখুন তিনি যদি এই কিভাবকে বুঝতে চান তাহলে সর্বপ্রথম তাঁকে নিজের মন-মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত চিত্তাধারা ও মতবাদ এবং অনুকূল-প্রতিকূল উদ্দেশ্য ও স্বার্থচিন্তা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করতে হবে।

এ কিতাবটি বুঝার ও হ্রদয়ংগম করার নির্ভেজাল ও আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে এর অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। যারা মনের মধ্যে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা পুষ্ট রেখে এ কিতাবটি পড়েন তারা এর বিভিন্ন ছত্রের মাঝখানে নিজেদের চিন্তাধারাই পড়ে যেতে থাকেন। আসল কুরআনের সামান্য বাতাসটুকুও তাদের গায়ে লাগে না। দুনিয়ার যে কোন বই পড়ার ব্যাপারেও এ ধরনের অধ্যয়ন রীতি ঠিক নয়। আর বিশেষ করে কুরআন তো এই ধরনের পাঠকের জন্য তার অন্তরনিহিত সত্য ও গভীর তাৎপর্যময় অর্থের দূয়ার কথনোই উন্মুক্ত করে না।

তারপর যে বাস্তি কুরআন সম্পর্কে ভাসাতাসা জ্ঞান লাভ করতে চায় তার জন্য সম্ভবত একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু যে এর অর্থের গভীরে নামতে চায় তার জন্য তো দু'বার পড়ে নেয়াও যথেষ্ট হতে পারে না। অবশ্য তাকে বার বার পড়তে হবে। প্রতি বার একটি নতুন ভঙ্গীমায় পড়তে হবে। একজন ছাত্রের মতো পেপিল ও নেটোবই সাথে নিয়ে বসতে হবে। জায়গা মতো প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করতে হবে। এভাবে যারা কুরআন পড়তে প্রস্তুত হবে, কুরআন যে চিন্তা ও কর্মধারা উপস্থাপন করতে চায় তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটা যেন তাদের সামনে তেসে ওঠে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তাদের অস্তপক্ষে দু'বার এই কিতাবটি পড়তে হবে। এই প্রাথমিক অধ্যয়নের সময় তাদের কুরআনের সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের দেখতে হবে, এই কিতাবটি কোনু কোন মৌলিক চিন্তা পেশ করে এবং সেই চিন্তাধারার উপর কিভাবে জীবন ব্যবহার অট্টালিকার ভিত্তি গড়ে তোলে, এ সময়—কালে কোন জ্ঞানগায় তার মনে যদি কোন প্রশ্ন জাগে বা কোন খুঁকা লাগে, তাহলে তখনি সেখানেই সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং সেটি নোট করে নিতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে সামনের দিকে অধ্যয়ন জারী রাখতে হবে। সামনের দিকে কোথাও না কোথাও তিনি এর জবাব পেয়ে যাবেন, এরি সভাবনা বেশী। জবাব পেয়ে গেলে নিজের প্রশ্নের পাশাপাশি সেটি নোট করে নেবেন। কিন্তু প্রথম অধ্যয়নের পর নিজের কোন প্রশ্নের জবাব না পেলে ধৈর্য সহকারে দ্বিতীয় বার অধ্যয়ন করতে হবে। আরি নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, দ্বিতীয়বার গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর কালেভদ্রে কোন প্রশ্নের জবাব অনুদৃষ্টিত থেকে গেছে।

এভাবে কুরআন সম্পর্কে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করার পর এর বিস্তারিত অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। এ প্রসংগে পাঠককে অবশ্য কুরআনের শিক্ষার এক একটি দিক পূর্ণরূপে অনুধাবন করার পর নোট করে নিতে হবে। যেমন মানবতার কোনু ধরনের আদর্শকে কুরআন পছন্দনীয় গণ্য করেছে অথবা মানবতার কোনু ধরনের আদর্শ তার কাছে গুণার্থ ও প্রত্যাখ্যাত—একথা তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এই বিষয়টিকে ভালোভাবে নিজের মনের মধ্যে গেথে নেয়ার জন্য তাকে নিজের নোট বইতে একদিকে লিখতে হবে ‘পছন্দনীয় মানুষ’ এবং অন্যদিকে লিখতে হবে ‘অপছন্দনীয় মানুষ’ এবং উভয়ের নীচে তাদের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী লিখে যেতে হবে। অথবা যেমন, তাকে জানার চেষ্টা করতে হবে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কোনু কোনু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং কোনু কোনু জিনিসকে সে মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধৰ্মসাত্ত্বক গণ্য করে—এ বিষয়টিকেও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আগের পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ নোট বইতে কল্যাণের জন্য অপরিহার্য বিষয়সমূহ এবং ক্ষতির জন্য অনিবার্য

বিষয়সমূহ' এই শিরোনামে দুটি পাশাপাশি লিখতে হবে। অতপর প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয় দুটি সম্পর্কে নোট করে যেতে হবে। এ পদ্ধতিতে আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা, অধিকার, কর্তব্য, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, দলীয় সংগঠন-শৃঙ্খলা, যুদ্ধ, সক্রিয় এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলী সম্পর্কে কুরআনের বিধান নোট করতে হবে এবং এর প্রতিটি বিভাগের সামগ্রিক চেহারা কি দৰ্ঢায়, তারপর এসবগুলোকে এক সাথে মিলালে কোন ধরনের জীবন চিত্র ফুটে ওঠে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

আবার জীবনের বিশেষ কোন সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে হলে এবং সে ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিকৌণ্ডী জানতে হলে সেই সমস্যা সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এই অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলো সূপ্রস্তুতভাবে জেনে নিতে হবে। মানুষ আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কি কি চিন্তা করেছে এবং তাকে কিভাবে অনুধাবন করেছে? কোন কোন বিষয় এখনো সেখানে সমাধানের অপেক্ষায় আছে? মানুষের চিন্তার গাড়ি কোথায় গিয়ে আটকে গেছে? এই সমাধানযোগ্য সমস্যা ও বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কোন বিষয় সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিকৌণ্ডী জানার এটিই সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর পথ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এভাবে কোন বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকলে এমন সব আয়াতের মধ্যে নিজের প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যাবে যেগুলো ইতিপূর্বে কয়েকবার পড়া হয়ে থাকলেও এই তত্ত্ব সেখানে লুকিয়ে আছে একথা ঘুণাঘুণেও মনে জাগেন।

### কুরআনের প্রাণসন্তা অনুধাবন

কিন্তু কুরআন বুকার এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করার বিধান ও নির্দেশ নিয়ে কুরআন এসেছে কার্যত ও বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কুরআনের প্রাণসন্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে না। এটা নিছক কোন মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম কেদারায় বসে বসে এ বইটি পড়লে এর সব কথা বুঝতে পারা যাবার কথা নয়। দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্ম চিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থও নয়। মাদরাসায় ও খানকাহে বসে এর সমস্ত রহস্য ও গভীর তত্ত্ব উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। শুরুতে ভূমিকায় বলা হয়েছে, এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। সে এসেই এই নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্জন ও নিঃসংগ জীবন ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আগ্নাহ বিরোধী দুনিয়ার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার কল্পে যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফরী, ফাসেকী ও ভষ্টার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাকে প্রচণ্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচরিত্র সম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুজে বের করে এনে সত্যের আহবায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকার ফিতনাবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে বিকুন্দ ও উত্তেজিত করে সত্যানুসারীদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তির আহবানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে খিলাফতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এই কিতাবটি এই বিরাট ও মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছে। এক ও বাতিলের এই

সুদীর্ঘ ও প্রাগান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মনযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই সে একদিকে ভাস্ত্রার পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নকশা। এখন বলুন, যদি আপনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত এবং দীন ও কুরুফীর সংগ্রামে অংশগ্রহণই না করেন, যদি এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মনযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার ভাগ্যে না ঘটে, তাহলে নিছক কুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলে তার সমৃদ্ধ তত্ত্ব আপনার কেমন করে উদয়চিত হয়ে যাবে? কুরআনকে পূরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি নিজেই কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আগ্রাহ দিকে আহবান করার কাজ শুরু করবেন এবং এই কিতাব যেভাবে পথ দেখায় সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে থাকবেন। একমাত্র তখনই কুরআন ন্যায়িলের সময়কালীন অভিজ্ঞাণগুলো আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। যেক্তা, হাবশা (বর্তমান ইথিয়োপিয়া) ও তায়েফের মনযিলও আপনি দেখবেন। বদর ও ওহোদ থেকে শুরু করে হনাইন ও তাবুকের মনযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মুখ্যমূখ্য হবেন। মুনাফিক ও ইহুদিদের সাক্ষাতেও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের উৎসর্গীত প্রাণ মু'মিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মু'মিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটা এক ধরনের ‘সাধনা’। একে আমি বলি “কুরআনী সাধনা।” এই সাধন পথে ফুটে ওঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতগুলো মনযিল অতিক্রম করতে থাকবেন তার প্রতিটি মনযিলে কিছু আয়াত ও সূরা আপনা আপনি আপনার সামনে এসে যাবে। তারা আপনাকে বলতে থাকবে—এই মনযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেখানে এই বিধানগুলো এনেছিল। সে সময় অভিধান, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রীয় কিছু তত্ত্ব সাধকের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে কিন্তু কুরআন নিজের প্রাণস্তোকে তার সামনে উন্মুক্ত করতে কার্য্য করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না।

আবার এই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের বিধানসমূহ, তার নৈতিক শিক্ষাবলী, তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি বিধান এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে তার প্রদীপ্ত নীতি-নিয়ম ও আইনসমূহ বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না সে বাস্তবে নিজের জীবনে এগুলো কার্যকর করে দেখবে। যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের অনুসৃতি নেই সে তাকে বুঝতে পারবে না। আর যে জাতির সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান কুরআন বিবৃত পথ ও কর্মনীতির বিপরীত দিকে চলে তার পক্ষেও এর সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়।

### কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজ্ঞানতা

কুরআন সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে পথ দেখাবার দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে, একথা সবাই জানে। কিন্তু কুরআন পড়তে বসেই কোন ব্যক্তি দেখতে পায়, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নায়িল হবার সমকালীন আরববাসীদেরকে লক্ষ্য করেই তার বক্তব্য পেশ করেছে। তবে কখনো কখনো মানব জাতি ও সাধারণ মানুষকেও সর্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে এমন সব কথা বলে যা আরববাসীদের রূচি-অভিমুক্তি, আরবের পারিপাশিক পরিবেশ, ইতিহাস ও রীতিনীতির সাথেই সম্পর্কিত। এসব দেখে এক ব্যক্তি চিন্তা করতে থাকে, সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখাবার জন্য যে কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছিল তার মধ্যে

সাময়িক, স্থানীয় ও জাতীয় বিয়বস্তু ও উপাদান এত বেশী কেন? এ বিয়টির তাৎপর্য অনুধাবন না করার কারণে অনেকের মনে সন্দেহ জাগে। তারা মনে করেন, সম্ভবত এ কিতাবটি সমকালীন আরববাসীদের সংঘেশন ও সংক্ষারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে জোরপূর্বক টানা হেঢ়া করে তাকে চিরস্তনভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান গণ্য করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি নিছক অভিযোগ হিসেবে নয় বরং বাস্তবে কুরআন বুঝার জন্য এ ধরনের অভিযোগ আনেন তাকে আমি একটি পরামর্শ দেবো। প্রথমে কুরআন পড়ার সময় সেই সমস্ত স্থানগুলো একটু দাগিয়ে রাখুন যেখানে কুরআন কেবল মাত্র আরবদের জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে স্থান-কাল ও সময় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এমন আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা বা ভাবধারা অথবা নৈতিক বিধান বা কার্যকর নিয়ম-কানুন উপস্থাপন করেছে। কুরআন একটি বিশেষ স্থানে একটি বিশেষ যুগের লোকদেরকে সংযোধন করে তাদের মুশরিকী বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং তাদেরই আশেপাশের জিনিসগুলোকে ডিস্ট্রিভ করে তাওহীদের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ দাঁড় করায়—নিছক এতটুকু কথার ভিত্তিতে কুরআনের দাওয়াত ও তার আবেদন স্থানীয় ও সাময়িক, একথা বলা যথেষ্ট হবে না। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, শিরকের প্রতিবাদে সে যা কিছু বলে তা কি দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিটি শিরকের ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে খাপ খেয়ে যায় না যেমন আরবের মুশরিকদের শিরকের সাথে খাপ খেয়ে গিয়েছিল? সেই একই যুক্তি প্রমাণগুলোকে কি আমরা প্রতিটি যুগের ও প্রতিটি দেশের মুশরিকদের চিন্তার পরিশুল্ক করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি না? আর তাওহীদের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনী প্রমাণ পদ্ধতিকে কি সামান্য রদবদল করে সবসময় ওসব জায়গায় কাজে লাগানো যেতে পারে না? জবাব যদি ইতিবাচক হয়ে থাকে, তাহলে একটি বিশ্বজনীন শিক্ষা কেবল মাত্র একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ জাতিকে সংযোধন করে দান করা হয়েছিল বলেই তাকে স্থানীয় ও সাময়িক বলার কোন কারণই থাকতে পারে না। দুনিয়ায় এমন কোন দর্শন, জীবন ব্যবস্থা ও চিন্তা দর্শন নেই যার প্রথম থেকে নিয়ে শেষ অবধি সমস্ত কথাই কস্তুরিপদ্ধতি (Abstrusacy) বর্ণনাভঙ্গীতে পেশ করা হয়েছে। বরং কোন একটি বিশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে তার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এ ধরনের পূর্ণ বস্তু নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও তা নিছক কাজীর গরুর মতো খাতাপত্রেই থাকবে, গোয়ালে তার নামনিশানাও দেখা যাবে না। কাজেই মানুষের জীবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে তার পক্ষে কোন বাস্তব বিধানের রূপ নেয়া কোন দিনই সম্ভব হবে না।

তাছাড়া কোন চিন্তামূলক, নৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে চাইলে তার জন্য আদৌ এর কোন প্রয়োজন নেই। বরং যথার্থই বলতে হয়, শুরু থেকেই তাকে আন্তর্জাতিক বানাবার চেষ্টা করা তার জন্য কল্যাণকরণ নয়। আসলে তার জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পথ একটিই। এই আন্দোলনটি যেসব চিন্তাধারা, মতবাদ ও মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাকে পূর্ণ শক্তিতে সেই দেশেই পেশ করতে হবে যেখান থেকে তার দাওয়াতের সূচনা হয়েছে। সেই দেশের লোকদের মনে এই দাওয়াতের তাৎপর্য অর্থকিত করে দিতে হবে, যাদের ভাষা, শ্বাব, প্রকৃতি, অভ্যাস ও আচরণের সাথে আন্দোলনের আহবায়ক নিজে

সুপরিচিত। তারপর তাকে নিজের দেশেই ঐ মূলনীতিগুলো বাস্তবায়িত করে তার ভিত্তিতে একটি সফল জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার শাখায়ে বিশ্বাসীর সামনে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তবেই তো দুনিয়ার অন্যান্য জাতির তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের বৃক্ষজীবী শ্রেণী ব্রহ্মচূর্ণত্বাবে এগিয়ে এসে তাকে অনুধাবন করতে ও নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে। কাজেই কোন চিন্তা ও কর্মব্যবস্থাকে প্রথমে শুধুমাত্র একটি জাতির সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র তাদেরকেই বুঝাবার ও নিশ্চিত করার জন্য যুক্তি প্রদর্শনের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল বলেই তা নিছক একটি জাতীয় দাওয়াত ও আন্দোলন—একথা বলার পেছনে কোন যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে একটি জাতীয় ও একটি আন্তর্জাতিক এবং একটি সাময়িক ও একটি চিরস্তন ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিশেষত্বগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে : জাতীয় ব্যবস্থা হয় একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য বা তার বিশেষ অধিকারসমূহের দাবীদার। অথবা তার নিজের মধ্যে এমন কিছু নীতি ও মতাদর্শ থাকে যা অন্যান্য জাতির মধ্যে ঠাই পেতে পারে না। বিপরীত পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সকল মানুয়ের মর্যাদা হয় সমান, তাদের সমান অধিকার দিতেও সে প্রস্তুত হয় এবং তার নীতিগুলোর মধ্যেও বিশ্বজনীনতার সঙ্কান পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে একটি সাময়িক ব্যবস্থা অবশ্যি এমন কিছু নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যেগুলো কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সমস্ত কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। আর এর বিপরীত পক্ষে একটি চিরস্তন ব্যবস্থার নীতিগুলো সব রকমের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে থাপ থেঁয়ে চলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো দৃষ্টির সামনে রেখে যদি কোন ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং যে বিষয়গুলোর কারণে সত্ত্ব সত্ত্বাই কুরআন উপস্থাপিত ব্যবস্থাকে সাময়িক বা জাতীয় হবার ধারণা পোষণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হবেন, এতে সন্দেহ নেই।

### পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

কুরআন সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠকও শনেছেন যেমন এটি একটি বিস্তারিত পথনির্দেশনা, জীবন বিধান ও আইন হ্রস্ব। বিস্তু কুরআন পড়ার পর সেখানে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা ও বিধি-বিধানের সঙ্কান সে পায় না। বরং সে দেখে, নামায ও ধাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয়ও—যার উপর কুরআন বার বার জোর দিয়েছে, তার জন্যও এখানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান বিস্তারিতভাবে দান করা হচ্ছিল। কাজেই এ কিতাবটি কোনু অর্থে একটি পথনির্দেশনা ও জীবন বিধান তা বুঝতে মানুয় অক্ষম হয়ে পড়ে। পাঠকের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

সত্ত্বের একটি দিক মানুয়ের দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে যাওয়ার কারণেই এ ব্যাপারে যাবতীয় সহস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কেবল এই কিতাবটিই নাহিল করেননি, তিনি এই সাথে একজন পয়গায়রও পাঠিয়েছেন। আসল পরিকল্পনাটাই যদি হতো লোকদের হাতে এবং কেবলমাত্র একটি গৃহনির্মাণের নকশা দিয়ে দেয়া এবং তারপর তারা সেই অনুযায়ী নিজেদের ইমারতটি নিজেরাই বানিয়ে নেবে, তাহলে এ অবস্থায় নিস্তলেহে গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত হেট বড় প্রতিটি খুচিনাটি বিষয়ের

বিশ্বারিত বিবরণ আমদের হাতে দিয়ে দিতে হতো। কিন্তু গৃহনির্মাণের নির্দেশের সাথে সাথে যখন একজন ইঞ্জিনিয়ারও সরকারীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ঐ নির্দেশ অনুযায়ী একটি ইমারতও তৈরি করে ফেলেন তখন ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর নির্মিত ইমারতটিকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নকশার মধ্যে সমগ্র ছোট বড় খুটিনাটি বিষয়ের বিশ্বারিত চিত্র সঙ্কান করা এবং সেখানে তা না পেয়ে নকশাটার বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণতার অভিযোগ আনা কোনোক্ষণেই সঠিক হতে পারে না। কুরআন খুটিনাটি বিষয়ের বিশ্বারিত বিবরণ সংক্ষিপ্ত কোন কিতাব নয়। বরং এই কিতাবে মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়গুলোই উপস্থাপিত হয়েছে। এর আসল কাজ ইসলামী জীবন ব্যবহার চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তিগুলোর কেবল পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপনাই নয় বরং এই সংগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ ও আবেগময় আবেদনের যাধ্যমে এগুলোকে প্রচণ্ড শক্তিশালী ও দৃঢ়ভাবে সংবচ্ছ করা। অন্যদিকে ইসলামী জীবনধারার বাস্তব কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে কুরআন মানুষকে জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিশ্বারিত নীতি-নিয়ম ও আইন বিধান দান করে না বরং জীবনের প্রতিটি বিভাগের চৌহন্দি বাতলে দেয় এবং সুস্পষ্টভাবে এর কয়েকটি কোণে নিশান ফলক গেড়ে দেয়। এ থেকে আগ্রাহ ইচ্ছা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর গঠন ও নির্মাণ কোন পথে হওয়া উচিত, তা জানা যায়। এই নির্দেশনা ও বিধান অনুযায়ী বাস্তবে ইসলামী জীবনধারার কাঠামো তৈরি করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ ছিল। দুনিয়াবাসীদের সামনে কুরআন প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি চরিত্র এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব আদর্শ উপস্থাপন করার জন্যই তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

### বৈধ মতপার্থক্য

আর একটি প্রশ্নও এই প্রসংগে সাধারণভাবে লোকদের মনে জাগে। প্রশ্নটি হচ্ছে, একদিকে কুরআন এমন সব লোকের কঠোর নিদা করে যারা আগ্রাহ কিতাব অবতীর্ণ হবার প্রণ মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবদ্দির পথে পাড়ি জমায় এবং এভাবে নিজেদের দীনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও খণ্ডিত করে। অথচ অন্যদিকে কুরআনের বিধানের অর্থ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরবর্তীকালের আলেমগণই নন, প্রথম যুগের ইমামগণ, তাবেদিন ও সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও বিপুল মতবিরোধ পাওয়া যায়। সম্ভবত বিধান সংক্ষিপ্ত এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না যার ব্যাখ্যায় সবাই একমত হয়েছেন। তাহলে কুরআনে উল্লেখিত নিদা কি এদের ওপর প্রযোজ্য হবে? যদি এরা ঐ নিদার পাত্র না হয়ে থাকেন, তাহলে কুরআন কোন্ ধরনের মতবিরোধ ও দলাদলির বিরুদ্ধে নিয়েধাজ্ঞা আরোপ করছে?

এটি একটি বিশ্বারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। এখানে এ ধরনের আলোচনার সুযোগ নেই। কুরআনের একজন সাধারণ পাঠক ও একজন প্রাথমিক জ্ঞানার্জনকারীর সংশয় দ্রু করার জন্য এখানে কেবল সামান্য একটু ইঞ্জিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। দীন ও ইসলামী জীবন ব্যবহার ক্ষেত্রে একমত এবং ইসলামী দলীয় সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ থেকেও নিছক ইসলামী বিধান ও আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে আতরিক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটে কুরআন তার বিরোধী নয়। বিপরীত পক্ষে কুরআন এমন ধরনের মতবিরোধের

নিষ্ঠা করে, যার সূচনা হয় স্বার্থকৃতা ও বক্ত দৃষ্টির মাধ্যমে এবং অবশ্যে তা দলাদলি ও পারস্পরিক বিরোধে পরিণত হয়। এই দুই ধরনের মতবিরোধ মূলত একই পর্যায়ের নয় এবং ফলাফলের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। কাজেই একই লাঠি দিয়ে উভয়কে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং উভয়ের বিরুদ্ধে একই হকুম জারী করা উচিত নয়। প্রথম ধরনের মতবিরোধ উন্নতির প্রাণকেন্দ্র ও মানুষের জীবনে প্রাণস্পন্দন স্বরূপ। বৃক্ষিমান ও চিনালীন লোকদের সমাজে এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবেই। এর অস্তিত্বই জীবনের আলামত। যে সমাজে বৃক্ষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে বরং সেখানে রক্ষণাত্মক মানুষের পরিবর্তে কাঠের মানুষের বিচরণ করছে একমাত্র সেখানেই এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আর দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধটির ব্যাপারে সারা দুনিয়ার মানুষই জানে, যে দেশে ও যে সমাজে তা মাথাচাঢ়া দিয়ে উঠেছে তাকেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার অস্তিত্ব স্থান্ত্রের নয়, রোগের আলামত। কোন উম্মাতকে সে শুভ পরিণতির দিকে এগিয়ে দিতে পারেনি। এই উভয় ধরনের মতবিরোধের পার্থক্যের চেহারাটি নিম্নোক্তভাবে অনুধাবন করুন :

এক ধরনের মতপার্থক্যে আগ্রাহ ও রসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সমগ্র ইসলামী সমাজে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বসম্মতিক্রমে জীবন বিধানের উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হবে। এরপর দু'জন আলেম কোন অমৌলিক তথা খুটিনাটি বিষয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অথবা দু'জন বিচারক কোন মামলার সিদ্ধান্ত দানে পরম্পরের সাথে বিরোধ করবেন, কিন্তু তাদের কেউই এই বিষয়টিকে এবং এর মধ্যে প্রকশিত নিজের মতামতকে দীনের ভিত্তিতে পরিণত করবেন না। আর এই সাথে তার সংগে মতবিরোধকারীকে দীন থেকে বিচ্ছৃত ও দীন বহির্ভূত গণ্য করবেন না। বরং উভয়েই নিজেদের যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ পেশ করে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী অনুসন্ধানের ইক আদায় করে দেবেন। সাধারণ জনমত, অথবা বিচার বিভাগীয় বিষয় হলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত অথবা সামাজিক বিষয় হলে ইসলামী সমাজ সংগঠনই উভয় মতের মধ্য থেকে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করে নেবে অথবা চাইলে উভয়মতই গ্রহণ করে নেবে—এটা তাদের নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয় ধরনের মতপার্থক্য করা হবে দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে। অথবা যে বিষয়টিকে আগ্রাহ ও তাঁর রসূল দীনের মৌলিক বিষয় বলে গণ্য করেননি এমন কোন বিষয়ে কোন আলেম, সুফী, মুফতী, নীতি শাস্ত্রবিদ বা নেতা নিজে একটি মত অবলম্বন করবেন এবং অথবা টেনে হেঁচড়ে তাকে দীনের মৌলিক বিষয়ে পরিণত করে দেবেন, তারপর তার অবলহিত মতের বিরোধী মত পোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দীন ও মিলাত বহির্ভূত গণ্য করবেন। এই সংগে নিজের একটি সমর্থক দল বানিয়ে এই মর্মে প্রচারণা চালাতে থাকবেন যে, আসল উম্মাতে মুসলিমা তো এই একটি দলই মাত্র, বাদবাকি সবাই হবে জাহানামের ভাগীদার। উচ্চকাষ্টে তারা বলে যেতে থাকবে : মুসলিম হও যদি এই দলে এসে যাও, অন্যথায় তুমি মুসলিমই নও।

কুরআনের আলোচনায় এই দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবলির বিরোধিতা করা হচ্ছে। আর প্রথম ধরনের মতবিরোধের কতিপয় ঘটনা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের সামনেই উপস্থাপিত হয়েছিল। তিনি এটিকে

কেবল বৈধই বলেননি বরং এর প্রশংসাও করেছেন। কারণ এ মতবিরোধ প্রমাণ করছিল যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে চিন্তা-ভাবনা করার, অনুসন্ধান-গবেষণা চালাবার এবং সঠিকভাবে বৃদ্ধি প্রয়োগ করার যোগ্যতা সম্পর্ক লোকের অস্তিত্ব রয়েছে। সমাজের বৃদ্ধিমান ও মেধা সম্পর্ক লোকেরা নিজেদের দীন ও তার বিধানের ব্যাপারে আগ্রহী। তাদের বৃদ্ধিবৃত্তি দীনের বাইরে নয়, তাঁর চৌহদ্দির মধ্যেই জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজতে তৎপর। ইসলামী সমাজ সামগ্রিকভাবে মূলনীতিতে ঐক্যবন্ধ থেকে নিজের ঐক্য অট্ট রেখে এবং নিজের জ্ঞানবান ও চিত্তশীল লোকদেরকে সঠিক সীমারেখার মধ্যে অনুসন্ধান চালাবার ও ইজতিহাদ করার স্বাধীনতা দান করে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ খোলা রাখার স্বর্গোজ্জ্বল ঐতিহ্যের পতাকাবাহী।

هذا ما عندى ، والعلم عند الله ، عليه توكلت واليه انيب

আমি যা সত্য মনে করলাম তা এখানে প্রকাশ করলাম। আর আসল সত্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে। আমার সমস্ত নির্ভরতা একমাত্র তাঁরই ওপর এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।।



কুরআন অধ্যয়নকালে একজন পাঠকের মনে যতো রকমের প্রশ্নের উদয় হয় তাঁর সবগুলোর জবাব দেয়ার জন্য আমি এ ভূমিকা ফাঁদিনি। কারণ এ প্রশ্নগুলোর মধ্যে এমন বহু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো কোন না কোন আয়াত বা সূরা পাঠকালে মনে জাগে। সেগুলোর জবাব তাফহীমুল কুরআনের সহিত অংশে যথাস্থানেই দেয়া হয়েছে। কাজেই এ ধরনের প্রশ্নগুলো বাদ দিয়ে আমি এখানে কেবলমাত্র এমন সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি সামগ্রিকভাবে যা সমগ্র কুরআনের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, শুধুমাত্র এই ভূমিকাটিকু পড়েই একে অসম্পূর্ণ হবার ধারণা নিয়ে বসে থাকবেন না। বরং সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করুন। তারপর দেখুন আপনার মনে এমন কোন প্রশ্ন রয়েছে কি—না যার জবাব পাওয়া যায়নি অথবা জবাব যথেষ্ট বলে আপনার মনে হয়নি। এ ধরনের কোন প্রশ্ন থাকলে গ্রন্থকারকে জানাবার জন্য অনুরোধ জানান্তি।\*

\* গ্রন্থকার অবশি ১৯৭৯ সালে ইত্তেকাল করেছেন। কাজেই তৌর কাছে প্রশ্ন করার আর কোন সুযোগই নেই। তবে আমার মনে হয় এ গ্রন্থ পাঠ করার পর পাঠকদের যদি কোথাও কোন অভ্যন্তর থেকে যায়, তাহলে গ্রন্থকারের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে খুঁজলে তাঁর জবাব পাওয়া যাবে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের জন্য গ্রন্থকার যে সাহিত্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর উৎস এই কুরআন এবং তাফহীমুল কুরআন। জীবনের সূচনা লক্ষ থেকে নিয়ে যেদিন থেকে তিনি কলম হাতে নিয়েছেন যুক্তাব পূর্ব মূর্ত্ত পর্যন্ত তিনি এই কুরআনী দাওয়াতের সম্প্রসারণের কাজেই করে গেছেন। কাজেই এ খেত্রে তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডার তৌর মূর্ত্তমান প্রতিনিধি।—অনুবাদক

# আল ফাতিহা

## ১

### নামকরণ

এ সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর এই নামকরণ করা হয়েছে। যার সাহায্যে কোন বিষয়, গ্রহ বা জিনিসের উদ্বোধন করা হয় তাকে ‘ফাতিহা’ বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এ শব্দটি ভূমিকা এবং বক্তব্য শুরু করার অর্থ প্রকাশ করে।

### নাযিল ইওয়ার সময়-কাল

এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। বরং হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটিই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাংশ সূরা। এর আগে মাত্র বিছিন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। সেগুলো—সূরা ‘আলাক’, সূরা ‘মুয়্যায়মিল’ ও সূরা ‘মুদ্দাস্মিল’ ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

### বিষয়বস্তু

আসলে এ সূরাটি হচ্ছে একটি দোয়া। যে কোন ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে আল্লাহ প্রথমে তাকে এ দোয়াটি পিছিয়ে দেন। গ্রন্থের শুরুতে এর স্থান দেয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, যদি যথার্থেই এ গ্রন্থ থেকে তুমি লাভবান হতে চাও, তাহলে নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করো।

মানুষের মনে যে বক্সুটির আকার্থা ও চাহিদা থাকে স্বতাবত মানুষ স্টেটই চায় এবং সে জন্য দোয়া করে। আবার এমন অবস্থায় সে এই দোয়া করে যখন অনুভব করে যে, যে সত্তার কাছে সে দোয়া করছে তার আকার্থিত বক্সুটি তারই কাছে আছে। কাজেই কুরআনের শুরুতে এই দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান লাভের জন্য এ গ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মানসিকতা নিয়ে এর পাতা ওলটাও এবং নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন জানের একমাত্র উৎস—একথা জেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই পথনির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন ও সূরা ফাতিহার মধ্যকার আসল সম্পর্ক কোন বই ও তার ভূমিকার সম্পর্কের পর্যায়ভূক্ত নয়। বরং এ সম্পর্কটি দোয়া ও দেয়ার জবাবের পর্যায়ভূক্ত। সূরা ফাতিহা বাস্তার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বাস্তা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখো। জবাবে ধার্মান প্রভু এই বলে সময় কুরআন তার সামনে রেখে দেন—এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আবেগ কাছে আবেদন জানিয়েছ।

আয়াত ৭

সূরা আল ফাতিহা-মক্কী

রুক্ম ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
পরম করমাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۖ مَلِكِ  
يَوْمِ الدِّينِ ۖ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ ۖ

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য<sup>২</sup> যিনি নিখিল বিশ্ব-জাহানের রব,<sup>৩</sup> পরম দয়ালু  
ও করমাময়,<sup>৪</sup> প্রতিদান দিবসের মালিক।<sup>৫</sup>

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করিব<sup>৬</sup> এবং একমাত্র তোমারই কাছে  
সাহায্য চাই।<sup>৭</sup>

১. ইসলাম মানুষকে একটি বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেকটি  
কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রীতি।  
সচেতনতা ও আত্মরিকতার সাথে এ রীতির অনুসারী হলে অনিবায়ভাবে তিনটি সুফল  
লাভ করা যাবে। এক : মানুষ অনেক থারাপ কাজ করা থেকে বিকৃতি পাবে। কারণ  
আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অভ্যাস তাকে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে একথা চিন্তা  
করতে বাধ্য করবে যে, যথার্থেই এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোন ন্যায়সংগত  
অধিকার তার আছে কি না? দ্বই : বৈধ সঠিক ও সৎকাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর  
নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে ঘোড় নেবে। সে  
সবসময় সবচেয়ে নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে। তিনি : এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে  
বড় সুফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর  
সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে। তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে। শয়তানের  
বিপর্যয় ও ধৰ্মস্কারিতা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখা হবে। বাস্তু যখন আল্লাহর দিকে  
ফেরে তখন আল্লাহও বাস্তুর দিকে ফেরেন, এটাই আল্লাহর রীতি।

২. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলেছি, সূরা ফাতিহা আসলে একটি দোয়া। তবে যে সন্তান  
কাছে আমরা প্রার্থনা করতে চাচ্ছি তাঁর প্রশংসা বাণী দিয়ে দোয়া শুরু করা হচ্ছে। এভাবে  
যেন দোয়া চাওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দোয়া চাইতে হলে তত্ত্ব ও শালীন  
পদ্ধতিতে দোয়া চাইতে হবে। কারো সামনে গিয়ে মুখ খুলেই প্রথমে নিজের প্রয়োজনটা  
পেশ করে দেয়া কোন সৌজন্য ও ত্বর্যতার পরিচায়ক নয়। যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে  
প্রথমে তার গুণাবলী বর্ণনা করা এবং তার দান, অনুগ্রহ ও মর্যাদার শীর্কৃতি দেয়াই  
তদ্বতার রীতি।

আমরা দু'টি কারণে কারো প্রশংসা করে থাকি। প্রথমত তিনি প্রকৃতিগতভাবে কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট্য আমাদের ওপর কি প্রভাব ফেলে সেটা বড় কথা নয়। দ্বিতীয়ত তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং আমরা তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতির আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়েই তাঁর গুণবলী বর্ণনা করি। মহান আল্লাহর প্রশংসা এই উভয় কারণে ও উভয় দিক দিয়েই করতে হয়। আমরা হামেসা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হব, এটি তাঁর অপরিসীম মর্যাদা ও আমাদের প্রতি তাঁর অশেষ অনুগ্রহের দাবী।

আর প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং সঠিকভাবে বলা যায়, “প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই” জন্য। একথাটি বলে একটি বিরাট সত্যের ওপর থেকে আবরণ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এটি এমন একটি সত্য যার প্রথম আঘাতেই ‘সৃষ্টি পূজা’র মূলে কৃঠারাঘাত হয়। দুনিয়ায় যেখানে যে বস্তুর মধ্যে যে আকৃতিতেই কোন সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিনাইতে আছে আল্লাহর সন্তাই মূলত তাঁর উৎস। কোন মানুষ, ফেরেশতা, দেবতা, গ্রহ-নক্ষত্র তথা কোন সৃষ্টির নিজের কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং এসবই আল্লাহ প্রদত্ত। কাজেই যদি কেউ এ অধিকার দাবী করেন যে, আমরা তাঁর প্রশংসা কীর্তন করব, তাঁকে পূজা করব, তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করব ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং তাঁর খেদমতগ্রাস ও সেবক হব, তাহলে তিনি হবেন সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠা এ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানব-সন্তা নয়।

৩. ‘রব’ শব্দটিকে আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এক, মানিক ও প্রভু। দুই, অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী। তিনি, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা পরিচালক ও সংগঠক।

৪. মানুষের দৃষ্টিতে কোন জিনিস খুব বেশী বলে প্রতীয়মান হলে সেজন্য সে এমন শব্দ ব্যবহার করে যার মাধ্যমে আধিক্যের প্রকাশ ঘটে। আর একটি আধিক্যবোধক শব্দ বলার পর যখন সে অনুভব করে যে ঐ শব্দটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির আধিক্যের প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তখন সে সেই একই অর্থে আর একটি শব্দ ব্যবহার করে। এভাবে শব্দটির অন্তরনিহিত গুণের আধিক্য প্রকাশের ব্যাপারে যে কমতি রয়েছে বলে সে মনে করছে তা পূরণ করে। আল্লাহর প্রশংসায় ‘রহমান’ শব্দের পরে আবার ‘রহীম’ বলার মধ্যেও এই একই নিগৃহ তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আরবী ভাষায় ‘রহমান’ একটি বিপুল আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানী এত বেশী ও ব্যাপক এবং এত সীমাসংখ্যাহীন যে, তা বয়ান করার জন্য সবচেয়ে বেশী ও বড় আধিক্যবোধক শব্দ ব্যবহার করার পরও মন ভরে না। তাই তাঁর আধিক্য প্রকাশের হক আদায় করার জন্য আবার ‘রহীম’ শব্দটিও বলা হয়েছে। এর দ্বান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে, যেমন আমরা কোন ব্যক্তিকে দানশীলতার গুণ বর্ণনা করার জন্য ‘দাতা’ বলার পরও যখন অত্যন্ত অনুভব করি তখন এর সাথে ‘দানবীর’ শব্দটিও লাগিয়ে দেই। রঙের প্রশংসায় ‘সাদা’ শব্দটি বলার পর আবার ‘দুধের মতো সাদা’ বলে থাকি।

৫. অর্থাৎ যেদিন মানবজাতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বংশধরদেরকে একত্র করে তাদের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের হিসেব নেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর পূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে। তিনি সেই দিনের একচ্ছত্র অধিপতি, আল্লাহর প্রশংসায় রহমান ও রহীম শব্দ

إِهْرَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ  
عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَفْوُبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও,<sup>৮</sup> তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ,<sup>৯</sup> যাদের ওপর গবেষণা করে এবং যারা পথচক্ষ হয়নি।<sup>১০</sup>

ব্যবহার করার পর তিনি প্রতিদিন দিবসের মালিক একথা বলায় এখান থেকে এ অর্থও প্রকাশিত হয় যে, তিনি নিছক দয়ালু ও করুণাময় নন বরং এই সৎগে তিনি ন্যায় বিচারকও। আবার তিনি এমন ন্যায় বিচারক যিনি হবেন শেষ বিচার ও রায় শুনানীর দিনে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক সেদিন তিনি শাস্তি প্রদান করলে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। এবং পূরুষার দিলেও কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাজেই তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন ও আমাদের প্রতি করুণা করেন এ জন্য যে আমরা তাঁকে ভালোবাসি শুধু এতটুকুই নয় বরং তিনি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেন এ জন্য আমরা তাঁকে ডয়ও করি এবং এই অনুভূতিও রাখি যে, আমাদের পরিণামের ভালো মন্দ পুরোপুরি তাঁরই হাতে ন্যস্ত।

৬. ইবাদাত শব্দটিও আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (১) পূজা ও উপাসনা করা, (২) আনুগত্য ও হৃকুম মেনে চলা এবং (৩) বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার পূজা-উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার বন্দেগী ও দাসত্বও করি। আর আমরা তোমার সাথে এ সম্পর্কগুলো রাখি কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং এ সম্পর্কগুলো আমরা একমাত্র তোমারই সাথে রাখি। এই তিনটি অর্থের মধ্যে কোন একটি অর্থেও অন্য কেউ আমাদের মাঝে নয়।

৭. অর্থাৎ তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল ইবাদাতের নয় বরং আমাদের সাহায্য প্রার্থনার সম্পর্কও একমাত্র তোমারই সাথে রয়েছে। আমরা জানি তুমি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের রব। সহস্র শক্তি তোমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তুমি একই যাবতীয় নিয়ামিত ও অনুগ্রহের অধিকারী। তাই আমাদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা একমাত্র তোমারই দুয়ারে ধর্ণা দেই। তোমারই সামনে নিজেদের সুপর্দ করে দেই এবং তোমারই সাহায্যের ওপর নির্ভর করি। এ জন্য আমাদের এই আবেদন নিয়ে আমরা তোমার দুয়ারে হাজির হয়েছি।

৮. অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে, চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি-ব্যবস্থা আমাদের শেখাও, যা হবে একেবারেই নিভূল, যেখানে ভুল দেখা, ভুল কাজ করা ও অশুভ পরিণামের আশংকা নেই, যে পথে চলে আমরা যথার্থ সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। কুরআন অধ্যয়নের প্রাকালে বান্দা তার প্রভু, মালিক, আল্লাহর কাছে এই আবেদনটি পেশ করে। বান্দা আর্জি পেশ করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও। কল্পিত দর্শনের গোলকধীধার মধ্য থেকে যথার্থ সত্যকে

উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর। বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা-দর্শনের মধ্য থেকে যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা-দর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপিত কর। জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও।

৯. মহান আল্লাহর কাছ থেকে আমরা যে সোজা পথটির জ্ঞান লাভ করতে চাছি এটা হচ্ছে তার পরিচয়। অর্থাৎ এমন পথ যার ওপর সবসময় তোমার প্রিয়জনেরা চলেছেন। সেই নির্ভুল রাজপথটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি ও যে দলটিই তার ওপর চলেছে সে তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং তোমার দানে তার জীবনপ্রাত্ পরিপূর্ণ হয়েছে।

১০. অর্থাৎ 'অনুগ্রহ' লাভকারী হিসেবে আমরা এমন সব লোককে চিহ্নিত করিনি যারা আপাতদৃষ্টিতে সাময়িকভাবে তোমার পাখির অনুগ্রহ লাভ করে থাকে ঠিকই কিন্তু আসলে তারা হয় তোমার গবেষণা ও শাস্তির অধিকারী এবং এভাবে তারা নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথ হারিয়ে ফেলে। এ নেতৃবাচক ব্যাখ্যায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'অনুগ্রহ' বলতে আমরা যথার্থ ও স্থায়ী অনুগ্রহ বুবাছি, যা আসলে সঠিক পথে চলা ও আল্লাহর সঙ্গে লাভের ফলে অর্জিত হয়। এমন কোন সাময়িক ও লোক দেখানো অনুগ্রহ নয়, যা ইতিপূর্বে ফেরাউন, নমরাদ ও কারুনরা লাভ করেছিল এবং আজো আমাদের চোখের সামনে বড় বড় যালেম, দুর্ভিকারী ও পথবর্তীরা যেগুলো লাভ করে চলেছে।

# আল বাকারাহ

২

## নামকরণ

বাকারাহ মানে গাতী। এ সূরার এক জায়গায় গাতীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে। কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরায় এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাদের জন্য কোন পরিপূর্ণ ও সার্বিক অর্থবোধক শিরোনাম উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। শব্দ সভারের দিক দিয়ে আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও ঘূর্ণত এটি তো মানুষেরই ভাষা আর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো খুব বেশী সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসর সম্পর। সেখানে এই ধরনের ব্যাপক বিষয়বস্তুর জন্য পরিপূর্ণ অর্থব্যাঙ্গক শিরোনাম তৈরি করার মতো শব্দ বা বাক্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন। এই সূরার নামকরণ আল বাকারাহ করার অর্থ এ নয় যে, এখানে গাতী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বরং এর অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে গাতীর কথা বলা হয়েছে।

## নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বেশীর তাগ মদীনায় হিজরাতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে প্রথমোক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সুন নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত যে আয়তগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যে আয়তগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরাতের আগে মকায় নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

## নাযিলের উপলক্ষ্মি

এ সূরাটি বুঝতে হলে প্রথমে এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

(১) হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবল মকায়। এ সময় পর্যন্ত সঙ্গীত করা হচ্ছিল কেবলমাত্র আরবের মুশারিকদেরকে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। এখন হিজরাতের পরে ইহদিরা সামনে এসে গেল। তাদের জনবসতিগুলো ছিল মদীনার সাথে একেবারে লাগানো। তারা তাওহীদ, রিসালাত,

অহী, আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের ওপর যে শরিয়াতী বিধান নাযিল হয়েছিল তারও স্বীকৃতি দিত। নীতিগতভাবে তারাও সেই দীন ইসলামের অনুসারী ছিল যার শিক্ষা হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে চলছিলেন। কিন্তু বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে তারা আসল দীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।<sup>১</sup> তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামী বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাওরাতে এর কোন ভিত্তি ছিল না। তাদের কর্মজীবনে এমন অসংখ্য রীতি-পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছিল যথার্থ দীনের সাথে যেগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাওরাতের মূল বিষয়বস্তুর সাথেও এগুলোর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। আল্লাহর কালাম তাওরাতের মধ্যে তারা মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। শাদিক বা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম যতটুকু পরিমণ সংরক্ষিত ছিল তাকেও তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্বেষণের মাধ্যমে বিকৃত করে দিয়েছিল। দীনের যথার্থ প্রাণবস্তু তাদের মধ্য থেকে অস্তরহিত হয়ে গিয়েছিল। লোক দেখানো ধার্মিকতার নিছক একটা নিষ্পাণ খোলসকে তারা বুকের সাথে আকড়ে ধরে রেখেছিল। তাদের উলামা, মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ—সবার আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও বাস্তব কর্ম জীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের এই বিকৃতির প্রতি তাদের আসঙ্গি এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যার ফলে কোন প্রকার সংক্ষার সংশোধন গ্রহণের তারা বিরোধী হয়ে উঠেছিল। যখনই কোন আল্লাহর বাস্তা তাদেরকে আল্লাহর দীনের সরল-সোজা পথের সন্ধান দিতে আসতেন তখনই তারা তাঁকে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশ্মন মনে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত শত বছর ধরে ক্রমাগতভাবে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছিল। এরা ছিল আসলে বিকৃত মুসলিম। দীনের মধ্যে বিকৃতি, দীন বহির্ভূত বিষয়গুলোর দীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, দলাদলি, বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতমাতি, আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোড-লালসায় আকর্ষ নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা পতনের শেষ প্রাপ্তে পৌছে গিয়েছিল। এমন কি তারা নিজেদের আসল ‘মুসলিম’ নামও ভুলে গিয়েছিল। নিছক ‘ইহুদি’ নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আল্লাহর দীনকে তারা কেবল ইসরাইল বংশজাতদের পিতৃস্মত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে পরিণত করেছিল। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌছার পর ইহুদিদেরকে আসল দীনের দিকে আহবান করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরা বাকারার ১৫ ও ১৬ রূক্কু’ এ দাওয়াত সম্বলিত। এ দু’রূক্কু’তে যেভাবে ইহুদিদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মোকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মোকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতা কাকে বলে, সত্য ধর্মের মূলনীতিগুলো কি এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ জিনিস যথার্থ গুরুত্বের অধিকারী তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. এ সময়ের প্রায় ১৯শ' বছর আগে হ্যরত মূসার (আ) যুগ অঙ্গীত হয়েছিল। ইসরাইলী ইতিহাসের হিসেব মতে হ্যরত মূসা (আ) খৃ. পৃ. ১২৭২ অন্দে ইতিকাল করেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াত লাভ করেন।

(২) মদীনায় পৌছার পর ইসলামী দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মকায় তো কেবল দীনের মূলনীতিগুলোর প্রচার এবং দীনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরাতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে চতুর্দিক থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে থাকলো এবং আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে উঠলো তখন মহান আল্লাহ সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কিত মৌলিক বিধান দিতে থাকলেন এবং ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এ নতুন জীবন ব্যবস্থাটি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তারও নির্দেশ দিতে থাকলেন। এ সুরার শেষ ২৩টি রূক্তিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ও বিধানগুলো বয়ান করা হয়েছে। এর অধিকাংশ শুরুতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কিছু পাঠানো হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিস্তৃতভাবে।

(৩) হিজরাতের পর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতও একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াত কুফরের ঘরের মধ্যেই দেয়া হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গোত্রের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতো তারা নিজেদের জায়গায় দীনের প্রচার করতো। এর জবাবে তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হতো। কিন্তু হিজরাতের পরে এ বিক্ষিণু মুসলমানরা মদীনায় একত্র হয়ে একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন একদিকে ছিল একটি ছোট জনপদ এবং অন্যদিকে সমগ্র আরব ভূখণ্ড তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন এ ছোট জামায়াতটির কেবল সাফল্যই নয় বরং তার অস্তিত্ব ও জীবনই নির্ভর করছিল পাঁচটি জিনিসের ওপর। এক, পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে নিজের মতবাদের প্রচার করে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে নিজের চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী করার চেষ্টা করা। দুই, বিরোধীদের বাতিল ও ভাস্ত পথের অনুসারী বিষয়টি তাকে এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোন বৃক্ষ-বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সংশয় না থাকে। তিনি, গৃহহারা ও সারা দেশের মানুষের শক্তি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হবার কারণে অভাব-অন্টন, অনাহার-অর্ধাহার এবং সার্বক্ষণিক অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় সে ভূগ়ছিল। চতুর্দিক থেকে বিপদ তাকে ধিরে নিয়েছিল এ অবস্থায় যেন সে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে। পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে যেন অবস্থার মোকাবিলা করে এবং নিজের সংকল্পের মধ্যে সামান্যতম দিখা সৃষ্টির সুযোগ না দেয়। চার, তার দাওয়াতকে ব্যর্থকাম করার জন্য যে কোন দিক থেকে যে কোন সশস্ত্র আক্রমণ আসবে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে। বিরোধী পক্ষের সংখ্যা ও তাদের শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। পাঁচ, তার মধ্যে এমন সুদৃঢ় হিমত সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে আরবের লোকেরা ইসলাম যে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে আপনে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলিয়াতের বাতিল ব্যবস্থাকে ঘিটিয়ে দিতে সে একটুও ইতস্তত করবে না। এ সুরায় আল্লাহ এ পাঁচটি বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

(৪). ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে একটি নতুন গোষ্ঠীও আত্মপ্রকাশ শুরু করেছিল। এটি ছিল মুনাফিক গোষ্ঠী। নবী কর্মের (সা) মকায় অবস্থান কালের শেষের দিকেই

মুনাফিকীর প্রাথমিক আলামতগুলো সুস্পষ্ট হতে শুরু হয়েছিল। তবুও সেখানে কেবল এমন ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতো যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং নিজেদের ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু এ সত্যের খতিরে নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে নিজেদের পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ করতো এবং এ সত্য মতবাদটি গ্রহণ করার সাথে সাথেই যে সমস্ত বিপদ-আপদ, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে আসতে থাকতো তা মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর এ ধরনের মুনাফিকদের ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী ছিল ইসলামকে চূড়ান্তভাবে অধীকারকারী। তারা নিষ্কর্ষ ফিত্না সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদের দলে প্রবেশ করতো। মুনাফিকদের দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির অবস্থা ছিল এই যে, চতুর্দিক থেকে মুসলিম কর্তৃত ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তরভুক্ত করতো এবং অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের হিস্সা ঝুলিতে রাখতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপ্টা থেকেও সংরক্ষিত থাকতো। তৃতীয় গোষ্ঠীতে এমন ধরনের মুনাফিকদের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-হন্দু দোদুল্যমান। ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিচিত্ত ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাদের গোত্রের বা বংশের বেশির ভাগ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিকদের চতুর্থ গোষ্ঠীটিতে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ, কুসংস্কার ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খল গলায় পরে নিতে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে তাদের মন চাইতো না।

সূরা বাকারাহ নামিলের সময় সবেমাত্র এসব বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ এখানে তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছেন মাত্র। পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি যতই সুস্পষ্ট হতে থাকলো ততই বিজ্ঞারিতভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মুনাফিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুযায়ী পরবর্তী সূরাগুলোয় তাদের সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

আয়াত ২৮৬

সূরা আল বাকারাহ-মাদানী

রুক্ত' ৪০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মগাময় যেহেরবান আল্লাহর নামে

الْمَرْدِلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ هُوَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَقِينَ  
 الَّذِينَ يَؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا  
 دَرَزْنَهُمْ يَنفِقُونَ ③

আলিফ লাম শীম।<sup>১</sup> এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।<sup>২</sup> এটি হিদায়াত সেই 'মৃত্তাকী'দের<sup>৩</sup> জন্য যারা অদৃশ্যে বিশাস করে,<sup>৪</sup> নামায কায়েম করে<sup>৫</sup> এবং যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।<sup>৬</sup>

১. এগুলো বিচ্ছিন্ন হরফ। কুরআন মজীদের কোন কোন সূরার শুরুতে এগুলো দেখা যায়। কুরআন মজীদ নায়িলের যুগে সমকালীন আরবী সাহিত্যে এর ব্যবহার ছিল। বক্তার বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণত এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বক্তা ও কবি উভয় গোষ্ঠীই এ পদ্ধতির অশ্রয় নিতেন। বর্তমানে জাহেলী যুগের কবিতার যেসব নমুনা সংরক্ষিত আছে তার মধ্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে ব্যবহারের কারণে এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলো কোন ধীধা হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। এগুলো এমন ছিল না যে, কেবল বক্তাই এগুলোর অর্থ বুঝতো বরং শ্রোতুরাও এর অর্থ বুঝতে পারতো। এ কারণে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন বিরোধীদের একজনও এর বিবরণে আপত্তি জানায়নি। তাদের একজনও একধা বলেনি যে, বিভিন্ন সূরার শুরুতে আপনি যে কাটা কাটা হরফগুলো বলে যাচ্ছেন এগুলো কি? এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছেন এ মর্মে কোন হাদীসও উদ্ভৃত হতে দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় এ বর্ণনা পদ্ধতি পরিভ্রান্ত হতে চলেছে। ফলে কুরআন ব্যাখ্যাকারীদের জন্য এগুলোর অর্থ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে একথা সুশ্পষ্ট যে, কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করা এ শব্দগুলোর অর্থ বুঝার ওপর নির্ভরশীল নয়। অথবা এ হরফগুলোর মানে না বুঝলে কোন ব্যক্তির সরল সোজা পথ লাভের মধ্যে গুলদ থেকে যাবে, এমন কোন কথাও নেই। কাজেই একজন সাধারণ পাঠকের জন্য এর অর্থ অনুসন্ধানে ব্যাকুল হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

২. এর একটা সরল অর্থ এভাবে করা যায় “নিসদ্দেহে এটা আল্লাহর কিতাব।” কিন্তু এর একটা অর্থ এও হতে পারে যে, এটা এমন একটা কিতাব যাতে সদেহের কোন শেষ নেই। দুনিয়ায় যতগুলো গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত এবং মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান বহির্ভূত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সবই কঢ়না, ধারণা ও আন্দজ-অনুমানের ভিত্তিতে লিখিত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থগুলোর লেখকরাও নিজেদের রচনাবলীর নির্ভুলতা সম্পর্কে যতই প্রত্যয় প্রকাশ করুক না কেন তাদের নির্ভুলতা সদেহ-মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু এ কুরআন মজীদ এমন একটি গ্রন্থ যা আগাগোড়া নির্ভুল সত্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ। এর রচয়িতা হচ্ছেন এমন এক মহান সন্তা যিনি সমস্ত তত্ত্ব ও সত্যের জ্ঞান রাখেন। কাজেই এর মধ্যে সদেহের কোন অবকাশই নেই। মানুষ নিজের অজ্ঞতার কারণে এর মধ্যে সদেহ পোষণ করলে সেটা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা এবং সে জন্য এ কিতাব দায়ী নয়।

৩. অর্থাৎ এটি একেবারে একটি হিদায়াত ও পথনির্দেশনার গ্রন্থ। কিন্তু এর থেকে লাভবান হতে চাইলে মানুষের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক গুণ থাকতে হবে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটির প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, তাকে “মৃত্যুক্তি” হতে হবে। ভালো ও মনের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকতে হবে। তার মধ্যে মন থেকে নিন্দিতি পাওয়ার ও ভালোকে গ্রহণ করার আকাঙ্খা এবং এ আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তবে যারা দুনিয়ায় পশুর মতো জীবন যাপন করে, নিজেদের কৃতকর্ম সঠিক কি না সে ব্যাপারে কখনো চিন্তা করে না, যেদিকে সবাই চলছে বা যেদিকে প্রবৃত্তি তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অথবা যেদিকে মন চায় সেদিকে চলতে যাবা অভ্যন্ত, তাদের জন্য কুরআন মজীদে কোন পথনির্দেশনা নেই।

৪. কুরআন থেকে লাভবান হবার জন্য এটি হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত। ‘গায়েব’ বা অদৃশ্য বলতে এমন গভীর সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা মানুষের ইন্দ্রিয়াজীব এবং কখনো সরাসরি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। যেমন আল্লাহর সন্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা, অহী, জারাত, জাহানাম ইত্যাদি। এ গভীর সত্যগুলোকে না দেখে মেনে নেয়া এবং নবী এগুলোর খবর দিয়েছেন বলে তাঁর খবরের সত্যতার প্রতি আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে ‘ইমান বিল গায়েব’ বা অদৃশ্যে বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি অনুভব করা যায় না এমন সত্যগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত হবে একমাত্র সে-ই কুরআনের হিদায়াত ও পথনির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি মেনে নেয়ার জন্য দেখার, ধ্যান নেয়ার ও আস্থাদান করার শর্ত আরোপ করে এবং যে ব্যক্তি বলে, আমি এমন কোন জিনিস মেনে নিতে পারি না যা পরিমাণ করা ও উজ্জ্বল করা যায় না— সে এ কিতাব থেকে হিদায়াত ও পথনির্দেশনা লাভ করতে পারবে না।

৫. এটি হচ্ছে তৃতীয় শর্ত। এর অর্থ হচ্ছে, যারা কেবল মেনে নিয়ে নীরবে বসে থাকবে তারা কুরআন থেকে উপকৃত হতে পারবে না। বরং মেনে নেয়ার পর সংগে সংগেই তাঁর আনুগত্য করা ও তাকে কার্যকর করাই হচ্ছে এ থেকে উপকৃত হবার জন্য একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন। আর বাস্তব আনুগত্যের প্রধান ও স্থায়ী আলাভ হচ্ছে নামাফ। ইমান আনার পর কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হতে না হতেই মুয়ায়ফিন নামায়ের জন্য আহবান জানায় আর ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি বাস্তবে আনুগত্য করতে প্রস্তুত কি না তাঁর ফায়সালা

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ⑥ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑦

আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাখিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার আগে যেসব কিতাব নাখিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনে<sup>১</sup> আর আধেরাতের ওপর একীন রাখে।<sup>৮</sup> এ ধরনের লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে সরল সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কল্যাণ লাভের অধিকারী।

তখনই হয়ে যায়। এ ঘৃণ্যায়িন আবার প্রতিদিন পাঁচবার আহবান জানাতে থাকে। যখনই এ ব্যক্তি তার আহবানে সাড়া না দেয় তখনই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি এবার আনুগত্য থেকে বের হয়ে এসেছে। কাজেই নামায ত্যাগ করা আসলে আনুগত্য ত্যাগ করারই নামাস্তর। বলা বাহ্যিক কোন ব্যক্তি যখন কারোর নির্দেশ মেনে চলতে প্রস্তুত থাকে না তখন তাকে নির্দেশ দেয়া আর না দেয়া সমান।

ইকামাতে সালাত বা নামায কায়েম করা একটি ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থবোধক পরিভাষা একথাটি অবশ্যি জেনে রাখা প্রয়োজন। এর অর্থ কেবল নিয়মিত নামায পড়া নয় বরং সামষ্টিকভাবে নামাযের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাও এর অর্থের অন্তরভুক্ত। যদি কোন লোকালয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়মিতভাবে নামায পড়ে থাকে কিন্তু জামায়াতের সাথে এ ফরয়টি আদায় করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেখানে নামায কায়েম আছে, একথা বলা যাবে না।

৬. কুরআনের হিদায়াত লাভ করার জন্য এটি হচ্ছে চতুর্থ শর্ত। সংকীর্ণমনা ও অর্থলোকুপ না হয়ে মানুষকে হতে হবে আল্লাহ ও বাদার অধিকার আদায়কারী। তার সম্পদে আল্লাহ ও বাদার যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তাকে তা আদায় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যে বিষয়ের ওপর সে ঈমান এনেছে তার জন্য অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করার ব্যাপারে সে কোন রকম ইতস্তত করতে পারবে না।

৭. এটি হচ্ছে পঞ্চম শর্ত। অর্থাৎ আল্লাহ অহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর বিভিন্ন ধূগে ও বিভিন্ন দেশে যেসব কিতাব নাখিল করেছিলেন সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এ শর্তটির কারণে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিধান অবতরণের প্রয়োজনীয়তাকে আদতে স্বীকারই করে না অথবা প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও এ জন্য অহী ও নবুওয়াতের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না এবং এর পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া মতবাদকে আল্লাহর বিধান বলে ঘোষণা করে অথবা আল্লাহর কিতাবের স্বীকৃতি দিলেও কেবলমাত্র সেই কিতাবটি

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوْءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ رَبَّهُمْ أَكْبَرٌ لَمْ تُنَزِّلْ رِهْمٌ  
لَا يُؤْمِنُونَ ⑤ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ  
غِشاوةٌ وَلَمْرَعَنَابٌ عَظِيمٌ

যেসব লোক (একথাণ্ডো মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে,<sup>৯</sup> তাদের জন্য সমান—তোমরা তাদের সতর্ক করো বা না করো, তারা মেনে নেবে না। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে যোহর মেরে দিয়েছেন।<sup>10</sup> এবং তাদের চোখের ওপর আবরণ পড়ে গেছে। তারা কঠিন শাস্তি পওয়ার যোগ্য।

বা কিতাবগুলোর ওপর ইমান আনে যেগুলোকে তাদের বাপ-দাদারা মেনে আসছে আর এ উৎস থেকে উৎসারিত অন্যান্য বিধানগুলোকে অস্বীকার করে—তাদের সবার জন্য কুরআনের হিদায়াতের দৃঢ়ার রূপ। এ ধরনের সমস্ত লোককে আলাদা করে দিয়ে কুরআন তার অনুগ্রহ একমাত্র তাদের ওপর বর্ষণ করে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে এবং আল্লাহর এ বিধান আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে না এসে বরং নবীদের ও আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমেই মানুষের কাছে আসে বলে স্বীকার করে আর এই সংগে বৎশ, গোত্র বা জাতি প্রতিতে লিঙ্গ হয় না বরং নির্ভেজাল সত্ত্বের পূজারী হয়, সত্য যেখানে যে আকৃতিতে আবির্ভূত হোক না কেন তারা তার সামনে মন্তক অবনত করে দেয়।

৮. এটি ষষ্ঠি ও সর্বশেষ শর্ত। আখেরাত একটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টির ভিত্তিতে এ আখেরাতের ভাবধারা গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসের নিম্নোক্ত উপাদানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

এক : এ দুনিয়ায় মানুষ কোন দায়িত্বাদীন জীব নয়। বরং নিজের সমস্ত কাজের জন্য তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

দুই : দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা চিরস্তন নয়। এক সময় এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং সে সময়টা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

তিনি : এ দুনিয়া শেষ হবার পর আল্লাহ আর একটি দুনিয়া সৃষ্টি করবেন। সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মনুষের জন্ম হয়েছে সবাইকে সেখানে একই সংগে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। সবাইকে একত্র করে তাদের কর্মকাণ্ডের হিসেব নেবেন। সবাইকে তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।

চারি : আল্লাহর এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংগৃহীকৰণ জানাতে স্থান পাবে এবং অসংগৃহীকৰণকে নিষ্কেপ করা হবে জাহারামে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ  
بِمُؤْمِنِينَ ۖ ۗ يَخْلِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَمَا يَخْلِعُونَ إِلَّا  
أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ ۗ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ «فَرَأَدَهُمْ اللَّهُ  
مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ ۚ بِمَا كَانُوا يَكْنِي بُونَ ۖ ۗ وَإِذَا قِيلَ  
لَهُمْ لَا تَفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ « قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۖ ۗ

## ২ রক্ত

কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর ও আখেরাতের দিনের ওপর ঈমান এনেছি, অথচ আসলে তারা মু'মিন নয়। তারা আল্লাহর সাথে ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে ধোকাবাজি করছে। কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরকেই প্রতারণা করছে, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।<sup>১১</sup> তাদের হৃদয়ে আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন,<sup>১২</sup> আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে যত্নগাদায়ক শাস্তি। যখনই তাদের বলা হয়েছে, যদীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা একথাই বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী।

পাঁচ : বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সম্পদ ও অসম্পদ সাফল্য ও ব্যর্থতার আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহর শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্তরে যাবে সে-ই হচ্ছে সফলকাম আর সেখানে যে উত্তরোবে না সে ব্যর্থ।

এ সংগ্রহ আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে যারা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি তারা কুরআন থেকে কোনক্রিমেই উপকৃত হতে পারবে না। কারণ এ বিষয়গুলো অঙ্গীকার করা তো দূরের কথা এগুলো সম্পর্কে কারো মনে যদি সামান্যতম দিখা ও সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে যান্যয়ের জীবনের জন্য কুরআন যে পদ্ধনির্দেশ করেছে সে পথে তারা চলতে পারবে না।

৯. অর্থাৎ ওপরে বর্ণিত ছয়টি শর্ত যারা পূর্ণ করেনি অথবা সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও গ্রহণ করতে অঙ্গীকৃতি জানিয়েছে।

১০. আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছিলেন বলেই তারা মনে নিতে অঙ্গীকার করেছিল—এটা এ বক্তব্যের অর্থ নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যখন তারা ওপরে বর্ণিত মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছিল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে

أَلَا إِنَّمَا هُمْ مُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا كَمَا أَمِنَ النَّاسُ قَالُوا أَنَّمِنْ كَمَا أَمِنَ السَّفَهَاءُ ۚ أَلَا إِنَّمَا هُمْ سَفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا أَمَنُوا ۝ وَإِذَا أَخْلَوُا إِلَى شَيْطَنِيهِمْ ۝ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ ۝ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝

সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়। আর যখন তাদের বলা হয়েছে, অন্য লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনে।<sup>১৩</sup> তখন তারা এ জবাবই দিয়েছে—আমরা কি ঈমান আনবো নির্বোধদের মতো?<sup>১৪</sup> সাবধান! আসলে এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না। যখন এরা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, বলে : “আমরা ঈমান এনেছি,” আবার যখন নিরিবিলিতে নিজেদের শয়তানদের<sup>১৫</sup> সাথে মিলিত হয় তখন বলে : “আমরা তো আসলে তোমাদের সাথেই আছি আর ওদের সাথে তো নিছক তামাশা করছি।”

দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি কখনো ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি অবশ্য এ মোহর লাগার অবস্থার ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবেন। আপনার উপস্থাপিত পথ যাচাই করার পর কোন ব্যক্তি একবার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে তখন উল্টো পথে তার মন-মানস এমনভাবে দৌড়তে থাকে যার ফলে আপনার কোন কথা আর তার বোধগম্য হয় না। আপনার দাওয়াতের জন্য তার কান হয়ে যায় বধির ও কালা। আপনার কার্যপদ্ধতির গুণাবলী দেখার ব্যাপারে তার চোখ হয়ে যায় অঙ্ক। তখন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, সত্যিই তার হৃদয়ের দুয়ারে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

১১. অর্থাৎ তাদের মুনাফেকী কার্যকলাপ তাদের জন্য লাভজনক হবে—এ ভুল ধারণায় তারা নিমজ্জিত হয়েছে। অথচ এসব তাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং আখেরাতেও। একজন মুনাফিক কয়েকদিনের জন্য দুনিয়ায় মানুষকে ধোকা দিতে পারে কিন্তু সবসময়ের জন্য তার এই ধোকাবাজি চলতে পারে না। অবশ্যে একদিন তার মুনাফিকীর গুমোর ফাঁক হয়ে যাবেই। তখন সমাজে তার সামান্যতম মর্যাদাও ঘৃতম হয়ে যাবে। আর আখেরাতের ব্যাপারে বলা যায়, সেখানে তো ঈমানের মৌখিক দাবীর কোন মূল্যই থাকবে না যদি আমল দেখা যায় তার বিপরীত।

১২. মুনাফিকীকেই এখানে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ এ রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি কালবিলস না করে ঘটনাস্থলেই মুনাফিকদেরকে তাদের মুনাফিকী কার্যকলাপের শাস্তি দেন না বরং তাদেরকে

الله يُسْتَهْزَئُ بِهِمْ وَيُهْلِكُهُمْ فِي طُفَيْلَةٍ يَعْمَلُونَ<sup>১৪</sup>  
 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْضَّلَالَةَ بِالْمُهْدَىٰ فَمَا رَبَحُتْ  
 تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَلِّينَ<sup>১৫</sup> مَتَلَّهُمْ كَمَثْلِ الَّذِي  
 أَسْتَوْقَلَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ  
 وَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يُصْرُونَ<sup>১৬</sup>

আগ্নাহ এদের সাথে তামাশা করছেন, এদের রশি দীর্ঘায়িত বা চিল দিয়ে যাচ্ছেন এবং এরা নিজেদের আগ্নাহদ্বোহিতার মধ্যে অক্ষের মতো পথ হাতড়ে যরছে। এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে, কিন্তু এ সওদাটি তাদের জন্য লাভজনক নয় এবং এরা মোটেই সঠিক পথে অবস্থান করছে না। এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো এবং যখনই সেই আগুন চারপাশ আলোকিত করলো তখন আগ্নাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের হেডে দিলেন এমন অবস্থায় যখন অঙ্কারের মধ্যে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।<sup>১৬</sup>

চিল দিতে থাকেন। এর ফলে মুনাফিকরা নিজেদের কলা-কৌশলগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে সফল হতে দেখে আরো বেশী ও পূর্ণ মুনাফিকী কার্যকলাপে লিঙ্গ হতে থাকে।

১৩. অর্থাৎ তোমাদের এলাকার অন্যান্য লোকেরা যেমন সাক্ষা দিসে ও সরল অন্তঃকরণে মুসলমান হয়েছে তোমরাও যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চাও তাহলে তেমনি নিষ্ঠা সহকারে সাক্ষা দিলে গ্রহণ করো।

১৪. যারা সাক্ষা দিলে নিষ্ঠা সহকারে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে উৎপীড়ন, নির্যাতন, কষ্ট ও বিপদের মুখে নিক্ষেপ করছিল তাদেরকে তারা নির্বোধ মনে করতো। তাদের মতে নিষ্ঠক সত্য ও ন্যায়ের জন্য সারা দেশের জনসমাজের শক্রতার মুখোমুখি হওয়া নিরেট বোকায়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মনে করতো, এক ও বাতিলের বিতর্কে না পড়ে সব ব্যাপারেই কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখাই বৃদ্ধিমানের কাজ।

১৫. আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী, দাঙ্গিক ও বৈরাচারীকে শয়তান বলা হয়। মানুষ ও জিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোন কোন জায়গায় আবার শয়তান প্রকৃতির মানুষদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে এসব ক্ষেত্রে

صَرْبَكْرَمِيْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٥﴾ أَوْ كَصَّبَ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ  
ظَلَمَتْ وَرَعْدَ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ  
الصَّوَاعِقِ حَلَّ الْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكُفَّارِ ﴿٦﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ  
يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كَلَّا أَضَاءَ لَهُمْ هَشْوًا فِيهِ قُوَّةٌ وَإِذَا أَظْلَمَ  
عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنْ هَبَ بِسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧﴾

তারা কালা, বোবা, অঙ্ক।<sup>১৭</sup> তারা আর ফিরে আসবে না। অথবা এদের দৃষ্টিক্ষেত্র এমন যে, আকাশ থেকে মুশলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে আছে অঙ্ককার মেঘমালা, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক। বজপাতের আওয়াজ ওনে নিজেদের প্রাণের ভয়ে এরা কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ এ সত্য অঙ্ককারকারীদেরকে সবদিক দিয়ে ফিরে রেখেছেন।<sup>১৮</sup> বিদ্যুৎ চমকে তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যেন বিদ্যুৎ শীগৃগির তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে। যখন সামান্য একটু আলো তারা অনুভব করে তখন তার মধ্যে তারা কিছুদূর চলে এবং যখন তাদের ওপর অঙ্ককার হেঝে যায় তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।<sup>১৯</sup> আল্লাহ চাইলে তাদের প্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি একেবারেই কেড়ে নিতে পারতেন।<sup>২০</sup> নিসন্দেহে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

কোথায় শয়তান শব্দটি জিনদের জন্য এবং কোথায় মানুষদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। তবে আমাদের আলোচ্য স্থানে শয়তান শব্দটিকে বহুবচনে ‘শায়াতীন’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে ‘শায়াতীন’ বলতে মুশরিকদের বড় বড় সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সরদাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

১৬. যখন আল্লাহর এক বাল্দা আলো জ্বালালেন এবং ইককে বাতিল থেকে, সত্যকে মিথ্যা থেকে ও সরল সোজা পথকে ভুল পথ থেকে ছেটে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে ফেললেন তখন চক্ষুয়ান ব্যক্তিদের কাছে সত্য উদ্ভুসিত হয়ে উঠলো সুস্পষ্ট দিবালোকের মতো। কিন্তু প্রবৃত্তি পৃজ্ঞায় অক মুনাফিকরা এ আলোয় কিছুই দেখতে পেলো না। “আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন”—বাক্যের কারণে কেউ যেন এ ভুল ধারণা পোষণ না করেন যে, তাদের অঙ্ককারে হাতড়ে মরার জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়। যে ব্যক্তি নিজে হক ও সত্যের প্রত্যাশী নয়, নিজেই হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে নিজের বুকে

بِأَيْمَانَ النَّاسُ أَعْبَدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُوكُمْ وَالَّذِي مِنْ  
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا  
 وَالسَّمَاءَ بَنَاءً مَوَازِنًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمْرِ  
 رَزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَّ أَدًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৩ রুক্ত

হে মানব জাতি।<sup>১</sup> ইবাদাত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবার সৃষ্টিকর্তা, এভাবেই তোমরা নিষ্ঠতি লাভের আশা করতে পারো।<sup>২</sup> তিনিই তোমাদের জন্য মাটির শয়া বিছিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরি করেছেন, ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে সব রকমের ফসলাদি উৎপন্ন করে তোমাদের আহার যুগিয়েছেন। কাজেই একথা জানার পর তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষে পরিগত করো না।<sup>৩</sup>

আৰকড়ে ধৰে এবং সত্ত্বের আলোকোজ্জ্বল চেহৰা দেখার আগ্রহ যার মোটেই নেই, আল্লাহ তারই দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন। সত্ত্বের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে নিজেই যখন বাতিলের অক্ষকারে হাতড়ে মরতে চায় তখন আল্লাহও তাকে তারই সুযোগ দেন।

১৭. হককথা শোনার ব্যাপারে বধির, হককথা বলার ক্ষেত্রে বোবা এবং হক ও সত্ত্ব দেখার প্রশ্নে অক্ষ।

১৮. কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে এরা ক্ষঁসের হাত থেকে বেঁচে যাবে—এ ধারণায় কিছুক্ষণের জন্য ডুবে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবে তারা বাঁচতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন।

১৯. প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল এমন সব মুনাফিকদের যারা মানসিক দিক দিয়ে ঈমান ও ইসলামকে পুরোপুরি অধীকার করতো কিন্তু কোন ব্যাখ্যা ও সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। আর এ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে সন্দেহ, সংশয় ও ধিকার শিকার এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের। এরা কিছুটা সত্ত্ব ধীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু সে জন্য বিপদ-মুসিবত, কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। এ দৃষ্টান্তে বৃষ্টি বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। ইসলাম বিশ্বাসনবতার জন্য একটি রহমত রূপে আবির্ভূত হয়েছে। অক্ষকার মেঘমালা, বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রের গর্জন বলে এখানে সেই ব্যাপক দৃঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও সংকটের কথা বুঝানো হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলায় জাহেলী শক্তির প্রবল বিরোধিতার মুখে যেগুলো একের পর এক সামনে

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ  
مِّنْ مِثْلِهِ مَوْا دُعُوا شَهِدًا إِكْرَمٌ دُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
صُلْقِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۝ أَعِلَّتْ لِلْكُفَّارِينَ ۝

আর যে কিতাবটি আমি আমার বাল্দার ওপর নাখিল করেছি সেটি আমার কিনা—এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো—এক আল্লাহকে ছাড়া আর যার যার চাও তার সাহায্য নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এ কাজটি করে দেখাও।<sup>১৪</sup> কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো আর নিসন্দেহে কথনই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে তয় করো সেই আগুনকে, যার ইঞ্জন হবে মানুষ ও পাথর,<sup>১৫</sup> যা তৈরি রাখা হয়েছে সত্য অব্বীকারকারীদের জন্য।

আসছিল। দৃষ্টান্তের শেষ অংশে এক অভিনব পদ্ধতিতে এ মুনাফিকদের এ অবস্থার নকশা আঁকা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাপারটি একটু সহজ হয়ে গেলে তারা চলতে থাকে আবার সমস্যা-সংকটের জট পাকিয়ে গেলে অথবা তাদের প্রবৃত্তি বিরোধী হয়ে পড়লে বা জাহেলী স্বার্থে আঘাত পড়লে তারা স্টান দাঁড়িয়ে যায়।

২০. অর্থাৎ যেভাবে প্রথম ধরনের মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেভাবে আল্লাহ তাদেরকেও হক ও সত্যের ব্যাপারে কানা ও কালায় পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কিছুটা দেখতে ও শুনতে চায় তাকে ততটুকুও দেখতে শুনতে না দেয়া আল্লাহর সীতি নয়। যতটুকু হক দেখতে ও শুনতে তারা প্রস্তুত ছিল আল্লাহ ততটুকু প্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি তাদের আয়ত্তুল্লাইনে রেখেছিলেন।

২১. যদিও কুরআনের দাওয়াত সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য তবুও এ দাওয়াত থেকে লাভবান হওয়া না হওয়া মানুষের নিজের ইচ্ছা প্রবণতার ওপর এবং সেই প্রবণতা অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রথমে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে কোন ধরনের লোক এ কিতাবের পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হতে পারে এবং কোন ধরনের লোক লাভবান হতে পারে না তা সুন্পট করে দেয়া হয়েছে। তারপর এখন সমগ্র মানবজাতির সামনে সেই আসল কথাটিই পেশ করা হচ্ছে, যেটি পেশ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

২২. অর্থাৎ দুনিয়ায় ভুল চিত্তা-দর্শন, ভুল কাজ-কর্ম ও আখ্যেরাতে আল্লাহর আয়ার থেকে নিষ্ক্রিয়লাভের আশা করতে পারো।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحِتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٌ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ كَلَمًا رِزْقًا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا  
قَاتِلُوا هُنَّ الَّذِينَ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًامَوْلَاهُنَّ الَّذِينَ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا  
آرْوَاحٌ مُطْهَرَةٌ وَهُنَّ فِيهَا خَلِيلُونَ ⑩

আর হে নবী, যারা এ কিতাবের ওপর দ্বিমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুব্রহ্মণ্য দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলে উঠবে : এ ধরনের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো।<sup>২৬</sup> তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্তুগণ<sup>২৭</sup> এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।

২৩. অর্থাৎ যখন তোমরা নিজেরাই একথা স্থীকার করো এবং এ সমস্তই আল্লাহ করেছেন বলে তোমরা জানো তখন তোমাদের সমস্ত বল্দেগী ও দাসত্ব একমাত্র তাঁর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। আর কার বল্দেগী ও দাসত্ব তোমরা করবে? আর কে এর অধিকারী হতে পারে? অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানাবার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের দাসত্ব ও বল্দেগীর মধ্য থেকে কোনটিকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাথে সম্পর্কিত করা। সামনের দিকে কুরআনে এ সম্পর্কে বিশুরিত আলোচনা পাওয়া যাবে। তা থেকে জানা যাবে, কোন ধরনের ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, যাতে অন্যদেরকে শরীক ‘শিরক’-এর অন্তরভুক্ত এবং যার পথ রোধ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

২৪. ইতিপূর্বে মকায় কয়েকবার এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছিল, যদি তোমরা এ কুরআনকে মানুষের রচনা মনে করে থাকো তাহলে এর সমমানের কোন বাণী রচনা করে আনো। এখন মদীনায় এসে আবার সেই একই চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। (দেখুন সূরা ইউনুস ৩৮ আয়াত, সূরা হুদ ১৩ আয়াত, সূরা বনী ইসরাইল ৮৮ আয়াত এবং সূরা তুর ৩৩-৩৪ আয়াত)।

২৫. এখানে একটি সৃষ্টি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে দোজখের ইন্দ্রন কেবল তোমরা একাই হবে না বরং তোমাদের সাথে থাকবে তোমাদের ঠাকুর ও আরাধ্য দেবতাদের সেই সব মূর্তি যাদেরকে তোমরা মাবুদ ও আরাধ্য বানিয়ে পূজা করে আসছিলে। তখন তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে যোদায়ী করার ও উপাস্য হবার ব্যাপারে এদের অধিকার কতটুকু।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي إِنْ يُضْرِبَ مَثَلًا مَابَعُوهُ فَمَا فَوْقَهَا  
 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ يَنْ  
 كْفِرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَّا مَثَلًا يُفْلِي بِهِ كَثِيرًا  
 وَيَمْلِئُ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُفْلِي بِهِ إِلَّا الْفَسِيقِينَ ﴿الَّذِينَ  
 يَنْقضُونَ عَهْلَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ مِنْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ  
 يَوْصَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾

অবশ্য আগ্নাহ লজ্জা করেন না মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ কোন জিনিসের দৃষ্টিতে।<sup>২৮</sup> যারা সত্য গ্রহণকারী তারা এ দৃষ্টিতে-উপমাগুলো দেখে জানতে পারে এগুলো সত্য, এগুলো এসেছে তাদের রবেরই পক্ষ থেকে, আর যারা (সত্যকে) গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় তারা এগুলো শুনে বলতে থাকে, এ ধরনের দৃষ্টিতে-উপমার সাথে আগ্নাহের কী সম্পর্ক? এভাবে আগ্নাহ একই কথার সাহায্যে অনেককে গোমরাহীতে লিঙ্গ করেন আবার অনেককে দেখান সরল সোজা পথ।<sup>২৯</sup> আর তিনি গোমরাহীর মধ্যে তাদেরকেই নিষ্কেপ করেন যারা ফাসেক,<sup>৩০</sup> যারা আগ্নাহের সাথে মজবুতভাবে অংগীকার করার পর আবার তা ভেঙ্গে ফেলে,<sup>৩১</sup> আগ্নাহ যাকে জোড়ার হকুম দিয়েছেন তাকে কেটে ফেলে<sup>৩২</sup> এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে চলে।<sup>৩৩</sup> আসলে এরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৬. অর্থাৎ এ ফলগুলো নতুন ও অপরিচিত হবে না। দুনিয়ায় যেসব ফলের সাথে তারা পরিচিত ছিল সেগুলোর সাথে এদের আকার আকৃতির মিল থাকবে। তবে হী এদের স্বাদ হবে অনেক শুণ বেশী ও উরত পর্যায়ের। যেমন ধুরুন আম, কমলা ও ডালিমের মতো হবে অনেকগুলো ফল। জান্নাতবাসীরা ফলগুলো দেখে চিনতে পারবে—এগুলো আম, এগুলো কমলা এবং এগুলো ডালিম। কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে দুনিয়ার আম, ব.মলা ও ডালিমকে এর সাথে তুলনাই করা যাবে না।

২৭. মূল আরবী বাকে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুচন। এর একবচন হচ্ছে 'যওজ'। এর অর্থ হচ্ছে 'জোড়া।' এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রী উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যওজ।' আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যওজ।' তবে আখেরাতে 'আযওয়াজ' অর্থাৎ জোড়া হবে পবিত্রতার গুণবলী সহকারে। যদি দুনিয়ায় কোন সৎকর্মশীল পুরুষের স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয় তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন-

হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোন সৎকর্মশীলা স্তু দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোন স্তু হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্থামী হয় অসৎ তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্থামী থেকে তাকে বিছিন করে কোন সৎপুরুষকে তার স্থামী হিসেবে দেয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোন স্থামী-স্তু দু'জনই সৎকর্মশীল হয় তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরস্মৃত ও চিরস্মৃতী সম্পর্কে পরিণত হবে।

২৮. এখানে একটি আপত্তি ও প্রয়ের উপরে না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বকুব্য সুস্পষ্ট করার জন্য মশা, মাছি ও মাকড়শা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। বিরোধীরা এর ওপর আপত্তি উঠিয়েছিল, এটা কোনু ধরনের আল্লাহর কালাম যেখানে এই ধরনের তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে? তারা বলতো, এটা আল্লাহর কালাম হলে এর মধ্যে এসব বাজে কথা থাকতো না।

২৯. অর্থাৎ যারা কথা বুঝতে চায় না, সভোর শর্ম অনুসর্কান করে না, তাদের দৃষ্টি তো কেবল শব্দের বাইরের কাঠামোর ওপর নিবন্ধ থাকে এবং ঐ জিনিসগুলো থেকে বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সত্য থেকে আরো দূরে চলে যায়। অপর দিকে যারা নিজেরাই সত্য সন্দানী এবং সঠিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী তারা ঐ সব কথার মধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের আলোকচ্ছটা দেখতে পায়। এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ কথা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হতে পারে বলে তাদের সমগ্র হৃদয় মন সাক্ষ দিয়ে ওঠে।

৩০. ফাসেক তাকে বলে যে নাফরমান এবং আল্লাহর আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে যায়।

৩১. বাদশাহ নিজের কর্মচারী ও প্রজাদের নামে যে ফরমান বা নির্দেশনামা জারী করেন আরবী ভাষায় প্রচলিত কথ্যরীতিতে তাকে বলা হয় ‘আহদ’ বা অংগীকার। কারণ এই অংগীকার মেনে চলা হয় প্রজাদের অপরিহার্য কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। এখানে অংগীকার শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর অংগীকার অর্থ হচ্ছে, তাঁর স্থায়ী ফরমান। এই ফরমানের দৃষ্টিতে বলা যায়, সমগ্র মানবজাতি একমাত্র তাঁরই বন্দেগী, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা করার জন্য আদিষ্ট ও নিযুক্ত হয়েছে। ‘মজবুতভাবে অংগীকার করার পর’ —কথাটি বলে আসলে হ্যরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির সমগ্র সমগ্র মানবাত্মার নিকট থেকে এ ফরমানটির আনুগত্য করার যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সেদিকে ইধেগত করা হয়েছে। সূরা আরাফ—এর ১৭২ আয়াতে এই অংগীকারের ওপর তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ যেসব সম্পর্ককে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করার ওপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণ নির্ভর করে এবং আল্লাহ যেগুলোকে ক্রমিকভাবে হৃকুম দিয়েছেন, তার ওপর এরা অন্ত চালায়। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে রয়েছে অর্থের অশেষ ব্যাপকতা। ফলে দু'টি মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ডিস্ট্রিভ গড়ে উঠেছে যে মানবিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নেতৃত্বকার বিশাল জগত তার সমগ্র অবয়বও এই অর্থের আওতাধীনে এসে যায়। সম্পর্ক কেটে ফেলার অর্থ নিষ্কর্ষ মানবিক সম্পর্কচ্ছেদ নয় বরং সঠিক ও বৈধ সম্পর্ক ছাড়া অন্য যত প্রকারের সম্পর্ক কায়েম করা হবে তা সবই এর অন্তরভুক্ত হবে।

كَيْفَ تَكْفِرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاهُ كَمْ ؟ ثُمَّ يُمْتَكِرُ ثُمَّ  
 يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ④٦٥ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ  
 جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسُوِّيَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ  
 بِكُلِّ شَرْعٍ عَلِيمٌ ④٦٦

তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন করে কুফরীর আচরণ করতে পারো। অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। অতপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং অতপর তিনি তোমাদের জীবন দান করবেন। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন। তারপর ওপরের দিকে লক্ষ করলেন এবং সাত আকাশ বিন্যস্ত করলেন<sup>৩৪</sup> তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।<sup>৩৫</sup>

কারণ অবৈধ ও ভুল সম্পর্কের পরিণতি এবং সম্পর্কচ্ছেদের পরিণতি একই। অর্থাৎ এর পরিণতিতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয় এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হয় ধ্বংসের মুখ্যমূলি।

৩৩. এই তিনটি বাক্যের মধ্যে ফাসেকী ও ফাসেকের চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বাদ্দার মধ্যকার সম্পর্ক এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন বা বিকৃত করার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বিপর্যয়। আর যে ব্যক্তি এ বিপর্যয় সৃষ্টি করে সেই হচ্ছে ফাসেক।

৩৪. সাত আকাশের তাৎপর্য কি? সাত আকাশ বলতে কি বুঝায়। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া কঠিন। মানুষ প্রতি যুগে আকাশ বা অন্য কথায় পৃথিবীর বাইরের জগত সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ ও ধারণা-বিশ্লেষণ অনুশায়ী বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদের অনুসারী হয়েছে। এ চিন্তা ও মতবাদগুলো বিভিন্ন সময় বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই এর মধ্য থেকে কোন একটি মতবাদ নির্দেশ করে তার ভিত্তিতে কুরআনের এই শব্দগুলোর অর্থ নির্ণয় করা ঠিক হবে না। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, সত্ত্বত পৃথিবীর বাইরে যতগুলো জগত আছে সবগুলোকেই আল্লাহ সাতটি সুদৃঢ় স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন অথবা এই বিশ্ব-জাহানের যে স্তরে পৃথিবীর অবস্থিতি সেটি সাতটি স্তর সমৰিত।

৩৫. এই বাক্যটিতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই যে আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গতিবিধি ও কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন এবং যার দৃষ্টি দেকে তোমাদের কোন গতিবিধিই গোপন থাকতে পারে না তাঁর মোকাবিলায় তোমরা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করার সাহস কর কেমন করে? দুই, যে আল্লাহ যাবতীয় সত্য

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً  
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ  
 نُسَيْمُ بِحَمْدِكَ وَنَقْلِسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ<sup>৩৬</sup>  
 وَعَلَمْتُ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضْتُهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ «فَقَالَ  
 آنِيَّتُو نِيَّ بِاسْمَاءَ هُوَ لَاءٌ إِنْ كَنْتُمْ صُلْقِينَ<sup>৩৭</sup>

৪ রুক্ত

আবার<sup>৩৬</sup> সেই সময়ের কথা একটু শরণ কর যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের<sup>৩৭</sup> বলেছিলেন, “আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা—প্রতিনিধি<sup>৩৮</sup> নিযুক্ত করতে চাই।” তারা বললো, “আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে চান যে সেখানকার ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্ত করবে এবং রক্ষপাত করবে?<sup>৩৯</sup> আপনার প্রশংসা ও স্তুতিসহকারে তাসবীহ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা তো আমরা করেই যাচ্ছি।”<sup>৪০</sup> আগ্নাহ বললেন, “আমি জানি যা তোমরা জানো না।”<sup>৪১</sup> অতপর আগ্নাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন<sup>৪২</sup> তারপর সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, “যদি তোমাদের ধারণা সঠিক হয় (অর্থাৎ কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হবে) তাহলে একটু বলতো দেখি এই জিনিসগুলোর নাম?”

জানের অধিকারী, যিনি আসলে সমস্ত জানের উৎস তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অঙ্গতার অন্ধকারে মাথা কুটে মরা ছাড়া তোমাদের আর কী লাভ হতে পারে! তিনি ছাড়া যখন জানের আর কোন উৎস নেই, তোমাদের জীবনের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখার জন্য যখন তাঁর কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও থেকে আলো পাওয়ার সওচাবনা নেই তখন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে তোমরা নিজেদের জন্য এমন কি কল্যাণ দেখতে পেলে?

৩৬. ওপরের রুক্ত'তে আগ্নাহের বদ্দেগী করার আহবান জানানো হয়েছিল। এ আহবানের ভিত্তিভূমি ছিল নিম্নরূপ : আগ্নাহ তোমাদের শৃষ্টা ও প্রতিপালক। তাঁর হাতেই তোমাদের জীবন ও মৃত্যু। যে বিশ্ব-জগতে তোমরা বাস করছো তিনিই তার একচ্ছত্র অধিপতি ও সার্বভৌম শাসক। কাজেই তাঁর বদ্দেগী ছাড়া অন্য কোন পক্ষতি তোমাদের জন্য সঠিক নয়। এখন এই রুক্ত'তে অন্য একটি ভিত্তিভূমির ওপর ঐ একই আহবান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ এই দুনিয়ায় আগ্নাহ তোমাদেরকে খলীফা পদে অভিযিক্ত করেছেন।

খলীফা হবার কারণে কেবল তাঁর বল্দেগী করলেই তোমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না বরং এই সংগে তাঁর পাঠানো হিদায়াত ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী জীবন যাপনও করতে হবে। আর যদি তোমরা এমনটি না কর তোমাদের আদি শক্তি শয়তানের ইঁথগতে চলতে থাকো, তাহলে তোমরা নিকৃষ্ট পর্যায়ের বিদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং এ জন্য তোমাদের চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মানুষের স্তরপ ও বিশ্ব-জগতে তার মর্যাদা ও ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মানবজাতির ইতিহাসের এমন অধ্যায়ও উপস্থাপন করা হয়েছে যে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন মাধ্যম মানুষের করায়ন্ত নেই। এই অধ্যায়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লাভ করা হয়েছে তা প্রত্যন্তিক পর্যায়ে মাটির তলদেশ খুড়ে বিশিষ্ট অস্থি ও কংকাল একত্র করে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সেগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে অনেক বেশী মৃল্যবান।

৩৭. এখানে মূল আরবী শব্দ ‘মালাইক’ হচ্ছে বহবচন। একবচন ‘মালাক!’ মালাক-এর আসল মানে “বাণীবাহক।” এরি শান্তিক অনুবাদ হচ্ছে ‘যাকে পাঠানো হয়েছে’ বা ফেরেশতা। ফেরেশতা নিছক কিছু কায়াইন, অস্তিত্বহীন শক্তির নাম নয়। বরং এরা সুস্পষ্ট কায়া ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। আল্লাহর তার এই বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় তাদের দ্বেষমত নিয়ে থাকেন। তাদেরকে আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের কর্মচারী বলা যায়। আল্লাহর বিধান ও নির্দেশাবলী তারা প্রবর্তন করে থাকেন। মূর্খ লোকেরা ভুলক্রমে তাদেরকে আল্লাহর কর্তৃত ও কাজ-কারবারে ধংশীদার মনে করে। কেউ কেউ তাদেরকে মনে করে আল্লাহর আন্তরীয়। এ জন্য দেবতা বানিয়ে তাদের পূজা করে।

৩৮. যে ব্যক্তি কারো অধিকারের আওতাধীনে তারই অপিত ক্ষমতা-ই-ইতিয়ার ব্যবহার করে তাকে খলীফা বলে। খলীফা নিজে মালিক নয় বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি। সে নিজে ক্ষমতার অধিকারী নয় বরং মালিক তাকে ক্ষমতার অধিকার দান করেছেন, তাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করে। সে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করার অধিকার রাখে না। বরং মালিকের ইচ্ছে পূরণ করাই হয় তার কাজ। যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার ওপর অপিত ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে থাকে অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছে পূরণ করতে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে, তাহলে এগুলো সবই বিদ্রোহ ও বিশাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে।

৩৯. এটা ফেরেশতাদের আপত্তি ছিল না। বরং এটা ছিল তাদের জিজ্ঞাসা। আল্লাহর কোন পরিকল্পনার বিকল্পে আপত্তি উত্থাপন করার অধিকারই ফেরেশতাদের ছিল না। ‘খলীফা’ শব্দটি থেকে তারা অবশ্য এতটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, পরিকল্পনায় উল্লেখিত সৃষ্টিজীবকে দুনিয়ায় কিছু ক্ষমতা-ই-ইতিয়ার দান করা হবে। তবে বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল সাম্রাজ্য আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আওতাধীনে কোন স্থাধীন ক্ষমতাসম্পর্ক সৃষ্টিজীব কিভাবে অবস্থান করতে পারে—একথা তারা বুঝতে পারছিল না। এই সাম্রাজ্যের কোন অংশে কাউকে যদি সামান্য কিছু স্থাধীন ক্ষমতা দান করা হয় তাহলে সেখনকার ব্যবস্থাপনা বিপর্যয়ের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে, একথা তারা বুঝতে চাইছিল।

قَالَ وَاسْبِحْنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ  
 الْكَبِيرُ ⑩ قَالَ يَا دُمَّ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ  
 قَالَ أَلَّمْ أَقْلِلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ بِالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَأَعْلَمُ مَا تَبْدِلُونَ وَمَا كَنْتُمْ تَكْتَمُونَ ⑪

তারা বললো : “ক্রটিমুক্ত তো একমাত্র আপনারই সত্তা, আমরা তো মাত্র তত্ত্বকু জ্ঞান রাখি যতটুকু আপনি আমাদের দিয়েছেন।” ৪৩ প্রকৃতপক্ষে আপনি ছাড়া আর এমন কোন সত্তা নেই যিনি সবকিছু জানেন ও সবকিছু বোবেন।” তখন আল্লাহ আদমকে বললেন, “তুমি ওদেরকে এই জিনিসগুলোর নাম বলে দাও।” যখন সে তাদেরকে সেসবের নাম জানিয়ে দিল ৪৪ তখন আল্লাহ বললেন : “আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আকাশ ও পৃথিবীর এমন সমস্ত নিগৃত তত্ত্ব জানি যা তোমাদের অগোচরে রয়ে গেছে, যা কিছু তোমরা প্রকাশ করে থাকো তা আমি জানি এবং যা কিছু তোমরা গোপন করো তাও আমি জানি।”

৪০. এই বাক্যে ফেরেশতারা একথা বলতে চায়নি যে, খিলাফত তাদেরকে দেয়া হোক কারণ তারাই এর হকদার। বরং তাদের বক্তব্যের অর্থ ছিল : হে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ! আপনার হৃকুম পালন কর ইচ্ছ। আপনার বিধান কার্যকর করার জন্য আমরা সর্বান্বকভাবে তৎপর রয়েছি। অঃঃঃ... মহান ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত বিশ্ব-জাহানকে আমরা পাক পবিত্র করে রাখছি। আর এই সাথে আপনার প্রশংসাগীত গাওয়া ও শ্বে-স্তুতি করা হচ্ছে। আমরা আপনার খাদেমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার তাসবীহ পড়ছি তাহলে এখন আর কিসের অভাব থেকে যায়? একজন খলীফার প্রয়োজন দেখা দিল কেন? এর কারণ আমরা বুঝতে পারছি না। (তাসবীহ শব্দটির দুই অর্থ হয়। এর একটি অর্থ যেমন পবিত্রতা বর্ণনা করা হয় তেমনি অন্য একটি অর্থ হয় তৎপরতার সাথে কাজ করা এবং মনোযোগ সহকারে প্রচেষ্টা চালানো। ঠিক এভাবেই তাকদীস শব্দটিও দুই অর্থ হয়। এক, পবিত্রতার প্রকাশ ও বর্ণনা এবং দুই, পাক-পবিত্র করা।)

৪১. এটি হচ্ছে ফেরেশতাদের দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব। বলা হয়েছে, খলীফা নিযুক্ত করার কারণ ও প্রয়োজন আমি জানি, তোমরা তা বুঝতে পারবে না। তোমরা নিজেদের যে সমস্ত কাজের কথা বলছো, সেগুলো যথেষ্ট নয়। বরং এর চাইতেও বেশী আরো কিছু আমি চাই। তাই পৃথিবীতে ক্ষমতা-ইখতিয়ার সম্পন্ন একটি জীব সৃষ্টি করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৪২. কোন বস্তুর নামের মাধ্যমে মানুষ তার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকে, এটিই হয় মানুষের জ্ঞানলাভের পদ্ধতি। কাজেই মানুষের সমস্ত তথ্যজ্ঞান মূলত বস্তুর নামের সাথে

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِئَكَةِ اسْجُدُوا لِإِدْمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرِيزْ أَبِي  
وَأَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِ ⑤

তারপর যখন ফেরেশতাদের হকুম দিলাম, আদমকে সামনে নত হও, তখন সবাই<sup>৪৫</sup> অবনত হলো, কিন্তু ইবলিস<sup>৪৬</sup> অঙ্গীকার করলো। সে নিজের শেষের অহংকারে মেতে উঠলো এবং নাফরমানদের অন্তরভুক্ত হলো।<sup>৪৭</sup>

জড়িত। তাই আদমকে সমস্ত নাম শিখিয়ে দেয়ার মানেই ছিল তাকে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান দান করা হয়েছিল।

৪৩. মনে হচ্ছে প্রত্যেকটি ফেরেশতার এবং ফেরেশতাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর জ্ঞান তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন বাতাসের ব্যবহাপনার সাথে জড়িত আছেন যেসব ফেরেশতা তারা বাতাস সম্পর্কে সবকিছু জানেন কিন্তু পানি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অন্যান্য বিভাগের ফেরেশতাদের অবস্থাও এমনি। এদের বিপরীত পক্ষে মানুষকে ব্যাপকতর জ্ঞান দান করা হয়েছে। এক একটি বিভাগ সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ফেরেশতাদের চাইতে তা কোন অংশে কম হলেও সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিভাগের জ্ঞান মানুষকে যেভাবে দান করা হয়েছে তা ফেরেশতারা সাড় করতে পারেননি।

৪৪. এই মহড়াটি ছিল ফেরেশতাদের প্রথম সদেহের জবাব। এভাবে আল্লাহ যেন জানিয়ে দিলেন, আদমকে আমি কেবল স্বাধীন ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিচ্ছি না বরং তাকে জ্ঞানও দিচ্ছি। তার নিয়োগে তোমরা যে বিপর্যয়ের আশংকা করছো, তা এ ব্যাপারটির একটি দিক মাত্র। এর মধ্যে কল্যাণের আর একটি দিকও আছে। বিপর্যয়ের দিকটির তুলনায় এই কল্যাণের শুরুত্ব ও মূল্য অনেক বেশী। ছোটখাট ক্ষতি ও অকল্যাণের জ্যন্ত্য বড় রকমের সাড় ও কল্যাণকে উপেক্ষা করা বৃদ্ধিমানের কাজ নয়।

৪৫. এর অর্থ হচ্ছে, পৃথিবী ও তার সাথে সম্পর্কিত মহাবিশ্বের বিভিন্ন শরে যে পরিমাণ ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন তাদের সবাইকে মানুষের জন্য অনুগত ও বিজিত হয়ে যাবার হকুম দেয়া হয়েছে। যেহেতু এই এলাকায় আল্লাহর হকুমে মানুষকে তার খৌফার পদে নিযুক্ত করা হচ্ছিল তাই ফরমান জারী হলো : আমি মানুষকে যে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দান করছি তালো-মন্দ যে কোন কাজে মানুষ তা ব্যবহার করতে চাইলে এবং আমার বিশেষ ইচ্ছার অধীনে তাকে সেটি করার সুযোগ দেয়া হলে তোমাদের যার যার কর্মক্ষেত্রের সাথে ঐ কাজের সম্পর্ক থাকবে। তাদের নিজেদের ক্ষেত্রের পরিধি পর্যন্ত ঐ কাজে তার সাথে সহযোগিতা করা হবে তোমাদের ওপর ফরয। সে চূরি করতে বা নামায পড়তে চাইলে, তালো কাজ বা মন্দ কাজ করার এরাদা করলে উভয় অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে তার পছন্দ অনুযায়ী কাজ করার অনুমতি দিতে থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত

তোমাদের দায়িত্ব হবে তার কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, কোন বাদশাহ যখন কোন ব্যক্তিকে নিজের রাজ্যের কোন প্রদেশের বা জেলার শাসক নিযুক্ত করেন তখন তার আনুগত্য করা সেই এলাকার সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে। তিনি কোন সঠিক বা বেষ্টিক কাজে তার ক্ষমতা ব্যবহার করুন না কেন যতদিন বাদশাহ চান ততদিন তাকে তার ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। তার সমস্ত কাজে সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাহায্য করতে হবে। তবে বাদশাহের পক্ষ থেকে যখন যে কাজটি না করতে দেয়ার ইধূগিত পাওয়া যাবে তখনই সেখানেই ঐ শাসকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খত্য হয়ে যাবে। এ সময় তিনি অনুভব করতে থাকেন যেন চারদিকের সমস্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তা ধৰ্মঘট করেছে। এমন কি বাদশাহের পক্ষ থেকে যখন ঐ শাসককে বরখাস্ত ও গ্রেফতার করার ফরমান জারী হয় তখন কাল পর্যন্ত তার অধীনে যারা কাজ করছিল এবং তার অঙ্গুলের ইশারায় যারা ওঠা-বসা করতো তারাই আজ তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে তাকে ফাসেক তথা বিদ্রোহীদের আবাসস্থলের দিকে নিয়ে যেতে একটুও দ্বিধা করে না। ফেরেশতাদেরকে আদমের সামনে সিজদান্ত হবার হকুম দেয়া হয়েছিল। এর ধরনটা কিছুটা এই রকমেরই ছিল। হতে পারে কেবল বিজিত হয়ে যাওয়াকেই হয়তো বা সিজদা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আবার অনুগত হয়ে যাওয়ার লক্ষণ হিসেবে তার বাহ্যিক প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটাও সম্ভবপর। তবে এটাই বেশী সঠিক বলে মনে হয়।

৪৬. ‘ইবলিস’ শব্দের অর্থ হচ্ছে, “চরম হতাশ।” আর পারিভাষিক অর্থে এমন একটি জিনকে ইবলিস বলা হয় যে আল্লাহর হকুমের নাফরমানি করে আদম ও আদম সন্তানদের অনুগত ও তাদের জন্য বিজিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মানবজাতিকে পথভেদ করার ও কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে ভুল পথে চলার প্রেরণা দান করার জন্য সে আল্লাহর কাছে সময় ও সুযোগ প্রার্থনা করেছিল। আসলে শয়তান ও ইবলিস নিছক কোন জড় শক্তি পিণ্ডের নাম নয়। বরং সেও মানুষের মতো একটি কায়া সম্পর্ক প্রাণীসম্পর্ক। তা ছাড়া সে ফেরেশতাদের অস্তরভূক্ত ছিল, এ ভুল ধৰণাও কারো না থাকা উচিত। কারণ পরবর্তী আলোচনাগুলোয় কুরআন নিজেই তার জিনদের অস্তরভূক্ত থাকার এবং ফেরেশতাদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিবেশন করেছে।

৪৭. এই শব্দগুলো থেকে মনে হয় সম্ভবত শয়তান একা সিজদা করতে অস্বীকার করেনি। বরং তার সাথে জিনদের একটি দলই আল্লাহর নাফরমানি করতে প্রস্তুত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে একমাত্র শয়তানের নাম নেয়া হয়েছে তাদের নেতা হবার এবং বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সবার চেয়ে বেশী অগ্রসর থাকার কারণে। কিন্তু এই আয়াতটির আর একটি অন্যবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছে : ‘সে ছিল কাফেরদের অস্তরভূক্ত।’ এ অবস্থায় এর অর্থ হবে : পূর্ব থেকেই জিনদের মধ্যে একটি বিদ্রোহী ও নাফরমান দল ছিল এবং ইবলিস এই দলের অস্তরভূক্ত ছিল। কুরআনে সাধারণভাবে ‘শায়াতীন’ (শয়তানরা) শব্দটি এসব জিন ও তাদের বংশধরদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর কুরআনের যেখানে ‘শায়াতীন’ শব্দের অর্থ ‘মানুষ’ বুঝার জন্য কোন স্পষ্ট নির্দেশন ও প্রমাণ নেই সেখানে এর অর্থ হবে জিন শয়তান।

وَقُلْنَا يَادًا مِّمَّا سَكَنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغْلًا حَيْثُ شِئْتَمَا سَوْلًا تَقْرَبَا هُنَّ إِلَيْهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَأَذْلَمَهَا الشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِّمَّا كَانَا فِيهِ ۝ وَقُلْنَا أَهِبْطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَوْ ۝ وَلَكُرْفِي الْأَرْضَ مُسْتَقْرٍ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۝

তখন আমরা আদমকে বললাম, “তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জানাতে থাকো এবং এখানে বাছন্দের সাথে ইচ্ছেমতো থেতে থাকো, তবে এই গাছটির কাছে যেয়ো না।<sup>৪৮</sup> অন্যথায় তোমরা দু'জন যালেমদের<sup>৪৯</sup> অস্তরভূক্ত হয়ে যাবে।” শেষ পর্যন্ত শয়তান তাদেরকে সেই গাছটির লোভ দেখিয়ে আমার হকুমের আনুগত্য থেকে সরিয়ে দিল এবং যে অবস্থার মধ্যে তারা ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়লো। আমি আদেশ করলাম, “এখন তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শক্তি।<sup>৫০</sup> তোমাদের একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে ও জীবন অতিবাহিত করতে হবে।”

৪৮. এ থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে অর্থাৎ নিজের কর্মসূলে খলীফা নিযুক্ত করে পাঠাবার আগে মানসিক প্রবণতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাদের দু'জনকে পরীক্ষা করার জন্য জানাতে রাখা হয়। তাদেরকে এভাবে পরীক্ষা করার জন্য একটি গাছ বাছাই করা হয়। হকুম দেয়া হয়, ঐ গাছটির কাছে যেয়ো না। গাছটির কাছে গেলে তার পরিণাম কি হবে তাও বলে দেয়া হয়। বলে দেয়া হয়, এমনটি করলে আমার দৃষ্টিতে তোমরা যালেম হিসেবে গণ্য হবে। সে গাছটি কি ছিল এবং তার মধ্যে এমন কি বিষয় ছিল যেজন্য তার কাছে যেতে নিয়ে করা হয়—এ বিতর্ক এখানে অবাস্তর। নিয়ে করার কারণ এ ছিল না যে, গাছটি প্রকৃতিগতভাবে এমন কোন দোষদুষ্ট ছিল যার ফলে তার কাছে গেলে আদম ও হাওয়ার ক্ষতি হবার সত্ত্বাবন্ধ ছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল আদম ও হাওয়ার পরীক্ষা। শয়তানের প্রলোভনের মোকাবিলায় তারা আল্লাহর এই হকুমটি কতটুকু মেনে চলে তা দেখা। এই উদ্দেশ্যে কোন একটি জিনিস নির্বাচন করাই যথেষ্ট ছিল। তাই আল্লাহই কেবল একটি গাছের নাম নিয়েছেন, তার প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি।

এই পরীক্ষার জন্য জানাতই ছিল সবচেয়ে উপযোগী স্থান। আসলে জানাতকে পরীক্ষাগ্রহ করার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, মানবিক মর্যাদার প্রেক্ষিতে তোমাদের জন্য জানাতই উপযোগী স্থান। কিন্তু শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যদি তোমরা আল্লাহর নাফরমানির পথে এগিয়ে যেতে থাকো তাহলে যেভাবে শুরুতে তোমরা এ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলে তেমনি শেষেও বঞ্চিত হবে। তোমাদের উপযোগী এই আবাসস্থলটি এবং এই হারানো ফিরদৌসটি লাভ করতে হলে তোমাদের অবশ্যি নিজেদের

فَتَلَقَّى أَدْمِنْ رِبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ<sup>৩</sup>

তখন আদম তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তাওবা করলো।<sup>৪১</sup> তার রব তার এই তাওবা কবুল করে নিলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।<sup>৪২</sup>

সেই দুশ্মনের সফল মোকাবিলা করতে হবে, যে তোমাদেরকে আল্লাহর হকুম মেনে চলার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

৪৯. যালেম শব্দটি গভীর অর্থবোধক। ‘যুলুম’ বলা হয় অধিকার হরণকে। যে ব্যক্তি কারো অধিকার হরণ করে সে যালেম। যে ব্যক্তি আল্লাহর হকুম পালন করে না, তাঁর নাফরমানি করে সে আসলে তিনটি বড় বড় মৌলিক অধিকার হরণ করে। প্রথমত সে আল্লাহর অধিকার হরণ করে। কারণ আল্লাহর হকুম পালন করতে হবে, এটা আল্লাহর অধিকার। দ্বিতীয়ত এই নাফরমানি করতে গিয়ে সে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে তাদের সবার অধিকার সে হরণ করে তার দেহের অংগ-প্রত্যুৎসুক, স্বায়ু মণ্ডলী, তার সাথে বসবাসকারী সমাজের অন্যান্য লোক, তার ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণ করার ব্যবহারপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণ এবং যে জিনিসগুলো সে তার কাজে ব্যবহার করে—এদের সবার তার ওপর অধিকার ছিল, এদেরকে কেবলমাত্রে এদের মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে তখন সে আসলে তাদের ওপর যুলুম করে। তৃতীয়ত তার নিজের অধিকার হরণ করে। কারণ তার ওপর তার আপন সন্তাকে ধূঃস থেকে বাঁচাবার অধিকার আছে। কিন্তু নাফরমানি করে যখন সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তিলাভের অধিকারী করে তখন সে আসলে নিজের ব্যক্তি সন্তার ওপর যুলুম করে। এসব কারণে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ‘গোনাহ’ শব্দটির জন্য যুলুম এবং ‘গোনাহগার’ শব্দটির জন্য যালেম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

৫০. অর্থাৎ মানুষের শক্তি শয়তান এবং শয়তানের শক্তি মানুষ। শয়তান মানুষের শক্তি, একথা তো সুস্পষ্ট। কারণ সে মানুষকে আল্লাহর হকুম পালনের পথ থেকে সরিয়ে রাখার এবং ধূঃসের পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু শয়তানের শক্তি মানুষ, একথার অর্থ কি? আসলে শয়তানের প্রতি শক্তির মনোভাব পোষণ করাই তো মানবতার দাবী। কিন্তু প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সামনে সে যে সমস্ত প্রলোভন এনে হারিয়ে করে মানুষ সেগুলোর দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাকে নিজের বকু ঢেবে বসে। এই ধরনের বকুত্বের অর্থ এ নয় যে, প্রকৃতপক্ষে শক্তি বকুত্বে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এক শক্তি আর এক শক্তির হাতে পরাজিত হয়েছে এবং তার জালে ফেঁসে গেছে।

৫১. অর্থাৎ আদম (আ) যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তিনি আল্লাহর নাফরমানির পথ পরিহার করে তাঁর হকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করতে চাইলেন এবং তাঁর মনে যখন নিজের রবের কাছে নিজের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আকাংখা জাগলো তখন ক্ষমা প্রার্থনা করার ভাষা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর অবস্থা দেখে আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা তাঁকে শিখিয়ে দিলেন।

قُلْنَا أَهِبْطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۝ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنْ هُنَّ فَمَنْ تَبْعَ  
هُنَّ أَيْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُنْ يَحْزَنُونَ ۝

ଆମରା ବଳାପଥ, “ତୋମରା ସବାହି ଏଥାନ ଥେକେ ନେମେ ଯାଏ ।”<sup>୫୩</sup> ଏରପର ଥଥିଲା  
ଆମର ପାଦ ଥେକେ କୋନ ହିନ୍ଦୀଯାତ ତୋମାଦେର କାହେ ପୌଛୁବେ ତଥାନ ଯାଇଲା ଆମର  
ମେହି ହିନ୍ଦୀଯାତର ଅନୁମରଣ କରିବେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଥାକବେ ନା କୋନ ତଥ ଦୁଃଖ ବେଦନା ।

ତାତେବାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ହିଲେ ଅମା । ବାନ୍ଦାର ପାକ ଥେକେ ତାତେବାର ଥିଲେ ହିଲେ ଏହି ଯେ,  
ମେ ମୈଜିଜିନ ଓ ବିଦ୍ୱାହେର ପଥ ପରିହର କରେ ବଦେଶୀର ଦିଲେ ପା ବାର୍ତ୍ତିଯେହେ । ଅର ହାତାହର  
ପାକ ଥେକେ ତାତେବାର କରାର ଥିଲେ ହିଲେ ଏହି ଯେ, ତିନି ନିଜେର ଲଭିତ ଓ ଅନୁତ୍ତ ଦଶେର ପ୍ରତି  
ଅନୁଗ୍ରହ ସହକାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଯେଇଲେ ଏବଂ ବାନ୍ଦାର ପ୍ରତି ତାର ଦାନ ପୂର୍ବାର ବସିତ ହତେ ତରିକେ  
କରିଲେ ।

୫୨. ପୋଶାହର ଫଳ ଅନିର୍ବାର୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ୟକେ ଅବଶ୍ୟ ତା ଭୋଗ କରିବେ ହେବେ, କୁରାନେ ଏ  
ମତବାଦେର ବିରକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜାନ୍ୟ । ଏଠା ମନ୍ୟରେ ଘନଗଡ଼ା ଭୁଲ ମତବାଦଗୁମ୍ରର ମଧ୍ୟେ ଏବଟି  
ଦୃଢ଼ି ବିଭାଗିତର ମତବାଦ କରିବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବାର ଗେନାହେ ଶିଖି ହେଯେଛେ ଏହି ମତବାଦ  
ତାକେ ପିରକାନ୍ତେ ଜନ୍ମା ହିତାକରି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵଳ କରେ । ଏକବର ନିଜେର ଭୂମି ବୁଝିଲେ ପେଣେ  
ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାର ଅଭିଭେତ ଭୁଲେର ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ତାହେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁସର  
ଜୀବନ ଯଥିଲା କରିବେ ଅନ୍ତର୍ହାତ୍ମି ହୁଏ, ଆହୁରେ ଏହି ମତବାଦ ତାକେ ବଲେ ତୋମାର ବୀଚାର କୋନ  
ଅନ୍ତର୍ହାତ୍ମି ହୁଏ, ଯା ବିହୁ ତୁମି କରେ ଏମେହେ ତାର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ତେବେକେ ଦୋଷ କରିବେ ହିଲେ ।  
ଏର ବିପରୀତ ପକ୍ଷେ ବୁଝିଲା ବଲେ, ମୁକ୍ତାଜେର ପୂର୍ବାର ଓ ଅନ୍ତର୍ଧାଜେର ଶାନ୍ତି ଦେଇର ଅନ୍ତର୍ଭାବ  
ମନ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧାର ହାତେ, ତୋମରା ଯେ ମୁକ୍ତାଜେର ପୂର୍ବକର ପାଞ୍ଚ ମେଟା ତୋମାଦେର ମୁକ୍ତାଜେର  
ଖାତ୍ତାବିକ ଫଳ ନାହିଁ, ତୋଟା ଅନ୍ତର୍ଧାର ଦାନ । ତିନି ଚାଇଲେ ଦାନ କରିବେ ପାରେନ, ଚାଇଲେ ମାନ୍ଦ  
କରିବେ ପାରେନ । ଅନୁରୂପତାରେ ତୋମରା ଯେ ମୁକ୍ତାଜେର ଶାନ୍ତି ବାତ କରୋ ମୋଟ ତୋମାଦେର  
ଅନ୍ତର୍ଧାଜେର ଅନିର୍ବାର୍ୟ ଯତ୍ନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବାପରେ ଅନ୍ତର୍ଧାର ଅଭିଭାବ ଓ ଇନ୍ତିଯାର ରୋହ,  
ତିନି ଚାଇଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଚାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଦିଲେ ପାରେନ । ତବେ ଅନ୍ତର୍ଧାର ଅନ୍ତର୍ଧାର ଓ  
ରେମନ୍ ତାର ଜାନ୍ମର ମାତ୍ରେ ଗଭିର ମୁଦ୍ରେ ଆବଦ୍ଧ, ତିନି ତାମ୍ଭେ ଇବାର କରିଲେ ତାର କ୍ଷମା  
କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଅନ୍ତର୍ଧାର କରାର ପ୍ରବନ୍ଧତା ମହିମା ଥାକେ ଆହୁରେ ଏବଂ  
ଧରନେର ଅପରାଧରେ ତିନି ଶାନ୍ତି ଦିଲେ ଥାକେନ । ଅର ଯେ ଅନ୍ତର୍ଧାଜ କରାର ପର ବାଲୀ ଲଭିତ  
ହୁଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେ ନିଜେର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦୀ ହୁଏ ଏହି ଧରନେର ଅନ୍ତର୍ଧାଜରେ କୁଣ୍ଡିତ ତିନି ନିଜ  
ଅନ୍ତର୍ଧାର କରେ ଦେନ । ଯାହାକୁ ଧରନେର ଅନ୍ତର୍ଧାଜରେ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଏହିକାରି

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُلُّ بُوٰيٰتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَلِّونَ

আর যারা একে গ্রহণ করতে অবীরুতি জানাবে এবং আমার আয়াতকে<sup>৪৪</sup> মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারা হবে আগন্তের মধ্যে প্রবেশকারী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।<sup>৪৫</sup>

দরবার থেকে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে, নিজের নাফরমানির জন্য লজ্জিত হয় এবং বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করে আনুগত্যের পথে এগিয়ে চলতে প্রস্তুত হয়, তাহলে আল্লাহ তার গোনাহ ও ত্রুটি মাফ করে দেবেন।

৫৩. এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি তাৎপর্যপূর্ণ। আগের বাক্যে বলা হয়েছে আদম তাওবা করলেন এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিলেন। এর অর্থ এই দাড়ালো, আদম তাঁর নাফরমানির জন্য আয়াবের ইকদার হলেন না। গোনাহগারীর যে দাগ তাঁর গায়ে লেগেছিল তা ধূয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। না এ দাগের কোন চিহ্ন তাঁর বা তাঁর বংশধরদের গায়ে রইলো, ফলে আর না এ প্রয়োজন হলো যে, আল্লাহর—একমাত্র প্রত্কে (মায়ায়াল্লাহ) (নাউয়ুবিল্লাহ) বনী আদমের গোনাহের কাফফারাহ আদায় করার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়ে শূলে চড়াতে হলো। বিপরীত পক্ষে মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের কেবল তাওবাই কবুল করে ক্ষতি হননি এবং এরপর আবার তাঁকে নবুওয়াতও দান করলেন। এতাবে তিনি নিজের বংশধরদেরকে সত্য-সহজ পথ দেখিয়ে গেলেন।

এখানে আবার জানাত থেকে বের করে দেয়ার হকুমের পুনরাবৃত্তি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, আদমকে পৃথিবীতে না নামিয়ে জানাতে রেখে দেয়া তাওবা করুলিয়াতের অপরিহার্য দাবী ছিল না। পৃথিবী তাঁর জন্য দারুল আয়াব বা শাস্তির আবাস ছিল না। শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁকে এখানে পাঠানো হয়নি। বরং তাঁকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। জানাত তাঁর আসল কর্মসূল ছিল না। সেখান থেকে বের করে দেয়ার হকুম তাঁকে শাস্তি দেয়ার পর্যায়ভূক্ত ছিল না। তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়াটাই ছিল মূল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। তবে এর আগে ৪৮মং টীকায় যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই পরীক্ষার জন্যই তাঁকে জানাতে রাখা হয়েছিল।

৫৪. আরবীতে আয়াতের আসল মানে হচ্ছে নিশানী বা আলামত। এই নিশানী কোন জিনিসের পক্ষ থেকে পথনির্দেশ দেয়। কুরআনে এই শব্দটি চারটি তিমি তিমি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর অর্থ হয়েছে নিছক আলামত বা নিশানী। কোথাও প্রাচীন ধর্মসাবশেষ ও প্রাত্তাত্ত্বিক নির্দেশনসমূহকে বলা হয়েছে আল্লাহর আয়াত। কারণ এই বিশ-জাহানের অসীম ক্ষয়তাধর আল্লাহর সৃষ্টি প্রতিটি বস্তুই তাঁর বাহ্যিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিহিত সত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করছে। কেখাও নবী-রস্লগণ যেসব ‘মু’জিয়া’ (অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম) দেখিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয়েছে আল্লাহর আয়াত। কারণ এ নবী-রস্লগণ যে

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّتِي أَتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا  
بِعَهْدِي أَوْ فِي عِمَلِكُمْ وَإِيَّاَيْ فَارْهِبُونِ

৫ রুক্ত

হে বনী ইসরাইল! ৫৬ আমার সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম, আমার সাথে তোমাদের যে অংগীকার ছিল, তা পূর্ণ করো, তা হলে তোমাদের সাথে আমার যে অংগীকার ছিল, তা আমি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।

এ বিশ-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভুর প্রতিনিধি এই যু'জিয়াগুলো ছিল আসলে তারই প্রমাণ ও আলামত। কোথাও কুরআনের বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয়েছে। কানুণ এ বাক্যগুলো কেবল সত্যের দিকে পরিচালিত করেই ক্ষান্ত নয় বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন কিতাবই এসেছে, তার কেবল বিষয়বস্তুই নয়, শব্দ, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য গঠনরীতির মধ্যেও এই গ্রন্থের মহান মহিমাবিত রচয়িতার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের নির্দর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। কোথায় 'আয়াত' শব্দটির কোনু অর্থ গ্রহণ করতে হবে তা বাকের পূর্বাপর আলোচনা থেকে সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

৫৫. এটা হচ্ছে সৃষ্টির প্রথম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহর স্বার্যী ফরমান। তৃতীয় রুক্ত'তে এটিকেই আল্লাহর 'অংগীকার' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিজেই নিজের পথ তৈরি করে নেয়া মানুষের কাজ নয়। বরং একদিকে বাদ্য এবং অন্যদিকে খুলীফার দিবিধ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে তার রব-নির্ধারিত পথের অনুসরণ করার জন্যই সে নিযুক্ত হয়েছে। দু'টো উপায়ে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এক, কোন মানুষের কাছে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসতে পারে। দুই, অথবা যে মানুষটির কাছে অহী এসেছে, তার অনুসরণ করা যেতে পারে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের তৃতীয় কোন পথ নেই। এ দু'টি পথ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত পথই মিথ্যা ও ভুল। শুধু ভুলই নয়, প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের পথও। আর এর শাস্তি জাহানাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুরআন মজীদের সাতটি জায়গায় আদমের জন্ম ও মানব জাতির সূচনা কালের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এ সাতটি জায়গার মধ্যে এটিই হচ্ছে প্রথম এবং আর ছয়টি জায়গা হচ্ছে : সূরা আল 'আ'রাফ ২য় রুক্ত', আল হিজর ৩য় রুক্ত', বনী ইসরাইল ৭ম রুক্ত', আল কাহাফ ৭ম রুক্ত', তা-হা ৭ম রুক্ত' এবং সাদ ৫মে রুক্ত'। বাইবেলের জন্য অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাইবেল ও কুরআন উভয়ের বর্ণনার তুলনা করার পর একজন বিবেকবান ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেই উভয় কিতাবের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারবেন।

আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টিকালীন আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যকার কথাবার্তার বর্ণনা তালমূদেও উচ্ছৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন বর্ণিত কাহিনীতে যে গভীর অন্তরনিহিত প্রাণসন্তান সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে তা অনুপস্থিত। বরং সেখানে কিছু রসাত্মক

১০" অলাপও পাওয়া যায়। যেমন, ফেরেশতারা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হচ্ছে?' জবাবে আল্লাহ বললেন, 'এ জন্য যে, তাদের মধ্যে সংগোক জন্ম নেবে।' অসংখ্লোকদের কথা আল্লাহ বললেন না। অন্যথায় ফেরেশতারা মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনার পক্ষে অনুমোদন দিতেন না। [Talmudic Miscellany, Paul Issac Herson, London 1880, P. 294-95]

৫৬. 'ইসরাইল' শব্দের অর্থ হচ্ছে আবদ্ধান বা আল্লাহর বাস্তু। এটি হ্যরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপাধি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি এ উপাধিটি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হ্যরত ইসহাক আলাইহিস সালামের পুত্র ও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রপুত্র। তাঁরই বংশধরকে বলা হয় বনী ইসরাইল। আগর চারটি রূক্তি তে যে ভাষণ পেশ করা হয়েছে তা একটি ভূমিকামূলক ভাষণ। এই ভাষণে সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতিকে সংরোধন করা হয়েছে। আর এখন এই পঞ্চম রূক্তি থেকে তৌদ্র রূক্তি' পর্যন্ত যে ভাষণ চলছে, এটি একটি ধারাবাহিক ভাষণ। এই ভাষণে মূলত বনী ইসরাইলকে সংরোধন করা হয়েছে। তবে মাঝে মধ্যে কোথাও কোথাও খৃষ্টান ও আরবের মুশার্রিকদের দিকে লক্ষ করেও কথা বলা হয়েছে। আবার সুবিধেমতো কোথাও হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা ইসলামের ওপর ইমান এনেছিল তাদেরকেও সংরোধন করা হয়েছে। এ ভাষণটি পড়ার সময় নিম্নোক্ত কথাগুলো বিশেষভাবে সামনে রাখতে হবে :

এক ১ : পূর্ববর্তী নবীদের উপাত্তের মধ্যে এখনো কিছু সংখ্যক সত্যনিষ্ঠ এবং সৎবৃত্তি ও সদিচ্ছাসম্পন্ন লোক রয়ে গেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সত্যের আহবাবক এবং যে আন্দোলনের মহানায়ক করে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে তাঁর প্রতি ইমান আনার এবং তাঁর আন্দোলনে শরীক হবার জন্য আহবান জানানোই এ ভাষণের উদ্দেশ্য। তাই তাদের বলা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তোমাদের নবীগণ এবং তোমাদের কাছে আগত সহীফাগুলো যে দাওয়াত ও আন্দোলন নিয়ে বার বার এসেছিল এই কুরআন ও এই নবী সেই একই দাওয়াত ও আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। প্রথমে এটি তোমাদেরকেই দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা নিজেরা এ পথে চলবে এবং অন্যদেরকেও এদিকে আহবান জানাবে এবং এ পথে চালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু অন্যদেরকে পথ দেখানো তো দূরের কথা তোমরা নিজেরাই সে পথে চলছো না। তোমরা বিকৃতির পথেই এগিয়ে চলছো। তোমাদের ইতিহাস এবং তোমাদের জাতির বর্তমান নৈতিক ও দীনি অবস্থাই তোমাদের বিকৃতির সাক্ষ দিয়ে চলছে। এখন আল্লাহ সেই একই জিনিস দিয়ে তাঁর এক বাস্তুকে পাঠিয়েছেন এটি কোন নতুন ও অজানা জিনিস নয়। তোমাদের নিজেদের জিনিস। কাজেই জেনে-বুঝে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং তাকে মেনে নাও। যে কাজ তোমাদের করার ছিল কিন্তু তোমরা করোনি। সেই কাজ আজ অন্যেরা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। তোমরা তাদের সাথে সহযোগিতা করো।

দুই ১ : সাধারণ ইহুদিদের কাছে ছড়ান্ত কথা বলে দেয়া এবং তাদের দীনি ও নৈতিক অবস্থাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। তোমাদের নবীগণ যে দীনের পতাকাবাহী ছিলেন হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দীনেরই দাওয়াত দিচ্ছেন—একথাটিই তাদের সামনে প্রমাণ করা হয়েছে। দীনের মূলনীতির মধ্যে এমন

একটি বিষয়ও নেই যেখানে কুরআনের শিক্ষা তাওরাতের শিক্ষা থেকে আলাদা—একথাই তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের সামনে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তোমাদের যে বিধান দান করা হয়েছিল তার আনুগত্য করার এবং নেতৃত্বের যে দায়িত্ব তোমাদেরকে ওপর অর্পণ করা হয়েছিল তার হক আদায় করার ব্যাপারে তোমরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছো। এমন সব ঘটনাবলী থেকে এর সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যার প্রতিবাদ করা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। আবার সত্যকে জানার পরও যেভাবে তারা তার বিরোধিতায় চক্রান্ত, বিভাস্তি সৃষ্টি, হঠধর্মিতা, কৃটর্ক ও প্রতারণার আশ্রয় নিছিল এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনকে সফলকাম হতে না দেয়ার জন্য যেমন পদ্ধতি অবলম্বন করাছিল তা সবই ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। এ থেকে একথা পরিকার হয়ে যায় যে, তাদের বাহ্যিক ধার্মিকতা নিছক একটি ভঙ্গামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার পরিবর্তে হঠধর্মিতা, অজ্ঞতা ও মূর্খতাপ্রসূত বিদ্রে ও স্বার্থাঙ্গতা। আসলে সংক্রমশীলতার কোন কাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তারা চায় না। এভাবে চূড়ান্ত কথা বলে দেয়ায় যে সুফল হয়েছে তা হচ্ছে এই যে একদিকে ঐ জাতির মধ্যে যেসব সৎস্লোক ছিল তাদের চোখ খুলে গেছে এবং অন্যদিকে মদীনার জনগণের বিশেষ করে আরবদেশের মুশরিকদের ওপর তাদের যে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রভাব ছিল, তা খতম হয়ে গেছে। তৃতীয়ত নিজেদের আবরণহীন চেহারা দেখে তারা নিজেরাই হিম্বতহারা হয়ে পড়েছে। ফলে নিজের সত্যপক্ষী হবার ব্যাপারে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঝুঁপে নিশ্চিত সে যেমন সংসাহস ও দৃঢ়তর সাথে মোকাবিলায় এগিয়ে আসে তেমনটি করা তাদের পক্ষে কোনদিন সম্ভব হয়নি।

তিনি : আগের চারটি রূপকৃতে সমগ্র মানবজাতিকে সাধারণভাবে দাওয়াত দিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছিল সে একই প্রসংগে যে জাতি আল্লাহ প্রেরিত বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তেমনি একটি বিশেষ জাতির বিশেষ দৃষ্টিতে দিয়ে তার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে বক্তব্য সুম্পষ্ট করার জন্য বনী ইসরাইলকে বাছাই করার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য জাতিদের মধ্যে বর্তমান বিশে একমাত্র বনী ইসরাইলই ক্রমাগত চার হাজার বছর থেকে সমগ্র মানবজাতির সামনে দৃষ্টিতে হয়ে বেঁচে আছে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার পথে কোন জাতির জীবনে যত চূড়াই উত্তরাই আসতে পারে তার সবগুলোরই সক্রান্ত পাই আমরা এ জাতিটির মর্মান্তিক ইতিকথায়।

চার : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের শিক্ষা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। পূর্ববর্তী নবীদের উপ্রাতরা অধিগতনের যে গভীর গতে পড়ে গিয়েছিল তা থেকে উপ্রাতে মুহাম্মাদীকে রক্ষা করাই এর লক্ষ। ইহুদিদের নৈতিক দুর্বলতা, ধর্মীয় বিভাস্তি এবং বিশ্বাস ও কর্মের গলদণ্ডলোর মধ্য থেকে প্রতিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার মোকাবিলায় আল্লাহর সত্য দীনের দাবীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা পরিকারভাবে নিজেদের পথ দেখে নিতে পারবে এবং ভুল পথ থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে। এ প্রসংগে ইহুদি ও খৃষ্টানদের সমালোচনা করে কুরআন যা কিছু বগেছে সেগুলো পড়ার সময় মুসলমানদের অবশ্যি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিখ্যাত হাদীস মনে রাখা উচিত। হাদীসটিতে তিনি বলেছেন : তোমরাও অবশেষে পূর্ববর্তী উপ্রাতদের কর্মনীতির অনুসরণ করবেই। এমন কি তারা যদি কোন গো-সাপের গতে

وَأَمْنِوا بِمَا أَنْزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ  
بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيْتِيْ تَهْنَأْ قَلِيلًا وَإِيَّاهُ فَاتَّقُونَ<sup>৪৩</sup> وَلَا تَلْبِسُوا  
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ لَعْلَمُونَ<sup>৪৪</sup>

আর আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তার উপর ইমান আন। তোমাদের কাছে আগে থেকেই যে কিতাব ছিল এটি তার সত্যতা সমর্থনকারী। কাজেই সবার আগে তোমরাই এর অঙ্গীকারকারী হয়ো না। সামান্য দামে আমার আয়াত বিক্রি করো না।<sup>৪৭</sup> আমার গ্যব থেকে আত্মরক্ষা করো। যিথ্যার রঙে রাঙিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না।<sup>৪৮</sup>

চূকে থাকে, তাহলে তোমরাও তার মধ্যে চুকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল। আপনি কি ইহুদি ও খৃষ্টানদের কথা বলছেন? জবাব দিলেন, তাছাড়া আর কি? নবী সান্নালাহ আলাইহি ওয়া সান্নামের এ উক্তিটি কেবলমাত্র একটি ভীতি প্রদর্শনই ছিল না বরং আল্লাহ প্রদত্ত গভীর অস্তরদৃষ্টির মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন নবীর উস্মাতের মধ্যে বিকৃতি এসেছিল কোনু কোনু পথে এবং কোনু আকৃতিতে তার প্রকাশ ঘটেছিল।

৫৭. ‘সামান্য দাম’ বলে দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভের কথা বুঝানো হয়েছে। এর বিনিময়ে মানুষ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করছিল। সত্যকে বিক্রি করে তার বিনিময়ে সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ হাসিল করলেও তা আসলে সামান্য দামই গণ্য হবে। কারণ সত্য নিসদ্দেহে তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

৫৮. এ আয়াতটির অর্থ বুঝার জন্য সমকালীন আরবের শিক্ষাগত অবস্থাটা সামনে থাকা দরকার। আরববাসীরা সাধারণতাবে ছিল অশিক্ষিত। তাদের তুলনায় ইহুদিদের মধ্যে এমনিতেই শিক্ষার চৰ্চা ছিল অনেক বেশী। তাছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইহুদিদের মধ্যে এমন অনেক বড় বড় আলোম ছিলেন যাদের ব্যাপ্তি আরবের গভীর ছাড়িয়ে বিশ্ব পর্যায়েও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই আরবদের উপর ইহুদিদের ‘জ্ঞানগত’ প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশী। এর উপর ছিল আবার তাদের উলামা ও মাশায়েরের ধর্মীয় দরবারের বাহ্যিক শান-শওকত। এসব জীৱালো দরবারে বসে তারা বাড়-ফুঁক, দোয়া-তাবিজ ইত্যাদির কারবার চালিয়েও জনগণের উপর নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপন্থি গভীরতর ও ব্যাপকতর করেছিলেন। বিশেষ করে মদীনাবাসীদের উপর তাদের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। কারণ তাদের আশেপাশে ছিল বড় বড় ইহুদি গোত্রের আবাস। ইহুদিদের সাথে তাদের রাতদিন ও রাতৰসা ও মেলামেশা চলতো। একটি অশিক্ষিত জনবসতি যেমন তার চাইতে বেশী শিক্ষিত, বেশী সংস্কৃতিবান ও বেশী সুস্পষ্ট ধর্মীয় গুণাবলীর অধিকারী প্রতিবেশীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, এই মেলামেশায় মদীনাবাসীরাও ঠিক তেমনি ইহুদিদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। এ অবস্থায় নবী সান্নালাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম যখন নিজেকে নবী হিসেবে পেশ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةَ وَأَرْكِعُوا مَعَ الرِّعَيْمَ  
 أَتَأْمِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَبَ  
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑤٩ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا  
 عَلَى الْخَشِعِينِ ⑩ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رِبْرَامًا وَأَنَّهُمْ  
 إِلَيْهِ رَجْعُهُنَّ ⑪

নামায কায়েম করো, যাকাত দাও<sup>৫৯</sup> এবং যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও। তোমরা অন্যদের সৎকর্মশীলতার পথ অবলম্বন করতে বলো কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান বৃক্ষি একটুও কাজে লাগাও না? সবর ও নামায সহকারে সাহায্য নাও।<sup>৬০</sup> নিসন্দেহে নামায বড়ই কঠিন কাজ, কিন্তু সেসব অনুগত বাস্তাদের জন্য কঠিন নয় যারা মনে করে, সবশেষে তাদের মিলতে হবে তাদের রবের সাথে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।<sup>৬১</sup>

করলেন এবং লোকদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই অশিক্ষিত আরবরা আহলে কিতাব ইহুদিদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো, “আপনারাও তো একজন নবীর অনুসারী এবং একটি আস্মানী কিতাব মেনে চলেন, আপনারাই বলুন, আমাদের মধ্যে এই যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করছেন তাঁর এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?” মক্কার লোকেরাও ইতিপূর্বে ইহুদিদের কাছে এ প্রশ্নটি বার বার করেছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর এখানেও বহু লোক ইহুদি আলেমদের কাছে গিয়ে একথা জিজ্ঞেস করতো। কিন্তু ইহুদি আলেমরা কখনো এর জবাবে সত্য কথা বলেনি। ডাহা মিথ্যা কথা বলা তাদের জন্য কঠিন ছিল। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাওয়াহ পেশ করছেন তা মিথ্যা। অথবা আরিয়া, আস্মানী গ্রহসমূহ, ফেরেশতা ও আখ্যেরাত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়। অথবা তিনি যে নৈতিক মূলনীতি শিক্ষা দিছেন তাঁর মধ্যে কোন গলদ রয়ে গেছে। তবে যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা সঠিক ও নির্ভুল—এ ধরনের স্পষ্ট ভাষায় সত্যের স্বীকৃতি দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল না তারা প্রকাশ্যে সত্যের প্রতিবাদ করতে পারছিল না আবার সোজাসুজি তাকে সত্য বলে মেনে নিতেও প্রস্তুত ছিল না। এ দু’টি পথের মাঝখানে তারা তৃতীয় একটি পথ অবলম্বন করলো। প্রত্যেক প্রশ্নকারীর মনে তারা নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর জামায়াত ও তাঁর মিশনের বিরুদ্ধে কোন না কোন অসংসা-প্ররোচনা দিয়ে দিত। তাঁর বিরুদ্ধে কোন না কোন অভিযোগ আনতো, এমন

يَبْنِي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي  
فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ<sup>১</sup> وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزُّونَ نَفْسَكُمْ  
شَيْئًا وَلَا يَقْبِلُ مِنْهَا شَفَاعةٌ وَلَا يُؤْخَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُرِينَصْرُونَ<sup>২</sup>

৬ রুক্ত

হে বনী ইসরাইল! আমার সেই নিয়ামতের কথা অবরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং একথাটিও যে, আমি দুনিয়ার সমস্ত জাতিদের ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।<sup>৩২</sup> আর তয় করো সেই দিনকে যেদিন কেউ কারো সামান্যতমও কাজে লাগবে না, কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ গৃহীত হবে না, বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে পারবে না।<sup>৩৩</sup>

কোন ইংগিতপূর্ণ কথা বলতো যার ফলে লোকেরা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়ে যেতো। এভাবে তারা মানুষের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বপন করে তাদেরকে তার বেড়াজালে আটকে রাখতে এবং তাদের মাধ্যমে নবী সাল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকেও আটকাতে চাইতো। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতির কারণে তাদেরকে বলা হচ্ছে : সত্যের গায়ে মিথ্যার আবরণ ঢাকিয়ে দিয়ো না। নিজেদের মিথ্যা প্রচারণা এবং শয়তানী সন্দেহ-সংশয় আপন্তির সাহায্যে সত্যকে দাবিয়ে ও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করো না। সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে দুনিয়াবাসীকে প্রতারিত করো না।

৫৯. নামায ও যাকাত প্রতি যুগে দীন ইসলামের সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। অন্যান্য সব নবীদের মতো বনী ইসরাইলদের নবীরাও এর প্রতি কঠোর তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইহিদিও এ ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাদের সমাজে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রায় ছিন্নত্বাত হয়ে গিয়েছে। বেশীর ভাগ লোক ব্যক্তিগত পর্যায়েও নামায ছেড়ে দিয়েছিল। আর যাকাত দেয়ার পরিবর্তে তারা সুদ খেতো।

৬০. অর্থাৎ যদি সৎকর্মশীলতার পথে চলা তোমরা কঠিন মনে করে থাকো তাহলে সবর ও নামায এই কঠিন্য দূর করতে পারে। এদের সহায়ে শক্তি সঞ্চয় করলে এ কঠিন পথ পাড়ি দেয়া তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

সবর শব্দটির শাদিক অর্থ হচ্ছে, বাধা দেয়া, বিরত রাখা ও বেঁধে রাখা। এ ক্ষেত্রে মজবুত ইচ্ছা, অবিচল সংকল্প ও প্রবৃত্তির আশা-আকাংখাকে এমনভাবে শৃংখলাবদ্ধ করা বুঝায়, যার ফলে এক ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না ও বাইরের সমস্যাবন্ধীর মোকাবিলায় নিজের হস্তয় ও বিবেকের পছন্দনীয় পথে অনবরত এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে আল্লাহর এ

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ أَلْفِرْعَوْنَ يَسْوُمُونَكُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ  
يُلْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ  
مِّنْ رِبِّكُمْ عَظِيمٌ<sup>(১)</sup> وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا  
أَلْفِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ<sup>(২)</sup>

শরণ করো সেই সময়ের কথা<sup>৬৪</sup> যখন আমরা ফেরাউনী দলের<sup>৬৫</sup> দাসত্ত্ব থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম। তারা তোমাদের কঠিন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্র স্তনদের যবেহ করতো এবং তোমাদের কন্যা স্তনদের জীবিত রেখে দিতো। মূলত এ অবস্থায় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল।<sup>৬৬</sup>

শরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা সাগর টি঱ে তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছিলাম, তারপর তার মধ্য দিয়ে তোমাদের নির্বিশ্বে পার করে দিয়েছিলাম, আবার সেখানে তোমাদের চেয়ের সামনেই ফেরাউনী দলকে সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই নৈতিক গুণটিকে নিজের মধ্যে লালন করা এবং বাইর থেকে একে শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিত নামায পড়া।

৬১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত নয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তার জন্য নিয়মিত নামায পড়া একটি আপদের শাখিল। এ ধরনের আপদে সে কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহর অনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ করেছে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার মহান প্রভূর সামনে হায়ির হবার কথা চিন্তা করে, তার জন্য নামায পড়া নয়, নামায ত্যাগ করাই কঠিন।

৬২. এখানে সেই যুগের প্রতি ইঁগিত করা হয়েছে যখন দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে একমাত্র বনী ইসরাইলের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত সত্যজ্ঞান ছিল এবং তাদেরকে বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অন্যান্য জাতিদেরকে আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের পথে আহবান করাই ছিল তার দায়িত্ব।

৬৩. বনী ইসরাইলদের আখেরাত সম্পর্কিত আকীদার মধ্যে গলদের অনুপবেশ ছিল তাদের বিকৃতির অন্যতম বড় কারণ। এ ব্যাপারে তারা এক ধরনের উন্নট চিন্তা পোষণ করতো। তারা মনে করতো, তারা মহান মর্যাদা সম্পর্ক নবীদের স্তন। বড় বড় আউলিয়া, সৎকর্মশীল ব্যক্তি, আবেদ ও যাহেদের সাথে তারা সম্পর্কিত। এ সব মহান মনীয়ীদের বদৌলতে তাদের পাপ মোচন হয়ে যাবে। তাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে এবং তাদের

وَإِذْ وَعَنَّا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذَ تِرْعِيجَلَ مِنْ بَعْدِهِ  
 وَأَنْتَرَ ظَلِيمُونَ<sup>১১</sup> مَسْتَعْفُونَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  
 وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ<sup>১২</sup>  
 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمْ  
 الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خِيرٌ لَكُمْ  
 عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ<sup>১৩</sup>

শ্বরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা মূসাকে চলিশ দিন-রাত্রির জন্য ডেকে নিয়েছিলাম,<sup>৬৭</sup> তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে নিজেদের উপাস্যে<sup>৬৮</sup> পরিণত করেছিলে। সে সময় তোমরা অত্যন্ত বাঢ়াবাঢ়ি করেছিলে। কিন্তু এরপরও আমরা তোমাদের মাফ করে দিয়েছিলাম এ জন্য যে, হয়তো এবার তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

শ্বরণ করো (ঠিক যখন তোমরা এই যুনুম করছিলে সে সময়) আমরা মূসাকে কিতাব ও ঝুরকান<sup>৬৯</sup> দিয়েছিলাম, যাতে তার মাধ্যমে তোমরা সোজা পথ পেতে পারো।

শ্বরণ করো যখন মূসা (এই নিয়ামত নিয়ে ফিরে এসে) নিজের জাতিকে বললো, “হে লোকেরা! তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিজেদের ওপর বড়ই যুনুম করেছো, কাজেই তোমরা নিজেদের মষ্টার কাছে তাওবা করো এবং নিজেদেরকে হত্যা করো,<sup>৭০</sup> এরি মধ্যে তোমাদের মষ্টার কাছে তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।” সে সময় তোমাদের মষ্টা তোমাদের তাওবা কুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই শ্রমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

আস্তিন জড়িয়ে ধরে থাকার পরও কোন ব্যক্তি কেমন করে শাস্তি লাভ করতে পারে। এসব মিথ্যা নির্ভরতা ও সাত্ত্বনা তাদেরকে দীন থেকে গাফেল করে গোনাহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তাই নিয়ামত ও আচ্চাহ অসীম অনুগ্রহের কথা শ্বরণ করাবার সাথে সাথেই তাদের এই ভুল ধারণাগুলো দূর করা হয়েছে।

৬৪. এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী কয়েক রুক্ত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যেসব ঘটনার প্রতি ইঁধিত করা হয়েছে সেগুলো সবই বনী ইসরাইলদের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ

وَإِذْ قُلْتُرِ يَمْوِي لَنِ نَرِمَنْ لَكَ حَتَّى نَرِي اللَّهُ جَهَرَةً فَأَخْلَقْتُكُمْ  
الصِّعَقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ @ تَمْ بَعْثَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ

স্মরণ করো, যখন তোমরা মৃসাকে বলেছিলে, “আমরা কখনো তোমার কথায় বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা স্বচক্ষে আল্লাহকে তোমার সাথে প্রকাশ্যে (কথা বলতে) দেখবো।” সে সময় তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ওপর একটি ড্যাবহ বজ্পাত হলো, তোমরা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে গেলে। কিন্তু আবার আমরা তোমাদের বাঁচিয়ে জীবিত করলাম, হয়তো এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।<sup>৭১</sup>

ঘটনা। ইসরাইল জাতির যুব-বৃন্দ-শিশু নির্বেশে সবাই সেগুলো জানতো। তাই ঘটনাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা না করে এক একটি ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইংগিত করা হয়েছে মাত্র। এই ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আসলে যে বিষয়টি সূস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চান সোটি হচ্ছে এই যে, একদিকে আল্লাহ তোমাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করেছিলেন আর অন্যদিকে তার জবাবে এসব হচ্ছে তোমাদের কীর্তিকলাপ।

৬৫. ‘আলে ফেরাউন’ শব্দের অনুবাদ করেছি আমি ‘ফেরাউনী দল।’ এতে ফেরাউনের বংশ ও মিসরের শাসকশ্রেণী উভয়ই অন্তরভুক্ত হয়েছে।

৬৬. যে চূল্পীর মধ্যে তোমাদের নিষ্কেপ করা হয়েছিল তা থেকে তোমরা খাঁটি সোনা হয়ে বের হও, না ডেজাল হয়ে—এরি ছিল পরীক্ষা। এত বড় বিপদের মুখ থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তি লাভ করার পরও তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বাদ্যায় পরিগত হও কি না, এ মর্মেও ছিল পরীক্ষা।

৬৭. মিসর থেকে মুক্তি লাভ করার পর বনী ইসরাইল যখন সাইনা (সিনাই) উপগাঁথে পৌছে গেলো তখন মহান আল্লাহ হয়রত মূসা আলাইহিস সাল্লামকে চল্লিশ দিন-রাতের জন্য তৃতীয় পাহাড়ে ডেকে নিলেন। ফেরাউনের দাসত্ব মুক্ত হয়ে যে জাতিটি এখন মুক্ত পরিবেশে স্বাধীন জীবন যাপন করছে তার জন্য শরীয়াতের আইন এবং জীবন যাপনের বিধান দান করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। (বাইবেল, নির্গমন পৃষ্ঠক, ২৪-৩১ পরিচ্ছেদ দেখুন)

৬৮. বনী ইসরাইলদের প্রতিবেশী জাতিদের মধ্যে গাড়ী ও ঝাঁড় পূজার রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। মিসর ও কেনানে এর প্রচলন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের পর বনী ইসরাইল যখন অধিপতনের শিকার হলো এবং ধীরে ধীরে কিবৃতীদের দাসত্ব শূখলে আবদ্ধ হয়ে পড়লো তখন অন্যান্য আরো বহু রোগের মধ্যে এ রোগটিও তারা নিজেদের শাসকদের থেকে গ্রহণ করেছিলা। (বাচুর পূজার এ ঘটনাটি বাইবেলের নির্গমন পৃষ্ঠকের ৩২ অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে)

وَظَلَّلَنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَاءَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ  
طَبِيعَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكُنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ ④  
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُّوا مِنْهَا حِلْثٍ شِئْتُمْ رَغْلًا  
وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجْدًا وَقُولُوا حَاطَةً نَفَرِ لَكُمْ خَطِيكُرُ وَسِنْزِيلُ  
الْمُحْسِنِينَ ⑤ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ ⑥

আমরা তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম,<sup>১২</sup> তোমাদের জন্য সরবরাহ করলাম মানু ও সালওয়ার খাদ<sup>১৩</sup> এবং তোমাদের বললাম, যে পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী আমরা তোমাদের দিয়েছি তা থেকে থাও। কিন্তু তোমাদের পূর্বপূর্বরা যা কিছু করেছে তা আমাদের ওপর যুলুম ছিল না বরং তারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

আরো অরণ করো যখন আমরা বলেছিলাম, “তোমাদের সামনের এই জনপদে<sup>১৪</sup> প্রবেশ করো এবং সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেমন ইচ্ছা থাও মজা করে। কিন্তু জনপদের দুয়ারে সিজদান্ত হয়ে প্রবেশ করবে ‘হিতাতুন’ ‘হিতাতুন’ বলতে বলতে,<sup>১৫</sup> আমরা তোমাদের ত্রিটিগুলো মাফ করে দেবো এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ করবো।” কিন্তু যে কথা বলা হয়েছিল যালেমরা তাকে বদলে অন্য কিছু করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত যুলুমকারীদের ওপর আমরা আকাশ থেকে আয়াব নায়িল করলাম। এ ছিল তারা যে নাফরমানি করছিল তার শাস্তি।

৬৯. ফুরকান হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে ইক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য সুল্পষ্ট করে তোলা হয়। আমাদের ভাষায় এই অর্থটিকে সুল্পষ্ট করার জন্য সবচাইতে কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে ‘মানদণ্ড।’ এখানে ফুরকানের মানে হচ্ছে দীনের এমন জ্ঞান, বোধ ও উপলব্ধি যার মাধ্যমে মানুষ ইক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

৭০. অর্থাৎ তোমাদের যেসব লোক গো-শাবককে উপাস্য বানিয়ে তার পূজা করেছে তাদেরকে হত্যা করো।

৭১. এখানে যে ঘটনাটির দিকে ইঁথগিত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে : চালিশ দিন-রাতের নিদিষ্ট সময়ের জন্য হয়রত মূসা আলাইহিস সাল্লাম যখন ত্রু পাহাড়ে চলে গেলেন, আল্লাহ তাকে ইকুম দিলেন বনী ইসরাইলের সন্তুরজন প্রতিনিধিকেও তাঁর সাথে নিয়ে আসার। তারপর মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সাল্লামকে কিতাব ও ফুরকান দান করলেন। তিনি তা ঐ প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করলেন। কুরআন বলছে, ঠিক তখনই তাদের ধ্য থেকে কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলতে থাকলো, মহান আল্লাহ আপনার সাথে কথা বললেছেন একথাটি আমরা শুধুমাত্র আপনার কথায় কেমন করে মেনে নিতে পারি? তাদের একথায় আল্লাহর ক্ষেত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো এবং তিনি তাদেরকে শান্তি দিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বাইবেল বলছে :

“তারা ইসরাইলের খোদাকে দেখেছে। তাঁর চরণ তলের স্থানটি ছিল নীলকান্তমণি বর্চিত পাথরের ঢত্টরের ন্যায়। আকাশের মতো ছিল তার বৃক্ষতা ও পুষ্পকল্প। তিনি বনী ইসরাইলের সম্মানিত ব্যক্তিদের ওপর নিজের হাত প্রসারিত করেননি। কাজেই তারা খোদাকে দেখেছে, যেযেছে এবং পান করেছে।” (নির্গমন পৃষ্ঠক, ২৪ অনুচ্ছেদ, ১০-১১ শ্লোক)।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই বাইবেলের আরো সামনের দিকে গিয়ে বলা হয়েছে : “যখন হয়রত মূসা (সা) খোদার কাছে আরজ করলেন, আমাকে তোমার প্রতাপ ও জ্যোতি দেখাও। জবাবে তিনি বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পারো না।” (নির্গমন পৃষ্ঠক, ৩৩ অনুচ্ছেদ, ১৮-২৩ শ্লোক)।

৭২. অর্থাৎ প্রথর রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য যেখানে সিনাই উপর্যুক্তে তোমাদের জন্য কোন আব্যস্থা ছিল না সেখানে আমরা মেঘমালার ছায়া দান করে তোমাদের বাঁচার উপায় করে দিয়েছি। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, লক্ষ লক্ষ বনী ইসরাইল যিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল। আর সিনাই উপত্যকায় গৃহ তো দূরের কথা সামান্য একটু মাথা গৌজার মতো তাঁবুও তাদের কাছে ছিল না। সে সময় যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সময়ের জন্য আক্রান্তকে মেঘাবৃত করে রাখা না হতো, তাহলে খর-রৌদ্র-তাপে বনী ইসরাইলী জাতি সেখানেই ক্ষণস হয়ে যেতো।

৭৩. মারা ও সালওয়া ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক প্রকার প্রাকৃতিক খাদ্য। বনী ইসরাইলীরা তাদের বাস্তুহারা জীবনের সুদীর্ঘ চলিশ বছর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এই খাদ্য লাভ করতে থেকেছে। মারা ছিল ধনিয়ার দানার মতো ক্ষুদ্রাকৃতির এক ধরনের খাদ্য। সেগুলোর বর্ণণ হতো কুয়াসার মতো। জমিতে পড়ার পর জমে যেতো। আর সালওয়া ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির কবুতরের মতো একপ্রকার পাখি। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এই খাদ্যের বিপুল প্রাচৰ্য ছিল। বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী একটি জাতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই খাদ্যের ওপর জীবন নির্বাহ করেছে। তাদের কাউকে কোনদিন অনাহারে থাকতে হয়নি। অথচ আজকের উন্নত বিশেষের কোন দেশে যদি হঠাৎ কয়েক লাখ শরণার্থী প্রবেশ করে তাহলে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা একটি প্রাণগতকর সমস্যায় পরিণত হয়। (মারা ও সালওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে বাইবেলের নির্গমন পৃষ্ঠক : ১৬ অনুচ্ছেদ, গণনা : ১১ অনুচ্ছেদ, ৭-৯ ও ৩১-৩৬ শ্লোক এবং ঈশ্ব : ৫ অনুচ্ছেদ, ১২ শ্লোক)

وَإِذَا سَتَّقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقْلَنَا أَضْرَبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ  
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَيْ عَشَرَةَ عِينًا دَقَّ عَلَيْكُلَّ أَنَّاسٍ مُشْرِبِهِمْ  
كَلَوًا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِلِيْنَ ﴿٧﴾

৭. রহস্য

যখন মুসা তার জাতির জন্য পানির দোয়া করলো, তখন আমরা বললাম, অমুক পাথরের ওপর তোমার লাঠিটি যারো। এর ফলে সেখান থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হলো।<sup>৭৬</sup> প্রত্যেক গোত্র তার পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (সে সময় এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে,) আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক খাও, পান করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

৭৪. এখনো পর্যন্ত যথার্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ জনপদটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে যে ঘটনা পরম্পরায় এর উল্লেখ হয়েছে তা এমন এক যুগের সাথে সম্পর্কিত যখন বনী ইসরাইল সাইনা উপদ্বীপেই অবস্থান করছিল। তাতেই মনে হয়, উল্লেখিত জনপদটির অবস্থান এ উপদ্বীপের কোথাও হবে। কিন্তু এ জনপদটি ‘সিন্তীম’-ও হতে পারে। সিন্তীম শহরটি ‘ইয়ারীহো’-এর ঠিক বিপরীত দিকে জর্দান নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে, বনী ইসরাইলৰ মূসার (আ) জীবনের শেষ অধ্যায়ে এ শহরটি জয় করেছিল। সেখানে তারা ব্যাপক ব্যতিচার করে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ড্যাবাহ মহামারীর শিকারে পরিষ্ণত করেন এবং এতে চব্বিশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। (গণনা, ২৫ অনুচ্ছেদ, ১-৮ শ্লোক)

৭৫. অর্থাৎ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, ষেছ্বাচারী যালেম বিজয়ীদের মতো অহংকার মদমন্ত্র হয়ে প্রবেশ করো না। বরং আল্লাহর প্রতি অনুগত ও তাঁর ভয়ে ভীত বাস্তাদের মতো বিনম্রভাবে প্রবেশ করো। যেমন হয়রত মুহাম্মাদ সাল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় বিনয়াবন্ত হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। ‘হিত্তাতুন’ শব্দটির দুই অর্থ হতে পারে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ করো। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, ব্যাপক গণহত্যা ও লুটরাজ করতে করতে প্রবেশ না করে বরং জনপদের অধিবাসীদের তুল-ক্রটি উপেক্ষা করে তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে করতে শহরে প্রবেশ করো।

৭৬. সে পাথরটি এখনো সিনাই উপদ্বীপে রয়েছে। পর্যটকরা এখনো গিয়ে সেটি দেখেন। পাথরের গায়ে এখনো ঝর্ণার উৎস মূখের গর্তগুলো দেখা যায়। ১২টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করার কারণ ছিল এই যে, বনী ইসরাইলদেরও ১২টি গোত্র ছিল। প্রত্যেক গোত্রের জন্য আল্লাহ একটি করে ঝর্ণা প্রবাহিত করেন। তাদের মধ্যে পানি নিয়ে কলহ সৃষ্টি না হয়, এ জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল।

وَإِذْ قَلْتُمْ يَمْوُسِي لَنِ نَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ  
يَخْرُجُ لَنَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِنَائِهَا وَفَوْمِهَا وَعَنْ سِهَا  
وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْلِلُونَ إِلَيْنِي هُوَ أَدْنِي ۖ إِلَيْنِي هُوَ خَيْرٌ  
إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْلَّهُ وَالْمَسْكَنَةُ  
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۖ بِإِيمَانِ اللَّهِ  
وَيُقْتَلُونَ النَّبِيُّنَ ۖ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۗ

শরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে, “হে মুসা! আমরা একই ধরনের খাবারের ওপর সবর করতে পারি না, তোমার রবের কাছে দোয়া করো যেন তিনি আমাদের জন্য শাক-সজি, গম, রসুন, পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করেন।” তখন মুসা বলেছিল, “তোমরা কি একটি উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস নিতে চাও? <sup>৭৭</sup> তাহলে তোমরা কোন নগরে গিয়ে বসবাস করো, তোমরা যা কিছু চাও সেখানে পেয়ে যাবে।” অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যার ফলে লাঞ্ছনা, অধপতন, দূরবস্থা ও অনটন তাদের ওপর চেপে বসলো এবং আল্লাহর গথব তাদেরকে ঘিরে ফেললো। এ ছিল তাদের আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করার <sup>৭৮</sup> এবং পয়গ়ারদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার ফল। <sup>৭৯</sup> এটি ছিল তাদের নাফরমানির এবং শরীয়াতের সীমালংঘনের ফল।

৭৭. এর অর্থ এ নয় যে, বিনা ধর্মে লক্ষ মাসা ও সালওয়া বাদ দিয়ে তোমরা এমন জিনিস চাচ্ছো যে জন্য শারীরিক মেহনত করে কৃষি করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যে মহান উদ্দেশ্যে তোমাদের মরণচারিতায় লিঙ্গ করা হয়েছে তার মোকাবিলায় খাদ্যের স্বাদ তোমাদের কাছে ক্ষেত্রী প্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে তোমরা ঐ মহান উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য ঐ খাদ্যের স্বাদ থেকে বক্ষিত থাকতে চাও না। (তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য দেখুন গণনা পৃষ্ঠক ১১ অনুচ্ছেদ, ৪-৯ শ্লোক)

৭৮: আয়াতের সাথে কুফরী করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। যেমন, এক : আল্লাহ প্রদত্ত শিফাবলীর মধ্য থেকে যে কথাটিকে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঞ্চন্ক বিরোধী পেয়েছে তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দুই : কোন বজ্রব্যকে আল্লাহর বজ্রব্য জানার পরও পূর্ণ দাঙ্গিকতা, নির্বজ্ঞতা ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সহকারে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আল্লাহর নির্দেশের কোন পরোয়া

করেনি। তিনি : আল্লাহর বাণীর অর্থ ও উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানার ও বুঝার পরও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে।

৭৯. বনী ইসরাইল নিজেদের এই অপরাধকে নিজেদের ইতিহাস গ্রন্থে বিশ্বারিতভাবে বর্ণনা করেছে। উদাহরণ খরুপ বাইবেলের কয়েকটি ঘটনা এখানে উন্নত করছি।

এক : হযরত সুলাইমানের পর ইসরাইলী সাম্রাজ্য দু'টি রাষ্ট্রে (জেরুল্যালেমের ইহুদিয়া রাষ্ট্র এবং সামারিয়ার ইসরাইল রাষ্ট্র) বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে ইহুদিয়া রাষ্ট্র নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দামেক্ষের আরামী রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে আল্লাহর হকুমে হানানী নবী ইহুদিয়া রাষ্ট্রের শাসক 'আসা'-কে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন। কিন্তু 'আসা' এই সতর্কবাণী গ্রহণ করার পরিবর্তে আল্লাহর নবীকে কারারুদ্ধ করে। (২ বংশাবলী, ১৭ অধ্যায়, ৭—১০ শ্লোক)

দুই : হযরত ইলিয়াস (ইলিয়াহ—ELIAH) আলাইহিস সালাম যখন বা'ল দেবতার পৃষ্ঠার জন্য ইহুদিদের তিরক্ষার করেন এবং নতুন করে আবার তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন তখন সামারিয়ার ইসরাইলী রাজা 'আবিজ্ঞাব' নিজের মুশারিক স্তুর প্ররোচনায় তাঁর প্রাণনাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় মেতে উঠেন। ফলে তাঁকে সিনাই উপদ্বীপের পর্বতাঙ্কলে আশয় নিতে হয়। এ সময় হযরত ইলিয়াস যে দোয়া করেন তার শদাবলী হিল নিম্নরূপ :

“বনী ইসরাইল তোমার সাথে কৃত অংগীকার ভঙ্গ করেছে.....তোমার নবীদের হত্যা করেছে তলোয়ারের সাহায্যে এবং একমাত্র অমিহি বেঁচে আছি। তাই তারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে। (১ রাজাবলী, ১৭ অধ্যায়, ১—১০ শ্লোক)

তিনি : সত্য ভাষণের অপরাধে হযরত 'মিকাইয়াহ' নামে আর একজন নবীকেও এই ইসরাইলী শাসক আবিজ্ঞাব কারারুদ্ধ করে। সে হকুম দেয়, এই ব্যক্তিকে বিপদের খাদ্য খাওয়াও এবং বিপদের পানি পান করাও। (১ রাজাবলী, ২২ অধ্যায়, ২৬—২৭ শ্লোক)।

চার : আবার যখন ইহুদিয়া রাষ্ট্রে প্রকাশ্যে মৃতি পূজা ও ব্যভিচার চলতে থাকে এবং হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচার হন তখন ইহুদি রাজা ইউআস-এর নির্দেশে তাকে মৃগ হাইকেলে সুলাইমানীতে 'মাকদিস' (পবিত্র হান) ও 'যবেহ ক্ষেত্র'-এর মাঝখানে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। (২ বংশাবলী, ২৪ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)।

পাঁচ : অতপর আশুরিয়াদের হাতে যখন সামারিয়াদের ইসরাইলী রাষ্ট্রের পতন হয় এবং জেরুল্যালেমের ইহুদি রাষ্ট্র মহাধৰ্মসের সম্মুখীন হয় তখন 'ইয়ারমিয়াহ' নবী নিজের জাতির পতনে আর্তনাদ করে উঠেন। তিনি পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে নিজের জাতিকে সরোধন করে বলতে থাকেন, “সতর্ক হও, নিজেদেরকে সংশোধন করো, অন্যথায় তোমাদের পরিণাম সামারিয়া জাতির চাইতেও ত্যাবহ হবে।” কিন্তু জাতির পক্ষ থেকে এই সাবধান বাণীর বিরুপ জওয়াব আসে। চারদিক থেকে তাঁর 'ওপর প্রবল বৃষ্টিধারার মতো অভিশাপ ও গালি-গালাজ বর্ষিত হতে থাকে। তাঁকে মারধর করা হয়। কারারুদ্ধ করা হয়। ক্ষুধা ও পিপাসায় শুকিয়ে মেরে ফেলার জন্য রশি দিয়ে বেঁধে তাকে কর্দমাক্ত কৃয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার এবং বিদেশী শক্রের সাথে আতাত করার অভিযোগ আনা হয়। (যিরমিয়, ১৫ অধ্যায়, ১০ শ্লোক; ১৮ অধ্যায়, ২০—২৩ শ্লোক; ২০ অধ্যায়, ১—১৮ শ্লোক; ৩৬—৪০ অধ্যায়)।

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصُّبَيْئِينَ مِنْ  
أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَعَمَلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُنَّ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُنُونَ ﴿٥﴾

৮ রাজুক'

নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, যারা শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনে কিংবা ইহুদি, খৃষ্টান বা সাবি তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তার প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের জন্য কোন ভয় ও মর্মবেদনার অবকাশ নেই।<sup>৮০</sup>

ছয় : 'আমুস' নামক আর একজন নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে : যখন তিনি সামারিয়ার ইসরাইলী রাষ্ট্রের প্রতিটা ও ব্যক্তিগতের সমালোচনা করেন এবং এই অসৎকাজের পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেন তখন তাঁকে চরমপত্র দিয়ে বলে দেয়া হয়, এদেশ থেকে বের হয়ে যাও এবং বাইরে গিয়ে নিজের নবুওয়াত প্রচার করো। (আমুস, ৭ অধ্যায়, ১০—১৩ শ্লোক)।

সাত : হযরত ইয়াহইয়া (John the Baptist) আলাইহিস সালাম যখন ইহুদি শাসক হিরোডিয়াসের দরবারে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তখন প্রথমে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। তারপর বাদশাহ নিজের প্রেমিকার নির্দেশানুসারে জাতির এই সবচেয়ে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিটির শিরচ্ছেদ করে। কর্তৃত ফস্তক একটি খালায় করে নিয়ে বাদশাহ তার প্রেমিকাকে উপহার দেয়। (মার্ক, ৬ অধ্যায়, ১৭—২৯ শ্লোক)।

আট : সবশেষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে বনী ইসরাইলের আলেম সমাজ ও জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তি হয়। কারণ তিনি তাদের পাপ, কাজ ও লোক দেখানো সৎকাজের সমালোচনা করতেন। তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের দিকে আহবান জানাতেন। এসব অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে যিখ্যা মামলা তৈরি করা হয়। রোমান আদৃত তাঁকে প্রাণদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত করে। রোমান শাসক পীলাতীস যখন ইহুদীদের বললো, আজ ঈদের দিন, আমি তোমাদের স্বার্থে ঈসা ও বারাব্বা (Barabbas) ডাকাতের মধ্য থেকে একজনকে মৃত্যি দিতে চাই। আমি কাকে মৃত্যি দেবো? ইহুদিয়া সমগ্রে বললো, আপনি বারাব্বাকে মৃত্যি দিন এবং ঈসাকে ফাসি দিন। (মর্থি, ২৭ অধ্যায়, ২০—২৬ শ্লোক)।

এই হচ্ছে ইহুদি জাতির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের একটি কল্পকজনক অধ্যায়। কুরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সংক্ষেপে এদিকেই ইঞ্জিত করা হয়েছে। বলা বাহ্য্য যে জাতি নিজের ফাসেক ও দুর্ঘরিত সম্পর লোকদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাতে এবং

وَإِذْ أَخْلَنَا مِيقَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْطُورَ خَلْوَامَاً أَتَيْنَكُمْ  
بِقُوَّةٍ وَأَذْكَرْوًا مَأْفِيهِ لَعْلَكُمْ تَتَقَوَّنَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تُولِيتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ أَكْثَرٌ مِنَ الْخَسَرِينَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ  
عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مُنْكَرًا فِي السَّبِيلِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا  
قِرَدَةً حُسَيْنِينَ ﴿١٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لَهُمَا بَيْنَ يَدِيهِمَا وَمَا خَلْفَهُمَا  
وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٦﴾

শরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা 'তূর'কে তোমাদের ওপর উঠিয়ে তোমাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম<sup>১</sup>: "যে কিতাব আমরা তোমাদেরকে দিষ্টি তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তার মধ্যে যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধান রয়েছে সেগুলো শরণ রেখো। এভাবেই আশা করা যেতে পারে যে, তোমরা তাকওয়ার পথে চলতে পারবে।" কিন্তু এরপর তোমরা নিজেদের অংগীকার ভঙ্গ করলে। তবুও আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত তোমাদের সংগ ছাড়েনি, নয়তো তোমরা কবেই খৎস হয়ে যেতে।

নিজেদের জাতির সেইসব লোকের ঘটনা তো তোমাদের জানাই আছে যারা শনিবারে<sup>২</sup> বিধান ভেঙেছিল। আমরা তাদের বলে দিলাম : বানর হয়ে যাও এবং এমনভাবে অবস্থান করো যাতে তোমাদের সবদিক থেকে লাঙ্গনা গঞ্জনা সহিতে হয়।<sup>৩</sup> এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে সমকালীন লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিশুণীয় এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য মহান উপদেশে পরিণত করেছি।

সং ৪ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী লোকদেরকে কারাগারে স্থান দিতে চায় আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ না করলে আর কাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবেন?

৮০. বক্তব্য ও বিয়য়বস্তু বর্ণনার ধারবাহিকতাকে সামনে রাখলে একথা আপনা আপনি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে ঈমান ও সৎকাজের বিশ্বারিত বর্ণনা দেয়া মূল লক্ষ নয়। কোন বিয়য়গুলো মানতে হবে এবং কোন কাজগুলো করলে মানব আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে, এ আয়াতে সে প্রসংগ আলোচিত হয়নি। বরং যথাস্থানে এগুলোর বিশ্বারিত আলোচনা আসবে। ইহদিয়া যে একমাত্র ইহুদি গোষ্ঠীকেই নাজাত ও

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَلْبِسُوا بَعْرَةً، قَالُوا  
أَتَتَخْلُنَا هَذِهِ وَمَا أَنْجَوْنَا إِلَّا كَوْنَنَا مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ ۝ قَالُوا  
أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۝ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَعْرَةٌ لَا فَارِضٌ  
وَلَا بَكْرٌ ۝ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ دَفَعَ عَلُوًا مَأْتُؤُ مَرْوَنَ ۝

এরপর খরণ করো সেই ঘটনার কথা যখন মূসা তার শাতিকে বললো, আগ্নাহ তোমাদের একটি গাড়ী যবেহ করার ইকুম দিচ্ছেন। তারা বললো, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? মূসা বললো, নিরেট মূর্খদের মতো কথা বলা থেকে আমি আগ্নাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি; তারা বললো, আচ্ছা তাহলে তোমার রবের কাছে আবেদন করো তিনি যেন সেই গাড়ীর কিছু বিভারিত বিবরণ আমাদের জানিয়ে দেন। মূসা জবাব দিল আগ্নাহ বনছেন, সেটি প্রবশ্যি এমন একটি গাড়ী হতে হবে যে বৃক্ষ নয়, একেধারে ছেট্টি বাহুরটিও নয় এবং হবে মাবারি বয়সের। কাজেই যেমনটি ইকুম দেয়া হয় ঠিক তেমনটিই করো।

পরকালীন মুক্তির ইজ্রাদার মনে করতো সেই ভাষ্ট ধারণাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই এখানে এই অযোগ্যির উদ্দেশ্য। তারা এই ভূল ধারণা প্রেরণ করতো যে, তাদের দলের সাথে আগ্নাহর কোন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে—যা অন্য মানুষের সাথে নেই, কাজেই তাদের দলের সাথে যে—ই সম্পর্ক রাখবে, তার আর্কীদা-বিশ্বাস, আমন-আখলাক যাই হোক না কেন, সে নির্ভীত নাজাত লাভ করবে। আর তাদের দলের বাইরে বাদবাকি সমগ্র ধানবজাতি কেবল জাহারামের ইহন হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এই ভূল ধারণা দূর করার জন্য বলা বলা হচ্ছে, আগ্নাহর কাছে তোমাদের এই দল ও গোত্র বিভক্তিই আসল কথা নয় এবং সেখানে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিষয় হচ্ছে তোমাদের স্বামান ও সৎকাঙ্গ। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে আগ্নাহর সাথনে হায়ির হবে সে তার রবের কাছ থেকে তার প্রতিদান লাভ করবে। আগ্নাহর ওখানে ফায়সালা হবে মানুষের গুণবর্ণার ওপর, জনসংখ্যার হিসেবের আন্তর্পত্রের ওপর নয়।

৮১. এ ঘটনাটিকে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, এটি বনী ইসরাইলদের মধ্যে একটি সুবিধ্যাত্ব ও সর্ববন্ধবিদিত ঘটনা ছিল: কিন্তু বর্তমানে এর বিভারিত অবস্থা জানা কঠিন। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেয়া উচিত যে, পাহাড়ের পাদদেশে অংগীকার নেয়ার সময় এমন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল যার ফলে তারা মনে করছিল পাহাড় তাদের ওপর আপত্তি হবে। সূরা আ'রাফের ১৭১ অয়াতে কিছুটা এ ধরনেরই একটি হবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (সূরা আ'রাফের ১৩২ নম্বর চীকাটি দেখুন)।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبْيَسِنَ لَنَا مَالَوْنَاهَا ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ لِهَا  
 بَقْرَةٌ صَفَرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنَهَا تَسْرَا النَّظَرِينَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ  
 يَبْيَسِنَ لَنَا مَاهِيَّا ۝ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهَ عَلَيْنَا وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
 لَمْهَتْلُونَ ۝ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ  
 وَلَا تَسْقِي الْحَرَثَ مُسْلِمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۝ قَالُوا أَلِئَنَ جِئْتَ  
 بِالْحَقِّ فَلَمْ يَبْحَوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝

আবার তারা বলতে লাগলো, তোমার রবের কাছে আরো জিজ্ঞেস করো, তার রংটি কেমন? মুসা জবাব দিল, তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্য হলুদ রংয়ের হতে হবে, তার রং এতই উজ্জ্বল হবে যাতে তা দেখে মানুষের মন ভরে যাবে। আবার তারা বললো, তোমার রবের কাছ থেকে এবার পরিষ্কারভাবে জেনে নাও, তিনি কেমন ধরনের গাভী চান? গাভীটি নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমরা সন্দিক্ষ হয়ে পড়েছি। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্য এটি বের করে ফেলবো। মুসা জবাব দিল আল্লাহ বলছেন, সেটি এমন একটি গাভী যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করা হয় না, জমি চাষ বা ক্ষেত্রে পানি সেচ কোনটিই করে না, সুস্থ-সবল ও নিখুঁত। একথায় তারা বলে উঠলো, হাঁ, এবার তুমি ঠিক সক্ষান দিয়েছো। অতপর তারা তাকে যবেহ করলো, অন্যথায় তারা এমনটি করতো বলে মনে হচ্ছিল না।<sup>৮৪</sup>

৮২. বনী ইসরাইলদের জন্য শনিবারের বিধান তৈরি করা হয়েছিল। অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে শনিবার দিনটি তাদের বিশ্বামি ও ইবাদাত করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এদিনে তারা পাথির কোন কাজ এমন কি রান্না-বান্নার কাজ নিজেরা করতে পারবে না এবং চাকর-বাকরদের দ্বারাও এ কাজ করাতে পারবে না। এ প্রসংগে কড়া নির্দেশ জারী করে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি এই পবিত্র দিনের নির্দেশ অমান্য করবে তাকে হত্যা করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। (যাত্রা পৃষ্ঠক, ৩১ অধ্যায়, ১২—১৭ শ্লোক)।

কিন্তু বনী ইসরাইলরা নৈতিক ও ধর্মীয় পতনের শিকার হবার পর প্রকাশ্যে শনিবারের বিধানের অবমাননা করতে থাকে। এমনকি তাদের শহরগুলোতে প্রকাশ্যে শনিবার ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার চলতে থাকে।

৮৩. সূরা আ'রাফের ২১ রূক্ত'তে এ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। তাদেরকে বানরে পরিণত করার ধরন সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, তাদের

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفَسًا فَادْرِءُوهَا وَاللهُ مَخْرُجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ⑪  
 فَقُلْنَا أَضْرِبُوهَا بِعِصْمَهَا كَلَّ لِكَ يَحْيَى اللَّهُ الْمُوْتَىٰ وَبِرِيكْرَايْتِهِ  
 لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ⑫ ثُمَّ قَسَطْ قَلْوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ  
 كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرْ مِنْهُ  
 الْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقْ فَيَخْرُجْ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا  
 يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ⑬

## ৯. রুক্মু

আর অরণ করো সেই ঘটনার কথা যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একজন আর একজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনছিলে। আর আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছিলেন তোমরা যা কিছু গোপন করছো তা তিনি প্রকাশ করে দেবেন। সে সময় আমরা হৃকুম দিলাম, নিহতের লাশকে তার একটি অংশ দিয়ে আঘাত করো। দেখো এভাবে আল্লাহ মৃতদের জীবন দান করেন এবং তোমাদেরকে নিজের নিশানী দেখান, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।<sup>৮৫</sup> কিন্তু এ ধরনের নিশানী দেখার পরও তোমাদের দিল কঠিন হয়ে গেছে, পাথরের মত কঠিন বরং তার চেয়েও কঠিন। কারণ এমন অনেক পাথর আছে যার মধ্য দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় আবার অনেক পাথর ফেটে গেলে তার মধ্য থেকে পানি বের হয়ে আসে, আবার কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়েও যায়। আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেখবর নন।

দৈহিক কাঠামো পরিবর্তন করে বানরে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছিল। আবার অনেকে এর অর্থ এই গ্রহণ করে ধাকে যে, তাদের মধ্যে বানরের স্বত্ত্বাব ও বানরের গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের শব্দাবলী ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে মনে হয়, তাদের মধ্যে নৈতিক নয়, দৈহিক বিকৃতি ঘটেছিল: আমার মতে, তাদের মষ্টিষ্ঠ ও চিঞ্চাশক্তিকে পূর্ববৎ অবিকৃত রেখে শারীরিক বিকৃতি ঘটিয়ে বানরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এটিই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

৮৪. তাদের প্রতিবেশী জাতিরা গরুকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র মনে করতো এবং গরু পূজা করতো আর প্রতিবেশীদের থেকে এ রোগ তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়, তাই তাদেরকে গরু যবেহ করার হৃকুম দেয়া হয়। তাদের দুমানের পরীক্ষা এভাবেই হওয়া সম্ভবপর

أَفَتَطْمِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا الْكُرْ وَقُلْ كَانَ فِرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ  
 كَلَّمَ اللَّهِ تِرْ يَحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلَوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ<sup>৮৫</sup> وَإِذَا لَقُوا  
 الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا أَمْنَا<sup>৮৬</sup> وَإِذَا خَلَّا بِعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا  
 أَتَحْلِ ثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَحْاجُوكُمْ يَهُ عِنْدَ رَبِّكُمْ<sup>৮৭</sup>  
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ<sup>৮৮</sup>

হে মুসলমানরা! তোমরা কি তাদের থেকে আশা করো তারা তোমাদের দাওয়াতের ওপর ইমান আনবে<sup>৮৫</sup> অথচ তাদের একটি দলের চিরাচরিত রীতি এই ছলে আসছে যে, আল্লাহর কালাম শুনার পর খুব ভালো করে জেনে বুঝে সজ্ঞানে তার মধ্যে 'তাহরীফ' বা বিকৃতি সাধন করেছে।<sup>৮৬</sup> (মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর ওপর) যারা ইমান এনেছে তাদের সাথে সাক্ষাত হলে বলে, আমরাও তাঁকে মানি। আবার যখন পরম্পরের সাথে নিরিবিলিতে কথা হয় তখন বলে, তোমরা কি বুঝিব হয়ে গেলে? এদেরকে তোমরা এমন সব কথা বলে দিচ্ছো যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন, ফলে এরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের মোকাবিলায় তোমাদের একথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে<sup>৮৭</sup>

ছিল। এখন যদি তারা যথার্থই আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে মাবুদ বলে স্বীকার না করে তাহলে এ আকীদা গ্রহণ করার পূর্বে যেসব ঠাকুর-দেবতার মূর্তিকে তারা মাবুদ মনে করে আসছিল তাদেরকে নিজের হাতে তেঙ্গে ফেলতে হবে। এটা অনেক বড় পরীক্ষা ছিল। তাদের দিলের মধ্যে ইমান পুরোপুরি বাসা বাঁধতে পারেনি, তাই তারা টালবাহানা করতে থাকে এবং বিশ্বারিত জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। কিন্তু যতই বিশ্বারিত জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে ততই তারা নিজেরা ঘৰাও হয়ে যেতে থাকে। অবশ্যে সেকালে যে বিশেষ ধরনের সোনালী গাড়ীর পূজা করা হতো তার প্রতি প্রায় অংশগতি নির্দেশ করে তাকেই যবেহ করতে বলা হলো। বাইবেলেও এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তবে বনী ইসরাইলরা এ নির্দেশটি উপেক্ষা করার জন্য কোনু ধরনের টালবাহানা করেছিল, তা সেখানে বলা হয়নি। (গণনা পৃষ্ঠক, ১৯ অধ্যায়, ১—১০ শ্লোক)।

৮৫. এখানে সুম্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, হত্যাকারীর সঙ্কান বলে দেয়ার জন্য নিহত ব্যক্তির লাশের মধ্যে পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য প্রাণপ্রদন ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির লাশকে তার একটি অংশ দিয়ে আঘাত করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তবুও এর ব্যাখ্যায় প্রাচীনতম তাফসীরকারগণ যা বলেছেন তাকেই এর

নিকটতম অর্থ ধরা যায়। অর্থাৎ আগে যে গাতী যবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারই গোশ্ত দিয়ে নিহত বক্সিন লাশের গায়ে আঘাত করতে বলা হয়েছিল। এভাবে এক টিলে দুই পাখি মারা গেলো। প্রথমত আল্লাহর কুদরাত ও অসীম ক্ষমতার একটি প্রমাণ তাদের সামনে তুলে ধরা হলো। দ্বিতীয়ত গরুর পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও তাকে উপাস্য হবার যোগ্যতার ওপরও একটি শক্তিশালী আঘাত হানা হলো। এই তথ্যকথিত উপাস্যটি যদি সামান্যতম ক্ষমতারও অধিকারী হতো তাহলে তাকে যবেহ করার কারণে একটি মহাবিপদ ও দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতো। কিন্তু বিপরীত পক্ষে আমরা দেখছি তা মানুষের কল্পনে সেগেছে।

৮৬. এখানে মদীনার নওমুসলিমদেরকে সঙ্গেধন করা হয়েছে। তারা নিকটবর্তী কালে শেষ নবীর ওপর ঈমান এনেছিল। ইতিপূর্বে নবুওয়াত, শরীয়াত, কিতাব, ফেরেশতা, আখেরোত ইত্যাদি শব্দগুলো তাদের কানে পৌছেছিল। এসব তারা শুনেছিল তাদের প্রতিবেশী ইহুদিদের কাছ থেকে। তারা ইহুদিদের মুখ থেকে আরো শুনেছিল যে, দুনিয়ায় আরো একজন নবী আসবেন। যারা তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে সারা দুনিয়ায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই জানার ভিত্তিতে মদীনাবাসীরা নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের চৰ্চা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এখন তারা আশা করছিল, যারা আগে থেকে নবী ও আসমানী কিতাবের অনুসারী এবং যাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরের বদৌলতে তারা ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী হয়েছে, তারা নিচয়ই তাদের সহযোগী হবে। বরং এ পথে তারা অগ্রগামী হবে। এই বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে মদীনার উদ্যোগী নওমুসলিমরা তাদের ইহুদি বক্তু ও প্রতিবেশীদের কাছে যেতো এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতো। তারা এ দাওয়াত গ্রহণে অঙ্গীকৃতি জানালে মুনাফিক ও ইসলাম বিরোধীরা এ সুযোগ গ্রহণ করতো। তারা এ থেকে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো যে, ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক ও সংশয়পূর্ণ মনে হচ্ছে, নইলে মুহাম্মাদ (সা) যদি সত্যিই নবী হতেন তাহলে ‘আহলি কিতাব’দের উল্লামা, মাশায়েখ ও পবিত্র বুর্যগণ কি জেনে বুঝে ঈমান আনতে অঙ্গীকৃতি জানাতো এবং তারা কি অনর্থক এভাবে নিজেদের পরকাল নষ্ট করতো? তাই বনী ইসরাইলদের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করার পর এবার সরলপ্রাণ মুসলিমানদেরকে সঙ্গেধন করে বলা হচ্ছে, অতীতে যারা এ ধরনের কীর্তিকলাপ করেছে তাদের ব্যাপারে তোমরা বেশী কিছু আশা করো না। অন্যথায় তোমাদের দাওয়াত তাদের পায়াণ অন্তরে ধাক্কা থেয়ে যখন ফিরে আসবে তখন তোমাদের মন ভেঙে পড়বে। এই ইহুদিরা শত শত বছর থেকে বিকৃত হয়ে আছে। আল্লাহর যে সমস্ত আয়াত শুনে তোমাদের দিল কেপে উঠে সেগুলোকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্যুপ করতে করতে তাদের কয়েক পুরুষ কেটে গেছে। আল্লাহর সত্য দীনকে তারা নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদা মোতাবিক বিকৃত করেছে। এই বিকৃত দীনের মাধ্যমেই তারা পরকালীন নাজ্ঞাত লাভের প্রত্যাশী। সত্যের আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই তারা সেদিকে দৌড়ে যাবে, তাদের সম্পর্কে এ ধারণা রাখা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮৭. “একটি দল” বলতে তাদের উল্লামা ও শরীয়াতধারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে তাওরাত, যাবুর ও অন্যান্য কিতাব, যেগুলো তারা নিজেদের নবীদের মাধ্যমে লাভ

أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَسِرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ<sup>(১)</sup> وَمِنْهُمْ أَمِينُونَ  
 لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ<sup>(২)</sup> فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ  
 يَكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَشْتَرِوْنَا  
 بِهِ ثُمَّ نَاقِلًا<sup>৩</sup> فَوَيْلٌ لِّلَّهِمْ مَا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لِّلَّهِمْ مَا  
 يَكْسِبُونَ<sup>(৪)</sup>

এরা কি জানে না, যা কিছু এরা গোপন করছে এবং যা কিছু প্রকাশ করছে সমস্তই আল্লাহর জানেন? এদের মধ্যে দিতীয় একটি দল হচ্ছে নিরক্ষরদের। তাদের কিতাবের জ্ঞান নেই, নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাংখাগুলো নিয়ে বসে আছে এবং নিছক অনুমান ও ধারণার ওপর নির্ভর করে চলছে।<sup>১</sup>৯ কাজেই তাদের জন্য খৎস অবধারিত যারা স্বহস্তে শরীয়াতের লিখন লেখে তারপর লোকদের বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এভাবে তারা এর বিনিময়ে সামান্য স্বার্থ লাভ করে।<sup>১</sup>০ তাদের হাতের এই লিখন তাদের খৎসের কারণ এবং তাদের এই উপার্জনও তাদের খৎসের উপকরণ।

করেছিল, সেগুলোকেই বলা হয়েছে “আল্লাহর কালাম।” ‘তাহরীফ’ অর্থ হচ্ছে কোন কথাকে তার আসল অর্থ ও তাৎপর্য থেকে বিছির করে নিজের ইচ্ছে মতো এমন কোন অর্থে ব্যবহার করা যা বজায় উদ্দেশ্য ও লক্ষের পরিপন্থী। তাছাড়া শব্দের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করাকেও তাহরীফ বলে। বনী ইসরাইলী আলেমগণ আল্লাহর কালামের মধ্যে এই দু’ ধরনের তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করেছিল।

৮৮. অর্থাৎ তারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় বলতো, এই নবী সম্পর্কে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহে যেসব তবিষ্যদ্বাণী উন্নিষ্ঠিত হয়েছে অথবা আমাদের পবিত্র কিতাবসমূহে আমাদের বর্তমান মনোভাব ও কর্মনীতিকে অভিযুক্ত করার মতো যে সমস্ত আয়াত ও শিক্ষা রয়েছে, সেগুলো মুসলমানদের সামনে বিবৃত করো না। অন্যথায় তারা আল্লাহর সামনে এগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। আল্লাহ সম্পর্কে নাদান ইহুদিদের বিশ্বাস এভাবেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তারা যেন মনে করতো, দুনিয়ায় যদি তারা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করে ও সত্য গোপন করে তাহলে এ জন্য আখেরাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা চলবে না। তাই পরবর্তী প্রাসংগিক বাক্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা কি আল্লাহকে বেখবর মনে করো?

৮৯. এ ছিল তাদের জনগণের অবস্থা। আল্লাহর কিতাবের কোন জ্ঞানই তাদের ছিল না। আল্লাহ তাঁর কিতাবে দীনের কি কি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, শরীয়াত ও নৈতিকতার কি

وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْلُودَةً قُلْ أَتَخْلُنَّ تَمْرَ عِنْدَ  
 اسْتِهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  
 بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاحْاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَ أُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ

তারা বলে, জাহানামের আগুন আমাদের কথনো স্পর্শ করবে না, তবে কয়েক দিনের শাস্তি হলেও হয়ে যেতে পারে।<sup>১১</sup> এদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অংশীকার নিয়েছো, যার বিরুদ্ধাচরণ তিনি করতে পারেন না? অথবা তোমরা আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়ে এমন কথা বলছো যে কথা তিনি নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়েছেন বলে তোমাদের জানা নেই? আচ্ছা জাহানামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না কেন? যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং পাপের জালে আটেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়বে সে-ই জাহানামী হবে এবং জাহানামের আগুনে পুড়তে থাকবে চিরকাল। আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তারাই জাহানের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

বিধান দিয়েছেন এবং কোন কোন জিনিসের ওপর মানুষের কল্যাণ ও ক্ষতির ভিত্তি রেখেছেন, তার কিছুই তারা জানতো না। এই জ্ঞান না থাকার কারণে তারা নিজেদের ইচ্ছা, আশা-আকাংখা ও কল্পনার অনুসারী বিভিন্ন মনগড়া কথাকে দীন মনে করতো এবং এরি ভিত্তিতে গড়ে উঠি মিথ্যা আশা বুকে নিয়ে জীবন ধারণ করতো।

৯০. তাদের আলেমদের সম্পর্কে একথাগুলো বলা হচ্ছে। তারা কেবলমাত্র আল্লাহর কালামের অর্থ নিজেদের ইচ্ছা ও পার্থিব আর্থ অনুযায়ী পরিবর্তন করেনি বরং এই সংগে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা, জাতীয় ইতিহাস, কল্পনা, আন্দাজ-অনুমান, লৌকিক চিন্তাদর্শন এবং নিজেদের তৈরি করা আইন-কানুনগুলোর বাইবেলের মূল কালামের মধ্যে অনুপবেশ ঘটিয়েছে। সাধারণ মানুষের সামনে সেগুলোকে তারা এমনভাবে পেশ করেছে যেন সেগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাফিল হয়েছে। বাইবেলে স্থান লাভ করেছে এমন প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক কাহিনী, ভাষ্যকারের মনগড়া ব্যাখ্যা, ধর্মতাত্ত্বিক ন্যায়শাস্ত্রবিদের আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাস এবং প্রত্যেক আইন শাস্ত্রবিদের উদ্ভাবিত আইন আল্লাহর বাণীর (Word of God) মর্যাদা লাভ করেছে। তার প্রতি ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত কর্তব্যে পরিণত হয়ে গেছে। তাকে প্রত্যাহার করা ধর্মকে প্রত্যাহার করার নামাত্তর বিবেচিত হয়েছে।

وَإِذْ أَخْلَنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ تَفَ وَبِالْوَأْ  
لِدِينِ احْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمِ وَالْمَسِكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ  
حَسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةَ ثُمَّ تَوَلَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا  
مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ۝ وَإِذْ أَخْلَنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ  
دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ  
تَشْهُدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ هُوَ لَأَعْتَدْتُ لَكُمْ قَاتِلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرِيقًا  
مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ۝ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَثْرِ وَالْعُدُوِّ وَأَنْ  
وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَى تَفْلِيْهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَاجُهُمْ

## ১০ রূক্ত'

শরণ করো যখন ইসরাইল সন্তানদের থেকে আমরা এই মর্মে পাকাপোক্ত  
অংগীকার নিয়েছিলাম যে, আজ্ঞাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করবে না, মা-বাপ,  
আত্মীয়- পরিজন, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে,  
লোকদেরকে ভালো কথা বলবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। কিন্তু  
সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই অংগীকার ভংগ করেছিলে এবং এখনো  
তেওঞ্জে চলছো। আবার শরণ করো, যখন আমরা তোমাদের থেকে মজুবত  
অংগীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা পরম্পরের রক্ত প্রবাহিত করবে না  
এবং একে অন্যকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবে না। তোমরা এর অংগীকার করেছিলে,  
তোমরা নিজরাই এর সাক্ষী। কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাই-  
বেরাদারদেরকে হত্যা করছো, নিজেদের গোটীয় সম্পর্ক্যুক্ত কিছু লোককে  
বাস্তিটা ছাড়া করছো, যুনুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল  
গঠন করছো এবং তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তাদের মুক্তির জন্য  
তোমরা মুক্তিপণ আদায় করছো। অথচ তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করাই  
তোমাদের জন্য হারাম ছিল।

৯১. এখনে ইহুদি সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি ভুল ধারণার কথা বর্ণনা করা  
হয়েছে। তাদের আলেম, অ-আলেম, শিক্ষিত অশিক্ষিত নিরিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এই

أَفَتَؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضٍ ۝ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْنَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝  
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ ۝ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ أَوْ لِئَلَّا كَانُوا اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۝  
فَلَا يُخْفَى عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝

তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ইমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফরী করছো? ১২ তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঢ়িত ও পর্যন্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে? তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ বেখবর নন। এই লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। কাজেই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।

তুল ধারণায় নিষ্ঠ: তারা মনে করতো, আমরা যাই কিছু করি না কেন, আমাদের সাত্ত্বন মাফ, জাহানামের আগুন আমাদের ওপর হারাম, কারণ আমরা ইহুদি, আর ধরে নেয়া যাক যদি আমাদের কথনো শাস্তি দেয়াও হয় তাহলেও তা তবে মাত্র করেছিনের! কয়েকদিন জাহানামে রেখে তারপর আমাদের জানাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

১২. নবী সাল্লালাহু আল্লাহই ওয়া সাল্লামের মদীনায় শাগমনের পূর্বে মদীনার আশপাশের ইহুদি গোএরা তাদের প্রতিবেশী আরব গোত্রগুলোর (খাউস ও খায়রাজ) সাথে বক্রৃপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একটি আরব গোত্র অন্য একটি আরব গোত্রের সাথে যুদ্ধে নিষ্ঠ হলে উভয়ের বক্র ইহুদি গোত্র ও নিজেদের বক্রদের সাহায্য করতো এবং এভাবে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধৰত হতো। ইহুদিদের এ কাজটি তাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহর কিতাবের বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি ছিল। ইহুদিরা এটা জানতো। তারা তেমনে বুঝেই এভাবে আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করতো। কিন্তু যুদ্ধের পর একটি ইহুদি গোত্রের লোকেরা অন্য ইহুদি গোত্রের কাছে যুদ্ধবন্দী হয়ে এলে বিজয়ী গোত্রটি মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দিতো। বিজিত গোত্রের লোকেরা এই মুক্তিপণের অর্থ সরবরাহ করতো। তাদের মুক্তিপণের লেনদেনকে বৈধ গণ্য করার জন্য তারা আল্লাহর কিতাব থেকে দঙ্গীল-প্রমাণ পেশ করতো। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে উল্লেখিত মুক্তিপণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়ার বিধানটি তারা সাধ্বে মেনে চলতো কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ না করার বিধানটি মেনে চলতো না।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ وَأَتَيْنَا<sup>١</sup>  
 عِيسَى ابْنَ مَرِيَمَ الْبَيْنِيِّ وَأَيْدِنَهُ بِرُوحِ الْقَدْسِ ۖ أَفَكُلَّمَا  
 جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنْفَسَكُمْ أَسْتَكْبِرُ تُرَى ۚ فَقَرِيقًا  
 كُلَّ بَتْرَىٰ وَفَرِيقًا تَقْتَلُونَ ۝ وَقَاتُلُوا قُلُوبَنَا غَلَقْ ۝ بَلْ لَعْنُهُمْ  
 اللَّهُ بِكُفَّارِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَبٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 مَصْدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ ۝ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ  
 كَفَرُوا ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۝ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ ۝

১১ রূপ্ত

আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। তারপর ক্রমাগতভাবে রসূল পাঠিয়েছি। অবশেষে ঈসা ইবনে মারযামকে পাঠিয়েছি উজ্জ্বল নিশানী দিয়ে এবং পবিত্র রাহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছি।<sup>১৩</sup> এরপর তোমরা এ কেমনতর আচরণ করে চলছো, যখনই কোন রসূল তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা বিরোধী কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখনই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছো, কাটকে মিথ্যা বলেছো এবং কাটকে হত্যা করেছো। তারা বলে, আমাদের হন্দয় সুরক্ষিত।<sup>১৪</sup> না, আসলে তাদের কুফরীর কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, তাই তারা বুব কমই ঈমান এনে থাকে। আর এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে যে একটি কিতাব এসেছে তার সাথে তারা কেমন ব্যবহার করছে? তাদের কাছে আগে থেকেই কিতাবটি ছিল যদিও এটি তার সত্যতা স্বীকার করতো এবং যদিও এর আগমনের পূর্বে তারা নিজেরাই কাফেরদের মোকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যের দোয়া চাইতো, তবুও যখন সেই জিনিসটি এসে গেছে এবং তাকে তারা চিনতেও পেরেছে তখন তাকে মেনে নিতে তারা অঙ্গীকার করেছে।<sup>১৫</sup> আল্লাহর লানত এই অঙ্গীকারকারীদের ওপর।

১৩. ‘পবিত্র কল্হ’ বলতে অহী-জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। অহী নিয়ে দুনিয়ায় আগমনকারী জিবীলকেও বুঝানো হয়েছে। আবার হয়রত ঈসা আলাইহিস সালামের পাক কলকেও বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ নিজেই তাঁকে পবিত্র গুণাবলীতে ভূষিত করেছিলেন। ‘উজ্জ্বল

নিশানী' অর্থ সুস্পষ্ট আলামত ও চিহ্ন, যা দেখে অত্যেকটি সত্যপ্রিয় ও সত্যানুসন্ধিসুব্যক্তি হয়েরত ইস্লাম সালাইহিস সালামকে আল্লাহর নবী বলে চিনতে পারে।

১৪. অর্থাৎ আমাদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা এতই পাকাপোক্ত যে, তোমরা যাই কিছু বল 'না কেন আমাদের মনে তোমাদের কথা কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। যেসব হঠধর্মী লোকের মন-মন্ত্রিক অভ্যন্তর ও মূর্খতার বিদ্যমে আচ্ছন্ন থাকে তারাই এ ধরনের কথা বলে। তারা একে মজবুত বিশ্বাস নাম দিয়ে নিজেদের একটি গুণ বলে গণ্য করে। অথচ এটা মানুষের গুণ নয় দোষ। নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তার গুলদ ও মিথ্যা বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হবার পরও তার ওপর অবিচল ঝাকার চাইতে বড় দোষ মানুষের আর কি হতে পাবে?

১৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে ইহুদিরা তাদের পূর্ববর্তী নবীগণ যে নবীর আগমন বার্তা শুনিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। তারা দোয়া করতো, তিনি যেন অবিলম্বে এসে কাফেরদের প্রাধান্য খতম করে ইহুদি জাতির উন্নতি ও পুনরুন্থানের সূচনা করেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে মদীনাবাসীদের প্রতিবেশী ইহুদি সম্পদ্যান নবীর আগমনের আশায় জীবন ধারণ করতো, মদীনাবাসীরা নিজেরাই একথার সাক্ষ্য দেবে। যত্রত্র যখন তখন তারা বলে বেড়াতো : "ঠিক আছে, এখন প্রাণ ভরে আমাদের ওপর যুলুম করে নাও। কিন্তু যখন সেই নবী আসবেন, আমরা তখন এই যালেমদের সবাইকে দেখে নেবো।" মদীনাবাসীরা এসব কথা আগে থেকেই শুনে আসছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা এবং তাঁর অবহু শুনে তারা পরম্পর বলাবলি করতে লাগলো : দেখো, ইহুদিরা যেন তোমাদের পিছিয়ে দিয়ে এই নবীর ধর্ম গ্রহণ করে বাজী জিতে না নেয়। চলো, তাদের আগে আমরাই এ নবীর ওপর ঈমান আনবো। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখলো, যে ইহুদিরা নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন শুণছিল, নবীর আগমনের পর তারাই তাঁর সবচেয়ে বড় বিরোধী পক্ষে পরিগত হলো।

'এবং তারা তাকে চিনতেও পেরেছে' বলে যে কথা মূল আয়াতে বলা হয়েছে, তার স্বপক্ষে বহু তথ্য-প্রমাণ সেই যুগেই পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য পেশ করেছেন উম্মেল মু'মিনীন হয়েরত সফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় ইহুদি আলেমের যেয়ে এবং আর একজন বড় আলেমের ভাইয়ি। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পর আমার বাপ ও চাচা দু'জনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বসার পর তারা ঘরে ফিরে আসেন। এ সময় আমি নিজের কানে তাদেরকে এভাবে আলাপ করতে শুনি :

চাচা : আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর দেয়া হয়েছে ইনি কি সত্যিই সেই নবী?

পিতা : আল্লাহর কসম, ইনিই সেই নবী।

চাচা : এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত?

পিতা : হ্যাঁ।

চাচা : তাহলে এখন কি করতে চাও?

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسْهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِغِيَّا أَن  
يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءَ وَبِغَصْبٍ  
عَلَى غَصْبٍ وَلِلْكُفَّارِ عَلَى أَبْمَهِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا  
وَرَأُوا ۝ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۝ قُلْ فَلِمَ تَقْتَلُونَ  
أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ  
مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَتَخْنَثُ تَمَرَّ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلَمُونَ ۝

যে জিনিসের সাহায্যে তারা মনের সাত্ত্বনা লাভ করে, তা কতই না নিকৃষ্ট।<sup>১৬</sup> সেটি হচ্ছে, আল্লাহ যে হিদায়াত নাযিল করেছেন তারা কেবল এই জিদের বশবতী হয়ে তাকে মনে নিতে অঙ্গীকার করছে যে, আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে চেয়েছেন নিজের অনুগ্রহ (অঙ্গী ও রিসালাত) দান করেছেন,<sup>১৭</sup> কাজেই এখন তারা উপর্যুক্তি গ্যবের অধিকারী হয়েছে। আর এই ধরনের কাফেরদের জন্য চরম লাঙ্ঘনার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তারা বলে, “আমরা কেবল আমাদের এখানে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলদের মধ্যে) যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর ঈমান আনি।” এর বাইরে যা কিছু এসেছে তার প্রতি ঈমান আনতে তারা অঙ্গীকৃতি জানাচ্ছে। অথচ তা সত্য এবং তাদের কাছে পূর্ব থেকে যে শিক্ষা ছিল তার সত্যতার স্বীকৃতিও দিচ্ছে। তাদেরকে বলে দাও : যদি তোমরা তোমাদের ওখানে যে শিক্ষা নাযিল হয়েছিল তার ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীদেরকে (যারা বনী ইসরাইলদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন) হত্যা করেছিলে কেন? তোমাদের কাছে মূসা এসেছিল কেমন সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলো নিয়ে। তারপরও তোমরা এমনি যালেম হয়ে গিয়েছিলে যে, সে একটু আড়াল হতেই তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে বসেছিলে।

পিতা : যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে এর বিরোধিতা করে যাবো। একে সফলকাম হতে দেবো না। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ আধুনিক সংস্করণ)।

وَإِذَا خَلَ نَامِشًا قَمْرٌ وَرَفِعْنَا فَوْقَكُرْ الطُورَ خَلْ وَمَا أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ  
وَأَسْعَوْهُمْ قَالُوا سِعْنَا وَعَصِينَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ يُكْفِرُ هُمْ  
قُلْ بِئْسَمَا يَا مَرْكَبَهُ إِيمَانَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ  
لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا الْمَوْتَ  
إِنْ كَنْتُمْ صَلِيقِينَ وَلَنْ يَتَمْنُوا أَبَدًا بِمَا قَلَّ مَتْ أَيْدِيْهِمْ وَاللَّهُ  
عَلِيهِمْ بِالظَّلَمِينَ وَلَتَجِدُنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ  
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُودُ أَهْلَهُرْ لُوْبِعْرَافَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ  
بِمَزْحِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَعْمَرُ وَاللَّهُ بِصِيرَتِهِ يَعْلَمُونَ

তারপর সেই অংগীকারের কথাটাও একবার শরণ করো, যা আমি তোমাদের থেকে নিয়েছিলাম তৃতীয় পাহাড়কে তোমাদের ওপর উঠিয়ে রেখে। আমি জোর দিয়েছিলাম, যে পথনির্দেশ আমি তোমাদেরকে দিছি, দৃঢ়ভাবে তা মেনে চলো এবং মন দিয়ে শুনো। তোমাদের পূর্বসূরীরা বলেছিল, আমরা শুনেছি কিন্তু মানবো না। তাদের বাতিলপ্রিয়তা ও অন্যায় প্রবণতার কারণে তাদের হৃদয় প্রদেশে বাহুরই অবস্থান গেড়ে বসেছিল। যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে এ কেমন ঈমান, যা তোমাদেরকে এহেন খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়?

তাদেরকে বলো, যদি সত্যসত্যিই আল্লাহ সমগ্র মানবতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র তোমাদের জন্য আধেরাতের ঘর নির্দিষ্ট করে থাকেন, তাহলে তো তোমাদের মৃত্যু কামনা করা উচিত।—যদি তোমাদের এই ধারণায় তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। নিচিতভাবে জেনে রাখো, তারা কখনো এটা কামনা করবে না। কারণ তারা স্বহস্তে যা কিছু উপার্জন করে সেখানে পাঠিয়েছে তার স্বাভাবিক দাবী এটিই (অর্থাৎ তারা সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে না)। আল্লাহ এই সব যান্মদের অবস্থা ভালোভাবেই জানেন। বেঁচে থাকার ব্যাপারে তোমরা তাদেরকে পাবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে লোভী।<sup>১৯</sup> এমনকি এ ব্যাপারে তারা মুশরিকদের চাইতেও এগিয়ে রয়েছে। এদের প্রত্যেকে চায় কোনক্রমে সে যেন হাজার বছর বাঁচতে পারবে না। যে ধরনের কাজ এরা করছে আল্লাহ তার সবই দেখছেন।

قُلْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ وَالْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ يَا ذِيْنَ اللَّهِ مُصْلِّيْقَا  
لِمَا بَيْنِ يَدِيهِ وَهُنَّىٰ وَبَشْرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ مَنْ كَانَ عَلَىٰ وَاللَّهِ  
وَمَلِئَكَتِهِ وَرَسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ وَالْكُفَّارِ ۝

## ১২ রক্ত

ওদেরকে বলে দাও, যে ব্যক্তি জিবীলের সাথে শক্তি করে<sup>১০০</sup> তার জেনে রাখা উচিত, জিবীল আল্লাহরই হৃকুমে এই কুরআন তোমার দিলে অবরীণ করেছে<sup>১০১</sup> এটি পূর্বে আগত কিতাবগুলোর সত্যতা বীকার করে ও তাদের প্রতি সমর্থন যোগায়<sup>১০২</sup> এবং ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশনা ও সাফল্যের বার্তাবাহী<sup>১০৩</sup> (যদি এই কারণে তারা জিবীলের প্রতি শক্তির মনোভাব পোষণ করে থাকে তাহলে তাদেরকে বলে দাও) যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা, তাঁর রসূলগণ, জিবীল ও মীকাইনের শক্তি আল্লাহ সেই কাফেরদের শক্তি।

৯৬. এই আয়াতটির দ্বিতীয় একটি অনুবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছে : “যতই না নিকৃষ্ট সেটি, যার জন্য তারা নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের কল্যাণ, শুভ পরিণতি ও প্রকালীন নাজাতকে কুরবানী করে দিয়েছে।”

৯৭. তারা চাচ্ছিল, এই নবী তাদের ইসরাইল বংশের মধ্যে জন্ম নেবে। কিন্তু যখন তিনি বনী ইসরাইলের বাইরে এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, যাদেরকে তারা নিজেদের মোকাবিলায় তুচ্ছ-জ্ঞান করতো, তখন তারা তাঁকে অবীকার করতে উদ্যত হলো। অর্থাৎ তারা যেন বলতে চাচ্ছিল, আল্লাহ তাদেরকে জিজেস করে নবী পাঠালেন না কেন? যখন তিনি তাদেরকে জিজেস না করে যাকে ইচ্ছা তাকে নবী বানিয়ে পাঠালেন তখন তারা বৈকে বসলো।

৯৮. ইহদিদের দুনিয়া প্রীতির প্রতি এটি সূক্ষ্ম বিদ্যুপ বিশেষ। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে যারা সচেতন এবং আখেরাতের জীবনের সাথে যাদের সত্যিই কোন মানসিক সংযোগ থাকে তারা কখনো পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ইহদিদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এবং এখনো আছে।

৯৯. কুরআনের মূল শব্দে এখানে ‘আলা হায়াতিন’ বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, কোন না কোনভাবে বেঁচে থাকা, তা যে কোন ধরনের বেঁচে থাকা হোক না কেন, সম্মানের ও মর্যাদার বা ইনতার, দীনতার, লাঙ্ঘনা-অবমাননার জীবনই হোক না কেন তার প্রতিই তাদের লোড।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفُسِّقُونَ<sup>১০০</sup>  
 أَوْ كَلَمًا عَمِلَ وَأَعْدَلْ أَنْبَذَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  
 لَا يَؤْمِنُونَ<sup>১০১</sup> وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَلِّي لِمَا  
 مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الظَّاهِرِيْنَ أَوْتُرَا الْكِتَابَ قَرِئَ اللَّهُ  
 وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ<sup>১০২</sup>

আমি তোমার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি যেগুলো দ্যুর্থহীন সত্যের প্রকাশে সমৃজ্জুল। একমাত্র কাসেক গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ তার অনুগামিতায় অঙ্গীকৃতি জানায়নি। যখনই তারা কোন অংগীকার করেছে তখনই কি তাদের কোন না কোন উপদল নিশ্চিতভাবেই তার বুড়ো আঙুল দেখায়নি। বরং তাদের অধিকাংশই সাক্ষা দিলে ঈমান আনে না। আর যখনই তাদের কাছে পূর্ব থেকে রাঙ্কিত কিভাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন দিয়ে কোন রসূল এসেছে তখনই এই আহলি কিভাবদের একটি উপদল আল্লাহর কিভাবকে এমনভাবে পেছনে ঠেলে দিয়েছে যেন তারা কিছু জানেই না।

১০০. ইহদিয়া কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকেই গালাগালি দিতো না বরং তারা আল্লাহর প্রিয় মহান ফেরেশতা জিব্রিলকেও গালাগালি দিতো এবং বলতো : সে আমাদের শক্তি। সে রহমতের নয়, আফাবের ফেরেশতা।

১০১. অর্থাৎ এ জন্যই তোমাদের গালাগাল জিব্রিলের ওপর নয়, আল্লাহর মহান সন্তার ওপর আরোপিত হয়।

১০২. এর অর্থ হচ্ছে, জিব্রিল এ কুরআন মজীদ বহন করে এনেছেন বলেই তোমরা এ গালাগালি করছো। অথচ কুরআন সরাসরি তাওরাতকে সমর্থন যোগাচ্ছে। কাজেই তোমাদের গালিগালাজ তাওরাতের বিরুদ্ধেও উচ্চারিত হয়েছে।

১০৩. এখানে একটি বিশেষ বিয়য়বস্তুর প্রতি সূক্ষ্ম ইঁধিত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে : ওহে নির্বোধের দল! তোমাদের সমস্ত অস্মৃতি হচ্ছে হিদায়াত ও সত্য-সহজ পথের বিরুদ্ধে। তোমরা সড়ছো সঠিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। অথচ এই সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্বকে সহজভাবে মেনে নিলে তা তোমাদের জন্য সাফল্যের সুসংবাদ বহন করে আনতো।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَنُ عَلَى مُلْكِ سَلِيمَ وَمَا كَفَرَ سَلِيمُ  
 وَلِكَنَّ الشَّيْطَنَ كَفَرُوا يُعْلَمُونَ النَّاسُ السِّحْرَةُ وَمَا أَنْزَلَ  
 عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَأْبَلٍ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى  
 يَقُولُوا إِنَّا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يَغْرِقُونَ  
 بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
 وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضْرِهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَلِّ عِلْمٍ وَالَّمِنْ اشْتَرَهُ  
 مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ شَوَّالِيْسَ مَا شَرَّوْبَاهُ أَنْفَسُهُمْ لَوْ كَانُوا  
 يَعْلَمُونَ ⑩ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا وَاتَّقُوا لِمُتْوَبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ  
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

আর এই সংগে তারা এমন সব জিনিসের অনুসরণ করাতে মেতে ওঠে, যেগুলো  
 শয়তানরা পেশ করতো সুলাইমানী রাজত্বের নামে।<sup>104</sup> অথচ সুলাইমান কোন দিন  
 কুফরী করেনি। কুফরী করেছে সেই শয়তানরা, যারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো।  
 তারা ব্যবিলনে দুই ফেরেশতা হারাত ও মারাতের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা  
 আয়ত্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এর  
 শিক্ষা দিতো, তাকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলে সতর্ক করে দিতো : দেখো,  
 আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তুমি কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না।<sup>105</sup> এরপরও  
 তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিখতো, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এনে  
 দিতো।<sup>106</sup> একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর হৃত্য ছাড়া এ উপায়ে তারা কাউকেও ক্ষতি  
 করতে পারতো না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখতো যা তাদের  
 নিজেদের জন্য লাভজনক ছিল না বরং ছিল ক্ষতিকর। তারা ভালো করেই জানতো,  
 এর ক্ষেত্রে জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। কতই না নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে  
 তারা বিকিয়ে দিল নিজেদের জীবন! হায়, যদি তারা একথা জানতো! যদি তারা  
 দৈমান ও তাকওয়া অবনষ্টন করতো, তাহলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান লাভ  
 করতো এটি তাদের জন্য হোত বেশী ভালো। হায়, যদি তারা একথা জানতো।

১০৪. শয়তানরা বলতে জ্বিন জাতি ও মানবজাতি উভয়ের অন্তরভুক্ত শয়তান হতে পারে। এখানে উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। বনী ইসরাইলদের মধ্যে যখন নৈতিক ও বস্তুগত পতন সূচিত হলো, গোলামি, মৃত্যু, অঙ্গতা, দারিদ্র্য, লাঙ্ঘনা ও হীনতা যখন তাদের সমস্ত জাতিগত উচ্চ মনোবল ও উচ্চাকাঙ্খার বিলোপ সাধন করলো তখন যাদু-টোনা, তাবীজ-তুমার, টোটকা ইত্যাদির প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে থাকলো বেশী করে। তারা এমন সব পছন্দ অনুসন্ধান করতে লাগলো যাতে কোন প্রকার পরিষ্কার ও সংগ্রাম-সাধন ছাড়াই নিছক ঝাড়-ফুক তত্ত্বমন্ত্রের জোরে বাজীমাত করা যায়। তখন শয়তানরা তাদেরকে প্ররোচনা দিতে লাগলো। তাদেরকে বুঝাতে থাকলো যে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিশাল রাজত্ব এবং তাঁর বিশ্বকর ক্ষমতা তো আসলে কিছু মন্ত্র-তত্ত্ব ও কয়েকটা আঁচড়, নকশা তথা তাবীজের ফল। শয়তানরা তাদেরকে সেগুলো শিখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিল। বনী ইসরাইলরা অপ্রত্যাশিত মহাযুদ্ধবান সম্পদ মনে করে এর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। ফলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকলো না এবং কোন সত্যের আহবায়কের আওয়াজ তাদের হৃদয়ত্বাতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না।

১০৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমি যা কিছু বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র বনী ইসরাইল জাতি যে সময় ব্যাবিলনে বন্দী ও গোলামির জীবন যাপন করছিল, আল্লাহ তখন তাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দু'জন ফেরেশতাকে মানুষের বেশে তাদের কাছে হয়তো পাঠিয়ে থাকবেন। লৃত জাতির কাছে যেমন ফেরেশতারা গিয়েছিলেন সুদৰ্শন বালকের বেশ ধারণ করে তেমনি বনী ইসরাইলদের কাছে তারা হয়তো গীর ও ফকীরের ছদ্মবেশে হায়ির হয়ে থাকবে। সেখানে একদিকে তারা নিজেদের যাদুর দোকান সাজিয়ে বসে থাকতেন আর অন্যদিকে লোকদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতেন : দেখো, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না। কিন্তু তাদের এই সতর্কবাণী ও সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও লোকেরা তাদের দেয়া ঝাড়-ফুক ও তাবীজ-তুমারের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো।

ফেরেশতাদের মানুষের আকার ধারণ করে মানুষের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারটায় অবাক হবার কিছুই নেই। তারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মচারী। নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সময় যে আকৃতি ধারণ করার প্রয়োজন হয় তারা তাই করেন। এখনই এ মুহূর্তে আমাদের চারদিকে কতজন ফেরেশতা মানুষের আকার ধরে এসে কাজ করে যাচ্ছেন তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি। তবে ফেরেশতাদের এমন একটা কাজ শেখাবার দায়িত্ব নেয়া, যা মূলত খারাপ, এর অর্থ কি? এটা বুঝার জন্য এ দ্বিত্তৈ এমন একটি পুলিশের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে যে পুলিশের পোশাক ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরে কোন ঘৃঘর্ষের প্রশাসকের কাছে হায়ির হয় তার ঘৃঘর্ষের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য। একটি নোটের গায়ে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে সে ঘৃঘ হিসেবে প্রশাসককে দেয়, যাতে ঘৃঘ নেয়ার সময় হাতেনাতে তাকে ধরতে পারে এবং তার পক্ষে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার কোন অবকাশই না থাকে।

১০৬. অর্থাৎ সেই বাজারে সবচেয়ে বেশী চাহিদা ছিল এমন তাবীজের যার সাহায্যে এক ব্যক্তি অন্য একজনের স্তৰীকে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের প্রতি

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا انْظَرْنَا وَأَسْمَعُوا  
وَلِلْكُفَّارِ عَنْ أَبٍ أَلِيمٍ<sup>১০৭</sup> مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا  
الْمُشْرِكُونَ كَيْنَانْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رِبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتَصُ  
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ<sup>১০৮</sup>

১৩ রূক্তি

হে ঈমানদারগণ! <sup>১০৭</sup> ‘রাইনা’ বলো না বরং ‘উন্ধুরনা’ বলো এবং মনোযোগ সহকারে কথা শোনো! <sup>১০৮</sup> এই কাফেররা তো যত্রগাদায়ক আয়াব লাভের উপযুক্ত।

আহলি কিতাব বা মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা সত্যের দাওয়াত গ্রহণে অব্যুক্তি জানিয়েছে তারা কখনোই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোন কল্যাণ নাপিল হওয়া পছন্দ করে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান নিজের রহমত দানের জন্য বাছাই করে নেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

প্রেমাস্তু করতে পারে। তাদের মধ্যে যে নৈতিক পতন দেখা দিয়েছিল এটি ছিল তার নিকৃষ্টতম পর্যায়। যে জাতির সদস্যবৃন্দ পরকীয়া প্রেমে আস্তু হওয়া ও অন্যের বিয়ে করা বটেকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়াকে নিজেদের সবচেয়ে বড় বিজয় মনে করে এবং এটিই তাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক আকর্ষণীয় কাজে পরিণত হয়, তার নৈতিক অধপতন যে ঘোলকলায় পূর্ণ হয়ে গেছে তা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক হচ্ছে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মুস্তার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার মুস্তা এবং এর অসুস্থতার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার অসুস্থতা নির্ভরশীল। কাজেই যে বৃক্ষটির দৃঢ়ভাবে সংবন্ধ থাকার ওপর ব্যক্তির ও সমগ্র সমাজের টিকে থাকা নির্ভর করে তার মূলে যে ব্যক্তি কৃঠারঘাত করে তার চাইতে নিকৃষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে হতে পারে? হাদীসে বলা হয়েছে, ইবলিস তার কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় নিজের এজেন্ট পাঠায়। এজেন্টরা কাজ শেষে ফিরে এসে নিজেদের কাজের নিপোট শুনাতে থাকে। কেউ বলে আমি অমুক ফিতনা সৃষ্টি করেছি। কেউ বলে, আমি অমুক পাপের আয়োজন করেছি। কিন্তু ইবলিস প্রত্যেককে বলে যেতে থাকে, তুমি কিছুই করোনি। তারপর একজন এসে বলে, আমি এক জোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এসেছি। একথা শুনে ইবলিস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সে বলতে থাকে, তুমি একটা কাজের মতো কাজ করে এসেছো। এ হাদীসটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বনী ইসরাইলদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল তাদের কেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার ‘আমল’

গোকদেরকে শিখাবার হৃষুম দেয়া হয়েছিল তা সুস্পষ্টরপে অনুধাবন করা যায় আসলে আদের নৈতিক অধিপতনের অব্যহৃত পরিমাপের জন্য এটিই ছিল একমাত্র ধাননদণ্ড।

১০৬. এ রঞ্জ'ত এবং পরবর্তী রঞ্জ'গুলোত ইহদিদের পক হেফে ইসলাম ও ইসলামী মন্দির বিশ্বকে যেসব অনিষ্টকর কাজ করা ইছিল সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে তারা মুসলমানদের মনে যে সহজ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল এখনে সেগুলোর অব্যক্ত দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের সাথে ইহদিদের আনাপ-আলোচনায় যেসব বিশেষ প্রসঙ্গ উৎপন্ন হতো, সেগুলোও এখনে আলেচ্চিত হয়েছে। এ প্রসংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকে উচ্চিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনীনাম ধাগমনের পর যখন শহরের ধাশপাশের এলাকায় ইসলামের দাওয়াত বিশ্বার গ'ত করতে থাকলো; তখন ইহদিদা বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় বিতর্কে টেনে আনার চেষ্টা করতে থাকলো। আদের তিনিকে তার করার, ধর্তি গুরুত্বহীন বিষয়কে বিরাট গুরুত্ব দেয়ের সূচাতিসূচি বিহুরের অবতারণ করার, সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন করার ও প্রয়ের মধ্য হেফে প্রয় দের করার ম'রাব'ক রোগটি এসব 'সরলগমন' লোকদের মনেও তারা সঞ্চারিত করতে চাহিল এমন কি তার 'নিষেরাও সশরীরে' নবী কর্মীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মঙ্গলিসে এসে প্রত্যেকে কথাবার্তা বলে নিষেদের নীচ মনোবৃত্তির প্রয়াণ পেশ করতে।

১০৮. ইহদিয়া কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মঙ্গিসে এবং অভিবাসন, স্বাস্থ্য ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সত্ত্বাব্য সকল পদ্ধতিতে নিজেদের মনের কান উচ্চিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতো। ধৃঢ়বোধক শব্দ বলা, উচ্চধরে কিছু বলা এবং অনুচূবরে অন কিছু বলা, বাস্তুক ভদ্রতা ও অবদ-ক্ষয়ন যেনে চলে পর্দাতরলে ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবশ্যান্ত ও অপমান করার কোন ক্ষমতাই তারা ধাক করতো না। পরবর্তী পর্যায়ে কুরআনে এর বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এখনে মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতে নিয়ে করা হয়েছে। এ শব্দটি বহু ধৃঢ়বোধক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার সময় ইহদিদের যখন একথা বলার প্রয়োজন হতো যে, ধামুন বা 'কথাটি আমাদের একটু বুঝে নিতে দিন' তখন তার 'রাইনা' বলতো এ শব্দটির বাস্তিক অর্থ ছিল, 'আমাদের একটু সুযোগ দিন' বা 'আমাদের কথা শুনুন।' কিন্তু এর আরো কয়েকটি সত্ত্বাব্য অর্থও ছিল। যেমন হিতু তাহায় অনুরূপ যে শব্দটি ছিল তার অর্থ ছিল : 'শোন, তুই বধির হয়ে যা।' আর বী তায়ায়ও এর একটি অর্থ ছিল, 'শূন্য ও নির্বোধ।' আলোচনার মাধ্যমে এমন সময় শব্দটি ধ্যোণ করা হতো যখন এর অর্থ দাঙ্ডাতো, তোমর আমাদের কথা শুনলে অমরাও তোমাদের কথা শুনবে আব'র মুখটাকে একটু বড় করে 'রা-সোন' (رَأَيْتَ) ও বলার চেষ্টা করা হতো। এর অর্থ দাঙ্ডাতো 'ওহে, আমাদের রাখাল!' তাই মুসলমানদের ই-মুদ্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা এ শব্দটি ব্যবহার না করে বরং 'উন্মুরনা' বলো। এর অর্থ হয়, 'আমাদের দিকে দেখুন' 'আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন' অথবা 'আমাদের একটু বুকতে দিন' এরপর আব'র বলা হয়েছে, 'মনোযোগ সহকারে কথা শোন।' অর্থাৎ ইহদিদের একেব্র কারণ বাব'র বলার প্রয়োজন হয়। কারণ তারা নবীর কথার ধৃতি অগ্রহী হয় না এবং তা-

মান্সের مِنْ آيَةٍ أَوْ نِسْمَاهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، الْمُرْ تَعْلَمُ  
 آنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾ الْمُرْ تَعْلَمُ آنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ، وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿١١﴾  
 آمَّا تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ  
 يَتَبَدَّلَ الْكُفَّارُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ ﴿١٢﴾ وَدَكَثِيرٌ  
 مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا طَّعَّمُوا  
 مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا  
 وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِآمْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٣﴾

আমি যে আয়াতকে ‘মানসুখ’ করি বা ভুলিয়ে দেই, তার জায়গায় আনি তার চাইতে তালো অথবা কমপক্ষে ঠিক তেমনটিই।<sup>১০</sup> তুমি কি জানো না, আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী? তুমি কি জানো না, পৃথিবী ও আকাশের শাসন কর্তৃত একমাত্র আল্লাহর? আর তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন বক্তু ও সাহায্যকারী নেই।

তাহলে তোমরা কি তোমাদের রসূলের কাছে সেই ধরনের প্রশ্ন ও দাবী করতে চাও যেমন এর আগে মুসার কাছে করা হয়েছিল<sup>১১</sup> অথচ যে ব্যক্তি ঈমানী নীতিকে কুফরী নীতিতে পরিবর্তিত করেছে, সে-ই সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্ছুত হয়েছে। আহ্লি কিতাবদের অধিকাংশই তোমাদেরকে কোনক্রমে ঈমান থেকে আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়। যদিও হক তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে তবুও নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে এটিই তাদের কামনা। এর জবাবে তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো।<sup>১২</sup> যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই এর কোন ফায়সালা করে দেন। নিচিত জেনো, আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتْوَالرِّزْكُوَةَ وَمَا تَقْرِبُوا إِلَيْنَا مِنْ خَيْرٍ  
 تَجِدُونَهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>(১)</sup> وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ  
 الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيٌّ<sup>(২)</sup> تِلْكَ أَمَانِيْهِمْ قُلْ هَاتُوا  
 بِرْهَانَكُمْ إِنْ كَثُرَ صِلْقَيْنَ<sup>(৩)</sup> بَلِّيْ قَمَنْ أَسْلَرْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ  
 مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرَةٌ عِنْدَ رَبِّهِ<sup>(৪)</sup> وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ<sup>(৫)</sup>

নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও। নিজেদের পরকালের জন্য তোমরা যা কিছু সংকোচ করে আগে পাঠিয়ে দেবে, তা সবই আল্লাহর ওখানে মজুত পাবে। তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।

তারা বলে, কোন ব্যক্তি জানাতে যাবে না, যে পর্যন্ত না সে ইহুদি হয় অথবা (খৃষ্টানদের ধারণামতে) খৃষ্টান হয়। এগুলো হচ্ছে তাদের আকাংখা।<sup>১-২</sup> তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের প্রমাণ আনো, যদি নিজেদের দাবীর ব্যাপারে তোমরা সত্যবাদী হও। (আসলে তোমাদের বা অন্য কারোর কোন বিশেষত্ব নেই।) সত্য বলতে কি যে ব্যক্তিই নিজের সত্ত্বাকে আল্লাহর আনুগত্যে সোপর্দ করবে এবং কার্যত সৎপথে চলবে, তার জন্য তার রবের কাছে আছে এর প্রতিদান। আর এই ধরনের লোকদের জন্য কোন ভয় বা মর্মবেদনার অবকাশ নেই।

কথা বলার মাঝখানে তারা নিজেদের চিন্তাজালে বার বার জড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু তোমাদের তো মনোযোগ সহকার নবীর কথা শনতে হবে। কাজেই এ ধরনের ব্যবহার করার প্রয়োজনই তোমাদের দেখা দেবে না।

১০৯. ইহুদিরা মুসলমানদের মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাতো তার মধ্য থেকে একটি বিশেষ সলেহের জবাব এখানে দেয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ ছিল, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থেকে থাকে এবং এ কুরআনও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাহলে ঐ কিতাবগুলোর কতিপয় বিধানের জ্ঞানগায় এখানে ভিন্নতর বিধান দেয়া হয়েছে কেন? একই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিধান কেমন করে হতে পারে? আবার তোমাদের কুরআন এ দাবী উথাপন করেছে যে, ইহুদিরা ও খৃষ্টানরা তাদেরকে প্রদত্ত এ শিক্ষার একটি অংশ ভূলে গেছে। আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা হাফেজদের মন থেকে কেমন করে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে? সঠিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তারা এসব কথা বলতো না। বরং কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা এগুলো বলতো। এর জবাবে আল্লাহ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِيَسِي النَّصْرِى عَلَى شَئٍ وَقَالَتِ النَّصْرِى لِيَسِتِ  
الْيَهُودُ عَلَى شَئٍ "وَهُمْ يَتَلَوَنَ الْكِتَابَ كُلَّ لَكَ قَالَ الَّذِينَ  
لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيهَا  
كَانُوا فِيهِ بَخْتَلِفُونَ ۝

১৪ রংকৃ

ইহুদিরা বলে, খ্ষণ্ডনদের কাছে কিছুই নেই। খ্ষণ্ডনরা বলে ইহুদিদের কাছে কিছুই নেই। অথচ তারা উভয়ই কিতাব পড়ে। আর যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান নেই তারাও এ ধরনের কথা বলে থাকে। ১১৩ এরা যে মতবিরোধে লিখ হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন।

বলেছেন : আমি মালিক। আমার ক্ষমতা সীমাহীন। আমি নিজের ইচ্ছে মতো যে কোন বিধান 'মানসুখ' বা রহিত করে দেই এবং যে কোন বিধানকে হাফেজদের মন থেকে শুন্ধে ফেলি। কিন্তু যে জিনিসটি আমি 'মানসুখ' করি তার জ্ঞায়গায় তার চেয়ে ভালো জিনিস আনি অথবা কমপক্ষে সেই জিনিসটি নিজের জ্ঞায়গায় আগেরটির মতই উপযোগী ও উপকারী হয়।

১১০. ইহুদিরা তিলকে তাল করে এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করে মুসলমানদের সামনে নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতো। তোমাদের নবীর কাছে এটা জিজ্ঞেস করো ওটা জিজ্ঞেস করো বলে তারা মুসলমানদের উক্তানী দিতো। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহ মুসলমানদেরকে ইহুদিদের নীতি অবস্থন করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, অনর্থক প্রশ্ন করা এবং তিলকে তাল করার কারণে পূর্ববর্তী উস্মাতরা ধূংস হয়েছে, কাজেই তোমরা এ পথে পা দিয়ো না। আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেননি সেগুলোর পেছনে জোকের মতো লেগে থেকো না। তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা মেনে চলো এবং যে বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করা হয় সেগুলো করো না। অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে কাজের কথার প্রতি মনোযোগ দাও।

১১১. অর্থাৎ ওদের হিংসা ও বিদ্যে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ো না। নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলো না। এদের সাথে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া করে নিজের মূল্যবান সময় ও মর্যাদা নষ্ট করো না। ধৈর্যসহকারে দেখতে থাকো আল্লাহ কি করেন। অনর্থক আজেবাজে কাজে নিজের শক্তি ক্ষয় না করে আল্লাহর যিকির ও সৎকাজে সময় ব্যয় করো। এগুলোই আল্লাহর উখানে কাজে লাগবে। বিপরীত পক্ষে ঐ বাজে কাজগুলোর আল্লাহর উখানে কোন মূল্য নেই।

وَمِنْ أَظْلَمِهِ مِنْ مَنْ نَعَ مسِّجِدَ اللَّهِ أَن يُنْكِرْ فِيهَا اسْمَهُ وَسُعِيَ  
فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ هُنَّ  
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَزِيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ  
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوْلُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ  
وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝ ۱۱۶

আর তার চাইতে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম শরণ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্রংস করার প্রচেষ্টা চালায়? এই ধরনের লোকেরা এসব ইবাদাতগৃহে প্রবেশের যোগ্যতা রাখে না আর যদি কখনো প্রবেশ করে, তাহলে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে।<sup>১১৪</sup> তাদের জন্য রয়েছে এ দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে বিরাট শান্তি।

পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহর। তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান।<sup>১১৫</sup> আল্লাহ বড়ই ব্যাপকতার অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জ্ঞাত।<sup>১১৬</sup>

১১২. আসলে এটা নিছক তাদের অস্তরের বাসনা এবং আকাংখা মাত্র। কিন্তু তারা এটাকে এমনভাবে বর্ণনা করছে যেন সত্যি সত্যিই এমনটি ঘটবে।

১১৩. অর্থাৎ আরবের মুশরিকরা।

১১৪. অর্থাৎ ইবাদাতগৃহগুলো এ ধরনের যালেমদের কর্তৃত্বে ও পরিচালনাধীনে থাকার এবং তারা এর রক্ষণাবেক্ষণকারী হবার পরিবর্তে শাসন কর্তৃত্ব থাকা উচিত আল্লাহকে তয় করে এবং আল্লাহর প্রতি অনুগত এমন সব লোকদের হাতে আর তারাই হবে ইবাদাতগৃহগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাহলে এ দুষ্কৃতিকারীরা সেখানে গেলেও কোন দুর্ভৰ্ম করার সাহস করবে না। কারণ তারা জানবে, সেখানে গিয়ে কোন দুর্ভৰ্ম করলে শান্তি পেতে হবে। এখানে মক্কার কাফেরদের যুনুমের প্রতিও সূচ্চ ইঁথিত করা হয়েছে। তাদের সিজেদের জাতির যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করতে বাধা দিয়েছিল।

১১৫. অর্থাৎ আল্লাহ পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। তিনি সকল দিকের ও সকল স্থানের মালিক। কিন্তু নিজে কোন স্থানের পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। কাজেই তাঁর ইবাদাতের জন্য কোন দিক বা স্থান নির্দিষ্ট করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেদিকে বা সে স্থানে

وَقَالُوا تَخْنَلَ اللَّهُ وَلَدًا سَبَحْنَهْ بِلَ لَمْ مَافِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ  
 كُلَّ لَهُ قَنِتُونَ<sup>১১৫</sup> بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى  
 أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ<sup>১১৬</sup> وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا  
 يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَاهِنَا أَيَّةً كَلِيلَكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ  
 قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قَلْوبُهُمْ قَدْ بَيْنَا الْأَيْمَنِ لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ<sup>১১৭</sup> إِنَّا  
 أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا<sup>১১৮</sup> وَلَا تَسْتَعْلَمْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيرِ<sup>১১৯</sup>

তারা বলে, আল্লাহ কাউকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ পৰিত্র এসব কথা থেকে। আসলে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসই তাঁর মালিকানাধীন, সবকিছুই তাঁর নির্দেশের অনুগত। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মঠ। তিনি যে বিষয়েরই সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে কেবলমাত্র হুমক দেন 'হও', তাহলেই তা হয়ে যায়।

অজ্ঞ লোকেরা বলে, আল্লাহ নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন অথবা কেন নিশানী আমাদের কাছে আসে না কেন<sup>১২১</sup> এদের আগের লোকেরাও এমনি ধারা কথা বলতো। এদের সবার (আগের ও পরের পথভঙ্গদের) মানসিকতা একই<sup>১২২</sup> দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আমরা নিশানীসমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছি।<sup>১২৩</sup> (এর চাইতে বড় নিশানী আর কি হতে পারে যে) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সত্য জ্ঞান সহকারে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।<sup>১২৪</sup> যারা জাহানামের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে তাদের জন্য তুমি দায়ী নও এবং তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

থাকেন। কাজেই ইতিপূর্বে তোমরা ওখানে বা ঐ দিকে ফিরে ইবাদাত করতে আর এখন সেই জায়গা বা দিক পরিবর্তন করলে কেন—একথা নিয়ে ঝগড়া বা বিতর্ক করার কোন স্বকাশ নেই।

১১৬. অর্ধাঁ মহান আল্লাহ সীমাবদ্ধ নন। তিনি সংকীর্ণ মন, সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ হাতের অধিকারী নন। অর্ধচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের মতো ভেবে এ রকম মনে করে রেখেছো। বরং তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব বিশাল-বিস্তৃত এবং তাঁর দৃষ্টিকোণ ও অনুগ্রহ দানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁর কোন্ বাস্তা কোথায় কোন্ সময় কি উদ্দেশ্যে তাঁকে শরণ করছে—একথা ও তিনি জানেন।

وَلَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَمُودُ وَلَا النَّصْرَى حَتَّىٰ تَتَبَعَ مِلْتَهْمِرْ قُلْ  
إِنَّ هُلْيَ اَللَّهِ هُوَ الْهَدِيٌّ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُرْ بَعْنَ الَّذِي  
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ «مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ» الَّذِي يَنْ  
أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاقِتِهِ اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِيرُونَ

ইহদি ও বৃষ্টানন্দ তোমার প্রতি কথনোই সত্ত্বে হবে না, যতক্ষণ না তুমি  
তাদের পথে চলতে থাকো।<sup>১২১</sup> পরিষ্কার বলে দাও, পথ মাত্র একটিই, যা আল্লাহ  
বাতনে দিয়েছেন। অন্যথায় তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপরও যদি তুমি  
তাদের ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে  
রক্ষাকারী তোমার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না। যদেরকে আমি কিভাব  
দিয়েছি তারা তাকে যথাযথভাবে পাঠ করে। তারা তার ওপর সাক্ষা দিলে ঈমান  
আনে। আর যারা তার সাথে কুফরীর নীতি অবস্থন করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।

১১৭. তারা বলতে চাচ্ছিল, আল্লাহ নিজে তাদের সামনে এসে বলবেন : এই ধরো  
আমার কিভাব আর এ আমার বিধান, তোমরা এর অনুসারী হও। অথবা তাদেরকে এমন  
কোন নিশানী দেখানো হবে যা দেখে তারা নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস করতে পারবে যে,  
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলছেন।

১১৮. অর্থাৎ আজকের পথভ্রষ্টরা এমন কোন অভিযোগ ও দাবী উত্থাপন করেনি, যা  
এর আগে পথভ্রষ্টরা করেনি। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পথভ্রষ্টার প্রকৃতি  
অপরিবর্তিত রয়েছে। বার বার একই ধরনের সংশয়, সন্দেহ, অভিযোগ ও প্রশ্নের  
পুনরাবৃত্তি সে করে চলছে।

১১৯. “আল্লাহ নিজে এসে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন?”—এ অভিযোগটি  
এতবেশী অর্থহীন ছিল যে, এর জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের নিশানী দেখানো  
হয় না কেন?—শুধুমাত্র এ প্রশ্নটির জবাব দেয়া হয়েছে। এর জবাবে বলা হয়েছে, নিশানী  
তো রয়েছে অসংখ্য কিন্তু যে ব্যক্তি মানতেই চায় না তাকে কোনু নিশানীটা দেখানো যায়?

১২০. অর্থাৎ অন্যান্য নিশানী আর কি দেখবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লামের নিজের ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে ধৰ্ম ও উজ্জ্বল নিশানী। তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বের  
অবস্থা, যে দেশের ও জাতির মধ্যে তাঁর জন্য হয়েছিল তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে  
তিনি লালিত-পালিত হন ও চার্লিং বছর জীবন যাপন করেন তারপর নবুওয়াত লাভ করে

يَبْنِي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي  
فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ⑩

১৫ রক্তু'

হে বনী ২৩ ইসরাইল! তোমাদের আমি যে নিয়ামত দান করেছিলাম এবং  
বিশ্বের জাতিদের ওপর তোমাদের যে শেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম তার কথা শুরণ  
করো।

মহান ও বিশ্বকর কার্যাবলী সম্পাদন করেন—এসব কিছুই এমন একটি উজ্জ্বল নিশানী  
হিসেবে টিকিত যে, এর পরে আর কোন নিশানীর প্রয়োজনই হয় না।

১২১. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের অস্তুষ্টির কারণ এ নয় যে, তারা যথার্থই সত্যসন্ধানী  
এবং তুমি সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরোনি। বরং তোমার প্রতি তাদের  
অস্তুষ্টির কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর দীনের সাথে তাদের  
মতো মুনাফিকসূলত ও প্রতারণামূলক আচরণ করছো না কেন? আল্লাহ-পূজার ছদ্মবেশে  
তারা যেমন আত্মপূজা করে যাচ্ছে তুমি তেমন করছো না কেন? দীনের মূলনীতি ও  
বিধানসমূহের নিজের চিন্তা-ধারণা-কল্পনা এবং নিজের ইচ্ছা-কামনা-বাসনা অনুযায়ী  
পরিবর্তিত করার ব্যাপারে তাদের মতো দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছো না কেন? তাদের  
মতো প্রদর্শনীমূলক আচরণ, ছল-চাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছো না কেন? কাজেই  
তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা হেঢ়ে দাও। কারণ যতদিন তুমি নিজে তাদের রঙে রঞ্জিত  
হয়ে তাদের স্বত্বাব আচরণ গ্রহণ করবে না, নিজেদের ধর্মের সাথে তারা যে আচরণ করে  
যতদিন তুমি তোমার দীনের সাথে অনুরূপ আচরণ করবে না এবং যতদিন তুমি ধর্মীয়  
আকীনা-বিশ্বাস ও কর্মের ব্যাপারে তাদের মতো ভট্টনীতি অবলম্বন করবে না, ততদিন  
পর্যন্ত তারা কোনক্রমেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

১২২. এখানে আহ্লি কিতাবদের অস্তরগত সংলোকনের প্রতি ইঁথগিত করা হয়েছে।  
তারা সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে আল্লাহর কিতাব পড়ে। তাই আল্লাহর কিতাবের  
দৃষ্টিতে যা সত্য তাকেই তারা সত্য বলে মেনে নেয়।

১২৩. এখান থেকে আর একটি ধারাবাহিক ভাষণ শুরু হচ্ছে। এখানে পরিবেশিত  
বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন।

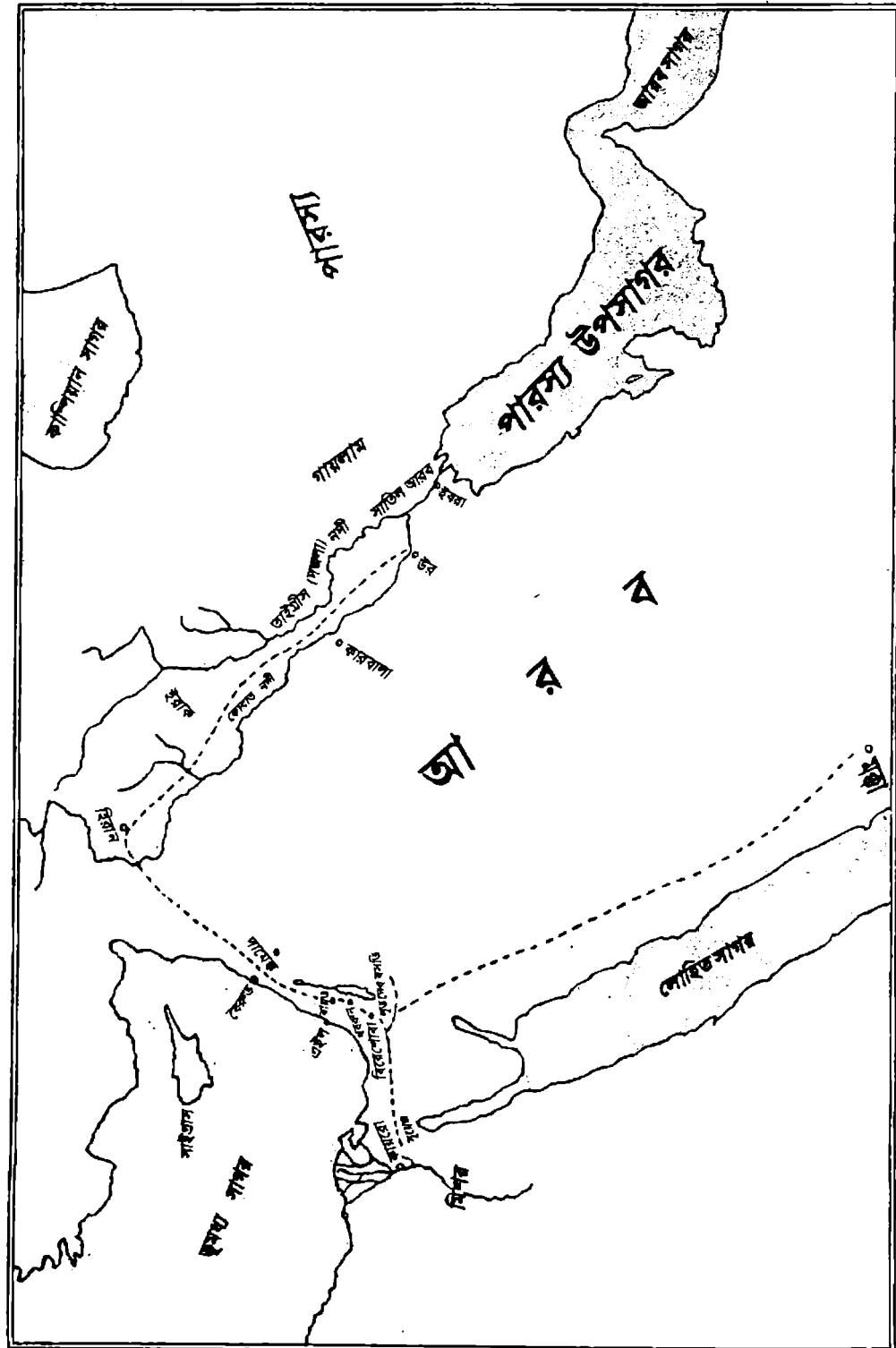
এক : হ্যরত নূহের পরে হ্যরত ইবরাহিম প্রথম বিশ্বজনীন নবী। মহান আল্লাহ তাঁকে  
ইসলামের বিশ্বজনীন দাওয়াত ছড়াবার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথমে তিনি নিজে  
সশরীরে ইরাক থেকে মিসর পর্যন্ত এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তীন থেকে নিয়ে আরবের মরু  
অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান পর্যন্ত বছরের পর বছর সফর করে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের  
(অর্থাৎ ইসলাম) দিকে আহবান করতে থাকেন। অতপর এই মিশন সর্বত্র পৌছিয়ে দেয়ার  
লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। পূর্ব জর্ডানে নিজের ভাতিজা হ্যরত লৃতকে

নিযুক্ত করেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে নিযুক্ত করেন নিজের ছেলে হযরত ইসহাককে এবং আরবের অভ্যন্তরে নিযুক্ত করেন নিজের বড় ছেলে হযরত ইসমাঈলকে। তারপর মহান আল্লাহর নির্দেশে মকায় কা'বাগৃহ নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মতো এটিকেই এই মিশনের কেন্দ্র গণ্য করেন।

দুই : হযরত ইবরাহীমের বংশধারা দু'টি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা হচ্ছে, হযরত ইসমাঈলের সন্তান-সন্ততিবর্গ। এরা আরবে বসবাস করতো। কুরাইশ ও আরবের আরো কতিপয় গোত্র এরি অন্তরভুক্ত ছিল। আর যেসব আরব গোত্র বংশগত দিক দিয়ে হযরত ইসমাঈলের সন্তান ছিল না তারাও তাঁর প্রচারিত ধর্মে কমবেশী প্রভাবিত ছিল বলেই তাঁর সাথেই নিজেদের সম্পর্ক জুড়তো। দ্বিতীয় শাখাটি ছিল হযরত ইসহাকের সন্তানবর্গের। এই শাখায় হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত ইয়াহিয়া, হযরত দুসা প্রমুখ অসংখ্য নবী জনগ্রহণ করেন। আর ইতিপূর্বে বলেছি, যেহেতু হযরত ইয়াকুবের আর এক নাম ছিল ইসরাইল, তাই তাঁর বংশ বনী ইসরাইল নামে পরিচিত হয়। তাঁর প্রচার অভিযানের ফলে যেসব জাতি তাঁর দীন গ্রহণ করে তারা তার মধ্যে নিজেদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত করে দেয় অথবা তারা বংশগতভাবে তাদের থেকে আলাদা থাকলেও ধর্মীয়ভাবে তাদের অনুসারী থাকে। এই শাখায় অবনতি ও অধিপতন সূচিত হলে প্রথমে ইহুদিবাদ ও পরে খৃষ্টবাদের উদ্ভব হয়।

তিনি : হযরত ইবরাহীমের আসল কাজি ছিল সমগ্র দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহবান জানানো এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা পরিশুল্ক ও সংশোধিত করে গড়ে তোলা। তিনি নিজে ছিলেন আল্লাহর অনুগত। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান অনুযায়ী নিজের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার পরিচালনা করতেন সারা দুনিয়ায় এই জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটাতেন এবং চেষ্টা করতেন যাতে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভুর অনুগত হয়ে এ দুনিয়ায় জীবন যাপন করে। এই মহান ও বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে তাঁকে বিশ্বনেতার পদে অভিযুক্ত করা হয়। তারপর তাঁর বংশধারা থেকে যে শাখাটি বের হয়ে হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের নামে অগ্রসর হয়ে বনী ইসরাইল নাম ধারণ করে সেই শাখাটি তার এ নেতৃত্বের উত্তরাধিকার লাভ করে। এই শাখায় নবীদের জন্ম হতে থাকে এবং এদেরকেই সত্য-সঠিক পথের জ্ঞানদান করা হয়। বিশ্বের জাতিসমূহকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব এদের ওপর সোপন্দ করা হয়। এটি ছিল আল্লাহর মহান অনুগ্রহ ও নিয়ামত। মহান আল্লাহ এ বংশের লোকদেরকে তাই একথা বার বার শ্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এ শাখাটি হযরত সুলাইমানের আমলে বাইতুল মাকদিসকে নিজেদের কেন্দ্র গণ্য করে। তাই যতদিন পর্যন্ত এ শাখাটি নেতৃত্বের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিল ততদিন পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসই ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহ—মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র।

চার : পেছনের দশটি রূক্তে মহান আল্লাহ বনী ইসরাইলকে সংযোধন করে তাদের ঐতিহাসিক অগ্রাধসমূহ এবং কুরআন নাফিল হবার সময়ে তাদের যে অবস্থা ছিল তা হ্বহ বর্ণনা করেছেন। এ সংগে তাদেরকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার নিয়ামতের চরম অর্থাদা করেছো। তোমরা কেবল নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকোনি বরং নিজেরাও সত্য ও সততার পথ পরিহার করেছো। আর এখন



হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের পথ

তোমাদের একটি ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী ছাড়া তোমাদের সমগ্র দলের মধ্যে আর কোন যোগ্যতা অবশিষ্ট নেই।

পাঁচ : অতপর এখন তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, বিশ্বানবতার নেতৃত্ব ইবরাহীমের বৎশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নয়। বরং নবী ইবরাহীম নিজে যে নিকল্য আনুগত্যের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়েছিলেন এটি হচ্ছে তারাই ফসল। যারা ইবরাহীমের পথে নিজেরা চলে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে চালাবার দায়িত্ব পালন করে একমাত্র তারাই এই নেতৃত্বের যোগ্যতা লাভ করতে পারে। যেহেতু তোমরা এ পথ থেকে সরে গেছে এবং এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছো তাই নেতৃত্বের পদ থেকে তোমাদের অপসারিত করা হচ্ছে।

ছয় : সংগে সংগে ইশারা-ইংগিতে একথাও বলে দেয়া হচ্ছে, যেসব অইসরাইলী জাতি মূসা ও ঈস্মা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে নিজেদের সম্পর্ক জুড়েছিল তারাও ইবরাহীমের পথ থেকে সরে গেছে। এই সংগে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আরবের মুশরিকরাও ইবরাহীম ও ইসমাইলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক রয়েছে বলে গর্ব করে বেড়ায় কিন্তু তারা আসলে নিজেদের বৎশ ও গোত্রের অহংকারে মত হয়ে পড়েছে। ইবরাহীম ও ইসমাইলের পথের সাথে এখন তাদের দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। কাজেই তাদের কেউই বিশ্বনেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না।

সাত : আবার একথাও বলা হচ্ছে, এখন আমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বৎশের দ্বিতীয় শাখা বনী ইসমাইলের মধ্যে এমন এক নবীর জন্ম দিয়েছি যার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাইল উভয়েই দোয়া করেছিলেন। ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও অন্যান্য সকল নবী যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তিনিও সেই একই পথ অবলম্বন করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় যত নবী ও রসূল এসেছেন তিনি ও তাঁর অনুসারীরা তাদের সবাইকে সত্যনবী বলে স্বীকার করেন। সকল নবী বিশ্ববাসীকে যে পথের দিকে আহবান জানিয়েছেন তিনি ও তাঁর অনুসারীগণও মানুষকে সেদিকে আহবান জানান। কাজেই যারা এ নবীর অনুসরণ করে এখন একমাত্র তারাই বিশ্বানবতার নেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার রাখে।

আট : নেতৃত্ব পরিবর্তনের ঘোষণার সাথে সাথেই স্বাভাবিকভাবেই কিবলাহ পরিবর্তনের ঘোষণা হওয়াও জরুরী ছিল। যতদিন বনী ইসরাইলদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন বাইতুল মাকদিস ছিল ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্র এবং সেটিই ছিল সত্যপন্থীদের কিবলাহ। শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীগণও ততদিন বাইতুল মাকদিসকেই তাঁদের কিবলাহ বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাইলকে এ পদ থেকে যথারীতি অপসারিত করার পর বাইতুল মাকদিসের কেন্দ্রীয় শুরুত্ব আপনা-আপনি খতম হয়ে গেল। কাজেই ঘোষণা করে দেয়া হলো, যেখান থেকে এ শেষ নবীর দাওয়াতের সূচনা হয়েছে সেই স্থানটিই হবে এখন আল্লাহর দীনের কেন্দ্র। আর যেহেতু শুরুতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতের কেন্দ্রণি এখানে ছিল তাই আহলি কিতাব ও মুশরিকদের জন্যও এ স্থানটির অর্থাৎ কা'বার কেন্দ্র হবার সর্বাধিক অধিকারের দাবী স্বীকার করে নেয়া ছাড়া গত্যত্ব নেই। অবশি

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزُّ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا  
عَذَابٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝ وَإِذْ أَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ  
رَبَّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۝ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۝ قَالَ  
وَمَنْ ذَرَبَتِي ۝ قَالَ لَا يَنْأِي عَمَدِي الظَّلَمِينَ ۝

আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারোর থেকে ফিদিয়া (বিনিময়) গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ মানুষের জন্য লাভজনক হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও কোন সাহায্য পাবে না।

শ্রবণ করো যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন<sup>১</sup> ১২৪ এবং সেসব পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উত্তরে গেলো, তখন তিনি বললেন : “আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতার পদে অধিষ্ঠিত করবো।” ইবরাহীম বললো : “আর আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অংগীকার ?” জবাব দিলেন : “আমার এ অংগীকার যালেমদের ব্যাপারে নয়।”<sup>২</sup> ১২৫

হঠধর্মীদের কথা আলাদা। তারা সত্যকে সত্য জেনেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ আনতে থাকে।

নয় : উচ্চাতে মুহাম্মাদীয়ার নেতৃত্ব ও কা'বার কেন্দ্র হবার কথা ঘোষণা করার পরই মহান আল্লাহ ১৯ রাম্ভ<sup>৩</sup> থেকে সূরা বাকারাহ শেষ পর্যন্ত আলোচনায় ধারাবাহিক হেদায়াতের মাধ্যমে এ উচ্চাতের জীবন গঠন ও জীবন পরিচালনার জন্য বিধান দান করেছেন।

১২৪. যেসব কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁকে বিশ্বানবতার নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করার যোগ্য প্রমাণ করেছিলেন কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সত্যের আলো তাঁর সামনে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমগ্র জীবন ছিল কুরবানী ও ত্যাগের মৃত্যু প্রতীক। দুনিয়ার যেসব কষ্টকে মানুষ ভালোবাসতে পারে এমন প্রতিটি কষ্টকে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সত্যের জন্য কুরবানী করেছিলেন। দুনিয়ার যে সমস্ত বিপদকে মানুষ ভয় করে সত্যের খাতিরে তার প্রত্যেকটিকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন।

১২৫. অর্ধাং এই অংগীকারটি তোমার সন্তানদের কেবলমাত্র সেই অংশটির সাথে সম্পর্কিত যারা সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল। তাদের মধ্য থেকে যারা যালেম তাদের জন্য এ অংগীকার নয়। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, পথন্দৰ্শ ইহদিরা ও মুশরিক বনী ইসরাইলরা এ অংগীকারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَّا ۖ وَاتْخَذْنَا مِنْهُ مَقَامًا  
 إِبْرَاهِيمَ وَعَمِّدْنَا إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَ أَبَيْتَ  
 لِلطَّائِفَيْنَ وَالْعَكِيْفَيْنَ وَالرَّكِيعَ السُّجُودِ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ  
 اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرَتِ مَنْ أَمَّنْهُ  
 بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ قَالَ وَمَنْ كَفَرْ فَامْتَعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إِلَى  
 عَلَابِ النَّارِ ۝ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

আর শ্বরণ করো তখনকার কথা যখন আমি এই গৃহকে (কা'বা) লোকদের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল গণ্য করেছিলাম এবং ইবরাহীম যেখানে ইবাদাত করার জন্য দাঁড়ায় সে স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাযের হানে পরিণত করার হকুম দিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসমাইলকে তাকীদ করে বলেছিলাম, আমার এই গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রূক্ক'-সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখো। ১২৬

আর এও শ্বরণ করো যে, ইবরাহীম দোয়া করেছিল : “হে আমার রব! এই শহরকে শাস্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও! আর এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আগ্নাহ ও আখ্রেরাতকে মানবে তাদেরকে সব রকমের ফলের আহার্য দান করো!” জবাবে তার রব বললেন : “আর যে মানবে না, দুনিয়ার গুটিকয় দিনের জীবনের সামগ্রী আমি তাকেও দেবো। ১২৭ কিন্তু সব শেষে তাকে জাহানামের আঘাবের মধ্যে নিষ্কেপ করবো এবং সেটি নিকুঠিতম আবাস।”

১২৬. পাক-পবিত্র রাখার অর্থ কেবলমাত্র ময়লা-আবর্জনা থেকে পাক-পবিত্র রাখা নয়। আগ্নাহের ঘরের আসল পবিত্রতা হচ্ছে এই যে, সেখানে আগ্নাহের ছাড়া আর কারোর নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আগ্নাহের ঘরে বসে আগ্নাহ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভু, মাবুদ, অত্তাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্ববণকারী হিসেবে ডাকে, সে আসলে তাকে নাপাক ও অপবিত্র করে দিয়েছে। এ আয়াতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে কুরাইশ মুশরিকদের অপরাধসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : এ যালেমরা ইবরাহীম ও ইসমাইলের উত্তরাধিকারী হবার জন্য গর্ব করে বেড়ায় কিন্তু উত্তরাধিকারের হক আদায় করার পরিবর্তে এরা উল্টো সেই হককে পদদলিত করে যাচ্ছে। কাজেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে যে অংগীকার করা হয়েছিল তা থেকে বনী ইসরাইলরা যেমন বাদ পড়েছে তেমনি এই ইসমাইলী মুশরিকরাও বাদ পড়ে গেছে।

وَإِذْ يُرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبْنَا تَقْبِلُ مِنَكَ  
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ<sup>১১</sup> رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ  
 ذِرِيتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ  
 التَّوَابُ الرَّحِيمُ<sup>১২</sup> رَبُّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ  
 أَيْتِكَ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيَزْكِيرُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ  
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ<sup>১৩</sup>

আর অরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাইল যখন এই গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তারা দোয়া করে বলছিল : "হে আমাদের রব! আমাদের এই বিদ্যমত কুরুল করে নাও। তুমি সবকিছু শ্রবণকারী ও সবকিছু জ্ঞাত। হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার মুসলিম (নির্দেশের অনুগত) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম। তোমার ইবাদাতের পদ্ধতি আমাদের বলে দাও এবং আমাদের ভুলচুক মাফ করে দাও। তুমি বড়ই শ্রমাশীল ও অনুগ্রহকারী। হে আমাদের রব। এদের মধ্যে স্বয়ং এদের জাতি পরিসর থেকে এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি এদেরকে তোমার আয়ত পাঠ করে শুনাবেন, এদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং এদের জীবন পরিশুল্ক করে সুসজ্জিত করবেন।"<sup>১৪</sup> অবশ্যি তুমি বড়ই প্রতিপত্তিশাস্ত্রী ও জ্ঞানবান।<sup>১৫</sup>

১২৭. হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন মানব জাতির নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহকে জিজেস করেছিলেন জবাবে তাঁকে বলা হয়েছিল, তোমার স্তুতান্দের মধ্য থেকে একমাত্র মু'মিন ও সত্যনিষ্ঠরাই এ পদের অধিকারী হবে। জালেমদেরকে এর অধিকারী করা হবে না। অতপর হ্যরত ইবরাহীম যখন রিযিকের জন্য দোয়া করতে লাগলেন তখন আগের ফরমানটিকে সামনে রেখে তিনি কেবলমাত্র নিজের মু'মিন স্তুতান ও বংশধরদের জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ জবাবে সংগে সংগেই তার ভুল ধারণা দূর করে দিলেন এবং তাঁকে জানিয়ে দিলেন, সত্যনিষ্ঠ নেতৃত্ব এক কথা আর রিযিক ও আহার্য দান করা অন্য কথা। সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল মু'মিনরাই একমাত্র সত্যনিষ্ঠ নিত্যের অধিকারী হবে। কিন্তু দুনিয়ার রিযিক ও আহার্য মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে দেয়া হবে। এ থেকে একথা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাত হয় যে, কারোর অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য দেখে যেন কেউ এ ধারণা না করে বসেন যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সে-ই নেতৃত্ব-যোগ্যতারও অধিকারী।

وَمَن يُرْغَبُ عَنِ مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ  
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ⑩  
أَسْلَمَ رَجُلٌ أَسْلَمَتْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑪ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بْنَيْهِ  
وَيَعْقُوبَ طَبَّيْنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ  
مُسْلِمُونَ ⑫

## ১৬ রংকু'

এখন কে ইবরাহীমের পদ্ধতিকে ঘৃণা করবে? হাঁ, যে নিজেকে মূর্খতা ও নির্বৃক্ষিতায় আচ্ছন্ন করেছে সে ছাড়া আর কে এ কাজ করতে পারে? ইবরাহীমকে তো আমি দুনিয়ায় নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলাম আর আখেরাতে সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে। তার অবস্থা এই ছিল যে, যখন তার রব তাকে বললো, “মুসলিম হয়ে যাও।”<sup>১৩০</sup> তখনই সে বলে উঠলো, “আমি বিশ্ব-জাহানের প্রভুর ‘মুসলিম’ হয়ে গেলাম।” এই একই পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল এবং এরি উপদেশ দিয়েছিল ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে।<sup>১৩১</sup> সে বলেছিল, “আমার সন্তানেরা! আগ্নাহ তোমাদের জন্য এই দীনটিই পছন্দ করেছেন।<sup>১৩২</sup> কাজেই আমৃত্যু তোমরা মুসলিম থেকো।”

১২৮. জীবন পরিশুল্ক করে সুসংজ্ঞিত করা বলতে চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, চরিত্র-নৈতিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাকার সবকিছুকেই সুসংজ্ঞিত করা বুঝাচ্ছে।

১২৯. অর্থাৎ মুহাম্মদ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সানামের আবির্ভাব আসলে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার জওয়াব—একথাই এখানে বলা হয়েছে।

১৩০. মুসলিম কাকে বলে? যে ব্যক্তি আগ্নাহের অনুগত হয়, আগ্নাহকে নিজের মালিক, প্রভু ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেয়, নিজেকে পুরোপুরি আগ্নাহের হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং দুনিয়ায় আগ্নাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে সে—ই মুসলিম। এ আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির নাম ‘ইসলাম’ মানব জাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব নবী এসেছেন এটিই ছিল তাঁদের সবার দীন ও জীবন বিধান।

১৩১. বনী ইসরাইল সরাসরি হ্যরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর হ্বার কারণেই সরাসরি তাঁর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

أَمْ كُنْتُمْ شَهِلَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ  
 مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ الْمَكَّ وَاللهَ أَبْأَلَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ  
 اسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْ خَلَتْ ۝  
 ۝ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۝ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিছিল? মৃত্যুকালে সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলো : “আমার পর তোমরা কার বন্দেগী করবে?” তারা সবাই জবাব দিল : “আমরা সেই এক আল্লাহর বন্দেগী করবো, যাকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাক ইলাহ হিসেবে মেনে এসেছেন আর আমরা তাঁরই অনুগত—মুসলিম।”<sup>৩৩</sup>

এরা ছিল কিছু লোক। এরা তো অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই আর তোমরা যা উপার্জন করবে, তা তোমাদের জন্য। তারা কি করতো সে কথা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।<sup>৩৪</sup>

১৩২. ‘দীন’ অর্থাৎ জীবন পদ্ধতি ও জীবন বিধান। মানুষ দুনিয়ায় যে আইন ও নীতিমালার ভিত্তিতে তার সমগ্র চিত্তা, দর্শন ও কর্মনীতি গড়ে তোলে তাকেই বলা হয় ‘দীন’।

১৩৩. বাইবেলে হ্যরত ইয়াকুবের (আ) মৃত্যুকালীন অবস্থার বিত্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে এই উপদেশের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে তালমূদে যে বিষ্টারিত উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে তার বিষয়বস্তু কুরআনের এ বর্ণনার সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যশীল। সেখানে আমরা হ্যরত ইয়াকুবের (আ) একথাণ্ডো পাই :

“সদাপ্রতু আল্লাহর বন্দেগী করতে থাকো। তিনি তোমাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে বিপদ থেকে বাঁচাবেন যেমন বাঁচিয়েছেন তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে।.....তোমাদের সন্তানদের আল্লাহকে ডালোবাসতে এবং তাঁর হকুম পালন করতে শেখাও। এতে তাদের জীবনের অবকাশ দীর্ঘ হবে। কারণ আল্লাহ তাদেরকে হেফায়ত করেন যারা সত্যনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে এবং তাঁর পথে ঠিকমতো চলে।” জবাবে তাঁর ছেলেরা বলেন : “আপনার উপদেশ মতো আমরা কাজ করবো। আল্লাহ আমাদের সাথে থাকুন।” একথা শনে হ্যরত ইয়াকুব (আ) বলেন : “যদি তোমরা আল্লাহর পথ থেকে ডাইনে বাঁয়ে না ঘুরে যাও, তাহলে আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের সাথে থাকবেন।”

১৩৪. অর্থাৎ যদিও তোমরা তাদেরই সন্তান তবুও প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে তোমাদের কোন যোগাযোগ নেই। তোমরা তাদের পথ থেকেই যখন সরে গিয়েছো তখন তাদের নাম

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَلُوا إِقْلِيلًا مِّنْهُمْ حَنِيفًا  
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُولُوا امْنَابِ اللَّهِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْ  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى  
وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رِبْمَةٍ لَا فِرقَ بَيْنَ أَهْلِ مِنْهُمْ ۝  
وَنَحْنُ لِهِ مُسْلِمُونَ ۝

ইহদিরা বলে, “ইহদি হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পেয়ে যাবে।” খৃষ্টানরা বলে, “খৃষ্টান হয়ে যাও, তা হলে হিদায়াত লাভ করতে পারবে।” ওদেরকে বলে দাও, “না, তা নয়; বরং এ সবকিছু ছেড়ে একমাত্র ইবরাহীমের পদ্ধতি অবলম্বন করো। আর ইবরাহীম মুশরিকদের অস্তরভুক্ত ছিল না।”<sup>১৩৫</sup> হে মুসলমানরা! তোমরা বলো, “আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যে হিদায়াত আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি নাযিল হয়েছিল তার প্রতি, আর যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তার প্রতি। তাদের কারোর মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না।”<sup>১৩৬</sup> আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত মুসলিম।”

নেয়ার তোমাদের কি অধিকার আছে? আল্লাহর ওখানে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তোমাদের বাপ-দাদারা কি করতো? বরং জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি করেছো?

আর “তারা যা কিছু উপার্জন করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই আর তোমরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের জন” — এ বর্ণনাভঙ্গীটি কুরআনের একান্ত বিজ্ঞপ্তি। আমরা যে জিনিসটিকে কাজ বা আমল বলি কুরআন নিজের ভাষায় তাকে বলে উপার্জন বা রোজগার। আমাদের প্রত্যেকটি আমলের একটি ভালো বা মন্দ ফলাফল আছে। আল্লাহর সতুষ্টি বা অসতুষ্টির আকারে এর প্রকাশ ঘটবে। এ ফলাফলই হচ্ছে আমাদের উপার্জন। যেহেতু কুরআনের দৃষ্টিতে এ ফলাফলই মূল গুরুত্বের অধিকারী তাই সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কাজকে ‘আমল’ ও ‘কাজ’ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত না করে তাকে ‘উপার্জন’ শব্দ দিয়ে সূষ্পষ্ট করা হয়েছে।

১৩৫. এ জবাবটির রসাদ্বাদন করতে হলে দু'টি বিষয় সামনে রাখতে হবে :

এক : ইহদিবাদ ও খৃষ্টবাদ উভয়ই পরবর্তীকালের ফসল। ইহদিবাদের সুষ্টি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে। তখনই ‘ইহদিবাদ’ তার এ নাম, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও রীতি-পদ্ধতি সহকারে আত্মপ্রকাশ করে। আর যেসব বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার

فَإِنْ أَمْنَوْا بِمِثْلِ مَا أَمْتَرْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَ وَإِنْ تَوْلُوا فَإِنَّمَا هُرِفَ فِي  
شِقَاقٍ فَسَيَكْفِي كُمَرَ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ  
أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ مِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبْدُونَ قُلْ أَتَحَاجُونَا فِي اللَّهِ  
وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

তোমরা যেমনি ঈমান এনেছো তারাও যদি ঠিক তেমনিভাবে ঈমান আনে, তাহলে তারা হিদ্যাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলতে হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সোজা কথায় বলা যায়, তারা হঠধর্মিতার পথ অবলম্বন করেছে। কাজেই নিশ্চিত হয়ে যাও, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সহায়তার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

বলো : “আল্লাহর রঙ ধারণ করো।<sup>১৩৭</sup> আর কার রঙ তার চেয়ে ভালো? আমরা তো তাঁরই ইবাদাতকারী।”

হে নবী! এদেরকে বলে দাও : “তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের সাথে বক্তব্য করছো? অথচ তিনিই আমাদের রব এবং তোমাদেরও।<sup>১৩৮</sup> আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আর আমরা নিজেদের ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করেছি।<sup>১৩৯</sup>

সমষ্টি খৃষ্টবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে তার অভূদয় ঘটেছে হ্যরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামেরও বেশ কিছুকাল পরে। এখানে স্বত্কৃতভাবে একটি প্রশ্ন জেগে উঠে। যদি ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ গ্রহণ করাই হিদ্যায়াত লাভের ভিত্তি হয়ে থাকে, তাহলে এ ধর্মগুলোর উদ্ভবের শত শত বছর আগে জন্মগ্রহণকারী হ্যরত ইবরাহীম (আ), অন্যান্য নবীগণ ও সৎব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে ইহুদি ও খৃষ্টানরা নিজেরাই হিদ্যায়তপ্রাপ্ত বলে শীকার করে, তারা কোথায় থেকে হিদ্যায়াত পেতেন? নিসদেহে বলা যায়, তাদের হিদ্যাতের উৎস ‘ইহুদিবাদ’ ও ‘খৃষ্টবাদ’ ছিল না। কাজেই একথা সুন্পট, যেসব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ইহুদি, খৃষ্টান ইত্যাদি সম্পদ্যাত্মকালোর উদ্ভব হয়েছে যানুমের হিদ্যায়াত লাভ এদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং যে বিশ্বব্যাপী চিরস্তন সহজ-সত্ত পথ গ্রহণ করে যানুষ যুগে যুগে হিদ্যায়াত লাভ করে এসেছে তাঁরই ওপর এটি নির্ভরশীল।

দুই : ইহুদি ও খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থগুলোই হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত-বন্দেগী, উপাসনা-আরাধনা, প্রশংসন-কীর্তন ও আনুগত্য না করার সাক্ষ প্রদান করে। আল্লাহর শুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর কাউকে শরীক না করাই ছিল তাঁর মিশন। কাজেই নিসদেহে বলা যায়, হ্যরত

১০ " ইবরাহীম (আ) যে চিরন্তন সত্য-সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ তা থেকে সরে গিয়েছিল। কারণ এদের উভয়ের মধ্যেই শিরকের মিশ্রণ ঘটেছিল।

১৩৬. নবীদের মধ্যে পার্থক্য না করার অর্থ হচ্ছে, কেউ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কেউ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না অথবা কাউকে মানি এবং কাউকে মানি না—আমরা তাদের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করি না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল নবীই একই চিরন্তন সত্য ও একই সরল-সোজা পথের দিকে আহবান জানিয়েছেন। কাজেই যথার্থ সত্যগ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সকল নবীকে সত্যপন্থী ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্তত্ত্ব নেই। যে ব্যক্তি এক নবীকে মানে এবং অন্য নবীকে অস্বীকার করে, সে আসলে যে নবীকে মানে তারও অনুগামী নয়। কারণ হযরত মুসা (আ), হযরত ইস্মাইল (আ) ও অন্যান্য নবীগণ যে বিশ্বাপী চিরন্তন সহজ-সত্য পথ দেখিয়েছিলেন সে আসলে তার সন্ধান পায়নি বরং সে নিছক বাপ-দাদার অনুসরণ করে একজন নবীকে মানছে। তার আসল ধর্ম হচ্ছে, বর্ণবাদ, বৃহৎবাদ ও বাপ-দাদার অক্ষ অনুসরণ। কোন নবীর অনুসরণ তার ধর্ম নয়।

১৩৭. এ আয়াতটির দু'টি অনুবাদ হতে পারে। এক : আমরা আল্লাহর রং ধারণ করেছি। দুই : আল্লাহর রং ধারণ করো। খৃষ্ট ধর্মের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইহুদিদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। কেউ তাদের ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হতো। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিল, তার সমস্ত গোনাহ যেন ধূয়ে গোলো এবং তার জীবন নতুন রং ধারণ করলো। পরবর্তীকালে খৃষ্টানদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ওখানে এর পারিভাষিক নাম হচ্ছে ইসতিবাগ বা রঙ্গীন করা (ব্যাপটিজম)। তাদের ধর্মে যারা প্রবেশ করে কেবল তাদেরকেই ব্যাপটাইজড বা খৃষ্ট ধর্মে রঞ্জিত করা হয় না বরং খৃষ্টান শিশুদেরকেও ব্যাপটাইজড করা হয়। এ ব্যাপারেই কুরআন বলছে, এ লোকাচারমূলক 'রঞ্জিত' হবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও। যা কোন পানির দ্বারা হওয়া যায় না। বরং তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে এ রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়।

১৩৮. অর্থাৎ আমরাও তো এই একই কথাই বলি, আল্লাহ আমাদের সবার রব এবং তোমাই আনুগত্য করতে হবে। এটা কি এমন একটা বিষয়, যা নিয়ে তোমরা আমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারো? ঝগড়া যদি করতে হয় তাহলে তা আমরা করতে পারি, তোমরা নও। কারণ তোমরাই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করছো এবং তার বন্দেগী করছো। আমরা এ কাজ করছি না।

**اتْحاجُونَنَا فِي اللّٰهِ** ব্যক্তিটি আর একটি অনুবাদ হতে পারে : “আমাদের সাথে তোমাদের ঝগড়াটি কি আল্লাহর পথে?” এর অর্থ এই হবে, যদি তোমরা সভিই লালসার বশবর্তী না হয়ে বরং আল্লাহর জন্য ঝগড়া করে থাকো, তাহলে অতি সহজেই এর শীমাংশা করা যেতে পারে।

১৩৯. তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী আর আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী। তোমরা যদি তোমাদের বন্দেগীকে বিভক্ত করে থাকো এবং অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করো, তাহলে তোমাদের তা করার ক্ষমতা

أَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا  
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ بِإِيمَانِ اللَّهِ مَنْ مِنْ أَنْفُسِ الْأَنْفُسِ مِنْ كَثِيرٍ شَهَادَةً  
عِنْدَهُمْ لَا مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ⑯١٥٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَقْتَ  
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۝ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑯١٥١

অথবা তোমরা কি এক ” বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব-সন্তানরা সাই ইহুদি বা খ্ষ্টোন ছিল ” বলো, ”তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন । ১৫০ তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ রয়েছে এবং সে তা গোপন করে চলে? তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহ গাফেল নন । ১৫১

তারা ছিল কিছু লোক। তারা আজ আর নেই। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল তা ছিল তাদের নিজেদের জন্য। আর তোমরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের জন্য তাদের কাজের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিঞ্জেস করা হবে না।”

দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরিণাম তোমাদের ভোগ করতে হবে। আমরা বলপূর্বক তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাই না। কিন্তু আমরা নিজেদের বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনা-আরাধনা সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যদি তোমরা একথা স্বীকার করে নাও যে, আমাদেরও এ কাজ করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহলে তো বাগড়াই মিটে যায়।

১৪০. যেসব মূর্খ ইহুদি ও খ্ষ্টোন জনতা যথার্থেই মনে করতো, এ বড় বড় মহান নবীদের সকলেই ইহুদি বা খ্ষ্টোন ছিলেন, তাদেরকে সংশোধন করে এখানে একথা বলা হয়েছে।

১৪১. এখানে ইহুদি ও খ্ষ্টোন আলেমদেরকে সংশোধন করা হয়েছে। তারা নিজেরাও এ সত্যটি জানতো যে, ইহুদিবাদ ও খ্ষ্টোবাদ সে সময় যে বৈশিষ্ট ও চেহারাসহ বিরাজ করছিল তা অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সত্যকে একমাত্র তাদের নিজেদের সম্পদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করছিল। তারা জনগণকে ভুল ধারণা দিয়ে আসছিল যে, নবীদের অতিক্রান্ত হয়ে যাবার দীর্ঘকাল পর তাদের ফকীহ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ ও সুফীরা যে সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস, পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও ইজতিহাদী নিয়ম-কানুন রচনা করেছে, সেগুলোর আনুগত্যের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ ও মৃক্তি নিহিত রয়েছে। সংগঠিত আলেমদেরকে জিঞ্জেস করা হতো, তোমাদের একথাই যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে হয়রত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইত্যাদি নবীগণ তোমাদের এই সম্পদায়গুলোর মধ্যে

سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَمْ يَرَوْا  
 كَانُوا عَلَيْهَا دُقْلَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مِنْ يَشَاءُ  
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ<sup>১৪১</sup> وَكُلُّ لِكَ جَعْلَنَا أَمْهَ وَسْطًا لِتَكُونُوا  
 شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

১৭ রংকৃ

অবশ্যি নির্বোধ লোকেরা বলবে, “এদের কি হয়েছে, প্রথমে এরা যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তো, তা থেকে হঠাত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে<sup>১৪২</sup> হে নবী! ওদেরকে বলে নাও, ‘পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। আল্লাহ যাকে চান তাকে সোজা পথ দেখান।’<sup>১৪৩</sup> আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি ‘মধ্যপথী’ উদ্ঘাতে পরিগত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী।<sup>১৪৪</sup>

কোনু সম্পদায়ের অন্তরভুক্ত ছিলেন? তারা এর জবাব এড়িয়ে যেতো। কারণ ঐ নবীগণ তাদের সম্পদায়ের অন্তরভুক্ত ছিলেন, নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী তারা একথা দাবী করতে পারতো না। কিন্তু মরীগণ ইহুদি ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না, একথা যদি তারা ঘৰ্থহীন ভাষায় বলে দিতো তাহলে তো তাদের সব মুক্তি শেষ হয়ে যেতো।

১৪২. হিজরাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় ঘোল সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে থাকেন। অতপর কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসে। এর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসবে।

১৪৩. এটি হচ্ছে নির্বোধদের অভিযোগের প্রথম জবাব। তাদের চিন্তার পরিসর ছিল সংকীর্ণ। তাদের দৃষ্টি ছিল সীমাবদ্ধ। স্থান ও দিক তাদের কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। তাদের ধারণা ছিল আল্লাহ কোন বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ। তাই সর্বপ্রথম তাদের এই মূর্খতাপ্রসূত অভিযোগের জবাবে বলা হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর দিক। কোন বিশেষ দিককে কিবলায় পরিগত করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেই দিকে আছেন। আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন তারা এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টির ও সংকীর্ণ মতবাদের উৎক্ষেপ অবস্থান করে এবং তাদের জন্য বিশ্বজীবীন সত্য উপলব্ধির ঘার উন্মুক্ত হয়ে যায়। (এ সম্পর্কে আরো জানার জন্য ১১৫ ও ১১৬ নম্বর ঢাকা দু'টিও দেখে নিন।)

১৪৪. এটি হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্ধাতের নেতৃত্বের ঘোষণাবাণী। ‘এভাবেই’ শব্দটির সাহায্যে দু'দিকে ইঁধিগত করা হয়েছে। এক : আল্লাহর

পথপ্রদর্শনের দিকে ইঁগিত করা হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকারীরা সত্য-সরল পথের সন্ধান পেয়েছে এবং তারা উন্নতি করতে করতে এমন একটি মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে যেখানে তাদেরকে 'মধ্যপন্থী উম্মাত' গণ্য করা হয়েছে। দুই : এ সাথে কিবলাহ পরিবর্তনের দিকেও ইঁগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বোধরা একদিক থেকে আর একদিকে মুখ ফিরানো মনে করছে। অথচ বাইত্তুল মাকদিস থেকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহর বনী ইসরাইলকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব পদ থেকে যথানিয়মে হটিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াকে সে পদে বসিয়ে দিলেন।

'মধ্যপন্থী উম্মাত' শব্দটি অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যের অধিকারী। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি উৎকৃষ্ট ও উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন দল, যারা নিজেরা ইনসাফ, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, দুনিয়ার জাতিদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় আসন লাভের যোগ্যতা রাখে, সত্য ও সততার ভিত্তিতে সবার সাথে যাদের সম্পর্ক সমান এবং কারোর সাথে যাদের কোন অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক নেই।

বলা হয়েছে, তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাতে পরিণত করার কারণ হচ্ছে এই যে, "তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হবেন।" এ বক্তব্যের অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, আখেরাতে যখন সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করে তাদের হিসেব নেয়া হবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে রসূল তোমাদের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, সুস্থ ও সঠিক চিন্তা এবং সৎকাজ ও সুবিচারের যে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তা তিনি তোমাদের কাছে দ্ববহ এবং পুরোপুরি পৌছিয়ে দিয়েছেন আর বাস্তবে সেই অনুযায়ী নিজে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপর রসূলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে তোমাদের এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌছিয়ে দিয়েছিলেন তা তোমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছো। আর তিনি যা কিছু কার্যকর করে দেখিয়ে ছিলেন তা তাদের কাছে কার্যকর করে দেখাবার ব্যাপারে তোমরা মোটেই গড়িমসি করোনি।

এভাবে কোন ব্যক্তি বা দলের এ দুনিয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়াটাই মূলত তাকে নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার নামান্তর। এর মধ্যে যেমন একদিকে মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির প্রশ্ন রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে দায়িত্বের বিরাট বোঝা। এর সোজা অর্থ হচ্ছে, রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে এ উম্মাতের জন্য আল্লাহভীতি, সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন, সুবিচার, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির জীবন সাক্ষী হয়েছেন তেমনিভাবে এ উম্মাতকেও সারা দুনিয়াবাসীদের জন্য জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হতে হবে। এমন কি তাদের কথা, কর্ম, আচরণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিহ্বল দেখে দুনিয়াবাসী আল্লাহভীতি, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির শিক্ষা গ্রহণ করবে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হিদায়াত আমাদের কাছে পৌছাবার ব্যাপারে যেমন রসূলের দায়িত্ব ছিল বড়ই সুকঠিন, এমনকি এ ব্যাপারে সামান্য ক্রটি বা

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبَعُ  
 الرَّسُولَ مِنْ يَنْقِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا  
 عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَ كُرَّمٍ  
 أَنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

(১৪৩)

প্রথমে যে দিকে মুখ করে তুমি নামায পড়তে, তাকে তো কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে উন্টো দিকে ফিরে যায়, আমি শুধু তা দেখার জন্য কিবলাহ নির্দিষ্ট করেছিলাম। ১৪৩ এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তবে তাদের জন্য মোটেই কঠিন প্রমাণিত হয়নি যারা আল্লাহর হিদায়াত লাভ করেছিল। আল্লাহ তোমাদের এই ইমানকে কখনো নষ্ট করবেন, না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি মানুষের জন্য অত্যন্ত স্বেচ্ছীল ও করুণাময়।

গাফলতি হলে আল্লাহর দরবারে তিনি পাকড়াও হতেন, অনুকূপভাবে এ হিদায়াতকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাবার ব্যাপারেও আমাদের ওপর কঠিন দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। যদি আমরা আল্লাহর আদালতে যথার্থই এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হই যে, “তোমার রসূলের সাধ্যমে তোমার যে হিদায়াত আমরা পেয়েছিলাম তা তোমার বালাদের কাছে পৌছাবার ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার ত্রুটি করিনি”, তাহলে আমরা সেদিন মারাত্তাকভাবে পাকড়াও হয়ে যাবো। সেদিন এ নেতৃত্বের অহংকার সেখানে আমাদের ধৰ্মসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের নেতৃত্বের যুগে আমাদের যথার্থ ক্রটির কারণে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে যে সমস্ত গলদ দেখা দেবে, তার ফলে দুনিয়ায় যেসব গোমরাহী ছড়িয়ে পড়বে এবং যত বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব বিস্তৃত হবে—সে সবের জন্য অসৎ নেতৃত্বগ্রহ এবং মানুষ ও জিন শয়তানদের সাথে সাথে আমরাও পাকড়াও হবো। আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, পৃথিবীতে যখন জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও অংশতার রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল তখন তোমরা কোথায় ছিলে?

১৪৫. অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে, কে জাহেলী বিদ্যে এবং মাটি ও রক্তের গোলামিতে লিপ্ত আর কে এসব বৌধন মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেছে। একদিকে আরবরা তাদের দেশ, বংশ ও গোত্রের অহংকারে ডুবে ছিল। আরবের কাবাকে বাদ দিয়ে বাইরের বাইতুল মাকদিসকে কিবলায় পরিণত করা ছিল তাদের জাতীয়তাবাদের মূর্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাতের শামিল। অন্যদিকে বনী ইসরাইলরা ছিল তাদের বংশপূজার অহংকারে মন্ত। নিজেদের পৈতৃক কিবলাহ ছাড়া অন্য কোন কিবলাহকে বরদাসত করার ক্ষমতাই তাদের ছিল না। কাজেই একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মূর্তি যাদের মনের কোণে ঠাই পেয়েছে, তারা কেমন করে আল্লাহর রসূল যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছিলেন সে

قَدْ نَرَى تَقْلِبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فَلَنُوْلِينَكَ قِبْلَةً  
 تَرْضِيَّاً، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهِيَ مَا كَنْتَ  
 فَوْلُوا وَجْهَكَ شَطَرَهُ، وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ  
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَمَا أَنْهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ  
 ১৪৬

আমরা তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি। নাও, এবার তাহলে সেই কিব্লার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিস্থি, যাকে তুমি পছন্দ করো। মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এখন তোমরা যেখানেই হও না কেন এদিকেই মুখ করে নামায পড়তে থাকো। ১৪৬

এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, খুব তালো করেই জানে, (কিব্লাহ পরিবর্তনের) এ হৃকুমটি এদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটি একটি যথার্থ সত্য হৃকুম। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা থেকে গাফেল নন।

পথে চলতে পারতো। তাই যহান আল্লাহ এ মূর্তিপূজারীদের যতার্থ সত্যপন্থীদের থেকে ছেঁটে বাদ দেয়ার পরিকল্পনা নিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে বাইতুল মাকদিসকে কিব্লাহ নির্দিষ্ট করলেন। এর ফলে আরব জাতীয়তাবাদের দেবতার পূজারীরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অতপর তিনি এ কিব্লাহ বাদ দিয়ে কা'বাকে কিব্লাহ নির্দিষ্ট করেন। ফলে ইসরাইলী জাতীয়তাবাদের পূজারীরাও তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। এভাবে যারা কোন মূর্তির নয় বরং নিছক আল্লাহর পূজারী ছিলেন একমাত্র তারাই রসূলের সাথে রয়ে গেলেন।

১৪৬. কিব্লাহ পরিবর্তন সম্পর্কিত এটি ছিল মূল নির্দেশ। এ নির্দেশটি ২য় হিজরীর রজব বা শাবান মাসে নাথিল হয়। ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দাওয়াত উপলক্ষে বিশ্র ইবনে বারাআ ইবনে মা'রুর-এর গৃহে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানে নামাযে লোকদের ইয়ামাতি করতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুই রাকাত পড়া হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় রাকাতে হঠাৎ অহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাথিল হলো। সংগে সংগেই তিনি ও তাঁর সংগে জামায়াতে শামিল সমস্ত লোক বাইতুল মাকদিসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার দিকে ঘূরে গেলেন। এরপর মদীনায় ও মদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হলো। বারাআ ইবনে আমির বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা লোকদের কানে এমন অবস্তায় পৌছলো যখন তারা রুক্ক করছিল। নির্দেশ শোনার সাথে সাথে সবাই সেই

অবস্থাতেই কা'বার দিকে মুখ ফিরালো: আনাস ইবনে মাজিক বলেন, এ খবরটি বনী সালমায় পৌছলো পরের দিন ফজরের নামাযের সময়। লোকেরা এক রাকায়াত নামায শেষ করেছিল এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌছলো : “সাবধান, কিব্লাহ বদলে গেছে: এখন কা'বার দিকে কিব্লাহ নির্দিষ্ট হয়েছে!” একথা শোনার সাথে সাথেই সমগ্র জামায়াত কা'বার দিকে মুখ ফিরালো।

উত্ত্বে করা যেতে পারে, বাইতুল মাকদিস মদীনা থেকে সোজা উত্তর দিকে। আর কা'বা হচ্ছে দক্ষিণ দিকে। আর নামাযের মধ্যে কিব্লাহ পরিবর্তন করার জন্য ইমামকে অবশ্য মুকতাদিদের পেছন থেকে সামনের দিকে আসতে হয়েছে। অন্যদিকে মুকতাদিদের কেবলমাত্র দিক পরিবর্তন করতে হয়নি বরং তাদেরও কিছু কিছু চলাফেরা করে লাইন ঠিকঠাক করতে হয়েছে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়াতে এ সম্পর্কিত বিশ্বারিত আলোচনাও এসেছে:

আর আয়াতে যে বলা হয়েছে, ‘আমরা তোমাকে বারবার শাকাশের দিকে তাকাতে দেখছি’ এবং ‘সেই কিব্লার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিছি যাকে তুমি পছন্দ করো’ এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কিব্লাহ পরিবর্তনের নির্দেশ আসার আগে থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু অ'লাহ'ই ওয়া সাল্লাম এর প্রতীক্ষায় ছিলেন! তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন, বনী ইসরাইলের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বাইতুল মাকদিসের ফেন্সীয় মর্যাদা শারেণও অবসান ঘটেছে। এখন আসল ইবরাইমী কেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাবার সময় এসে গেছে।

‘মসজিদে হারাম’ অর্থ সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্ক মসজিদ: এর অর্থ হচ্ছে, এমন ইবাদত গৃহ যার মধ্যস্থলে কা'বাগৃহ অবস্থিত।

কা'বার দিকে মুখ করার অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার যে কোন জায়গা থেকে সোজা নাক দর্শনের কা'বার দিকে ফিরে দাঢ়াতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক জায়গায় সর্বসময় এটা করা ফাঁটিন। তাই কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সোজা কা'বা দর্শনের মুখ করে দাঢ়াবার নির্দেশ দেয়া হয়নি: কুরআনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যথাসুষ্ঠব কা'বার নির্ভুল দিকনির্দেশ করার জন্য অনুসন্ধান আমাদের অবশ্য চান্দতে হবে। কিন্তু একেবারেই যথার্থ ও নির্ভুল দিক জেনে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর অপর্ণ করা হয়নি। সঙ্গব্য সকল উপায়ে অনুসন্ধান চাপিয়ে যে দিকটিতে কা'বার অবস্থিতি হওয়া সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী নিষ্ঠিত হতে পারি সেদিকে ফিরে নামায পড়াই নিসন্দেহে সঠিক পদ্ধতি। যদি কেখাও কিব্লার দিকনির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে অথবা এমন অবস্থায় থাকা হয় যার ফলে কিব্লার দিকে মুখ করে থাকা সম্ভব না হয় (যেমন নৌকা বা রেসগাড়ীতে অবস্থানে) তাহলে এ অবস্থায় যে দিকটার কিব্লাহ ইত্যাঃ সম্পর্কে ধারণা হয় অথবা যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হয়, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া হতে পারে। তবে, হাঁ, নামাযের মধ্যেই যদি কিব্লার সঠিক দিকনির্দেশনা জানা যায় অথবা সঠিক দিকে নামায পড়া সম্ভব হয়, তাহলে নামায পড়া অবস্থায়ই সেদিকে মুখ ধূরিয়ে নেয়া উচিত।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ بِكُلِّ أَيَّةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ<sup>١٨٥</sup>  
 وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ<sup>١٨٦</sup> وَلَئِنْ  
 أَتَبْعَتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ<sup>١٨٧</sup> لَا إِنَّكَ إِذَا لَمْ  
 الظَّلَمِيْنِ<sup>١٨٨</sup> الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ  
 أَبْنَاءَهُمْ<sup>١٨٩</sup> وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتَمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ<sup>١٩٠</sup>  
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ<sup>١٩١</sup>

তুমি এই আহ্লি কিতাবদের কাছে যে কোন নিশানীই আনো না কেন, এরা তোমার কিবলার অনুসারী কথনোই হবে না। তোমাদের পক্ষেও তাদের কিবলার অনুগামী হওয়া সত্ত্ব নয় আর এদের কোন একটি দলও অন্য দলের কিবলার অনুসারী হতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা লাভ করার পর যদি তোমরা তাদের ইচ্ছা ও রাসনার অনুসারী হও, তাহলে নিসদ্দেহে তোমরা জালেমদের অস্তরভূত হবে।<sup>১৪৭</sup> যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এই স্থানচিকে (যাকে কিবলাহ বানানো হয়েছে) এমনভাবে চেনে যেমন নিজেদের সত্তানদেরকে চেনে।<sup>১৪৮</sup> কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে জেনে বুঝে গোপন করছে। এটি নিষ্ঠিধায় তোমাদের রাস্তার পক্ষ থেকে আগত একটি চূড়ান্ত সত্য, কাজেই এ ব্যাপারে তোমরা কথনোই কোন প্রকার সন্দেহের শিকার হয়ে না।

১৪৭. এর অর্থ হচ্ছে, কিবলাহ সম্পর্কে এরা যত প্রকার বিতর্ক ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে, যুক্তির মাধ্যমে এদেরকে নিশ্চিত করে এর মীমাংসা করা সত্ত্ব নয়। কারণ এরা বিদ্যেষ পোষণ ও হঠধর্মিতায় লিপ্ত। কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে এদেরকে এদের কিবলাহ থেকে সরিয়ে আনা সত্ত্ব নয়। নিজেদের দল প্রীতি ও গোত্রীয় বিদ্যেয়ের কারণে এরা এই কিবলার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। আর তোমরা এদের কিবলাহ গ্রহণ করেও এই ঝগড়ার মীমাংসা করতে পারবে না। কারণ এদের কিবলাহ একটি নয়। এদের সমস্ত দল একমত হয়ে কোন একটি কিবলাহ গ্রহণ করেনি, যেটি গ্রহণ করে নিলে সব ঝগড়া চুকে যেতে পারে। এদের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কিবলাহ। একটি দলের কিবলাহ গ্রহণ করে কেবলমাত্র তাদেরকেই সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। অন্যদের সাথে ঝগড়া তখনো থেকে যাবে। আর সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, নবী হিসেবে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে থাকা

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِ<sup>١</sup> أَيْنَ مَا  
تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ مُّلْحِدًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>٢</sup> وَمِنْ  
حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِلِ الْحَرَاءِ<sup>٣</sup> وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ  
مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ<sup>٤</sup>

১৮ রংকৃ

প্রত্যেকের জন্য একটি দিক আছে, সে দিকেই সে ফেরে। কাজেই তোমরা ভালোর দিকে এগিয়ে যাও।<sup>১</sup> ৪৯ যেখানেই তোমরা থাকো না কেন আগ্রাহ তোমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই।

তুমি যেখান থেকেই যাওনা কেন, সেখানেই তোমার মুখ (নামায়ের সময়) মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও। কারণ এটা তোমার রবের সম্পূর্ণ সত্য ভিত্তিক ফায়সালা। আগ্রাহ তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বেখবর নন।

এবং দেয়া নেয়ার নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে আপোষ করা তোমাদের দায়িত্ব নয়। তোমাদের কাজ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছি, সবকিছু থেকে বেপরোয়া হয়ে একমাত্র তারই ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। তা থেকে সরে গিয়ে কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হলে নিজের নবুওয়াতের মর্যাদার প্রতি জুলুম করা হবে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তোমাকে আমি যে নিয়মামত দান করেছি তার প্রতি হবে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

১৪৮. এটি আরবের একটি প্রচলিত প্রবাদ। যে জিনিসটিকে মনুষ নিশ্চিতভাবে জানে এবং যে সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে না তাকে এড়াবে বলা হয়ে থাকে যথা : সে এ জিনিসটিকে এমনভাবে চেনে যেমন চেনে নিজের সঙ্গান্দেরকে। অর্থাৎ নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে যেমন তার মধ্যে কোন প্রকার জড়তা ও সংশয়ের অবকাশ থাকে না, ঠিক তেমনি সব রকম সন্দেহের উর্ধে উঠে নিশ্চিতভাবেই সে এই জিনিসটিকে জানে ও চেনে। ইহুদি ও খৃষ্টান আলেমরা ভালোভাবেই এ সত্যটি জানতো যে, হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা নির্মাণ করেছিলেন এবং বিপরীত পক্ষে এর ১৩ শত বছর পরে হ্যরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাতে বাইতুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং তাঁর আমলে এটি কিব্লাহ হিসেবে গণ্য হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাপারে তাদের মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

১৪৯. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যটির মাঝখানে একটু সূক্ষ্ম ফাঁক রয়েছে। শ্রোতা নিজে সামান্য একটু চিত্তা-ভাবনা করলে এই ফাঁক ভরে ফেলতে পারেন। ব্যাপার হচ্ছে এই যে,

وَمِنْ حِيثِ خَرَجْتَ فَوْلِ وَجْهُكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
 وَحِيثِ مَا كَنْتَ رَفِولُوا وَجْهُكَ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ  
 حِجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونَى  
 وَلَا تَسْرِ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَلُونَ ۝ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ  
 رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيَزْكِيرُكُمْ وَيَعْلَمُكُمُ الْكِتَبَ  
 وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَرْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا ذَكَرْنَى  
 آذْكُرْكُمْ وَآشْكُرْهُالِى وَلَا تَكْفُرُونَ ۝

আর যেখান থেকেই তুমি চল না কেন তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে  
 ফেরাও এবং যেখানেই তোমরা থাকো না কেন সে দিকেই মুখ করে নামায পড়ো,  
 যাতে লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খাড়া করতে না পারে—<sup>১৫০</sup> তবে  
 যারা যালেম, তাদের মুখ কোন অবস্থায়ই বক্ষ হবে না। কাজেই তাদেরকে ভয়  
 করো না বরং আমাকে ভয় করো—আর এ জন্য যে, আমি তোমাদের ওপর নিজের  
 অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেবো<sup>১৫১</sup> এবং এই আশায়<sup>১৫২</sup> যে, আমার এই নির্দেশের  
 আনুগত্যের ফলে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে সাফল্যের পথ লাভ করবে যেমনভাবে  
 (তোমরা এই জিনিসটি থেকেও সাফল্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছো যে,) আমি  
 তোমাদের মধ্যে ব্যবহার করে তোমাদের থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে  
 তোমাদেরকে আমার আয়ত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুল্ক করে সুসজ্জিত  
 করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমন সব কথা তোমাদের  
 শেখায়, যা তোমরা জানতে না। কাজেই তোমরা আমাকে অরণ রাখো, আমিও  
 তোমাদেরকে অরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার  
 নিয়ামত অঙ্গীকার করো না।

যাকে নামায পড়তে হবে তাকে অবশ্যি কোন না কোন দিকে মুখ ফেরাতে হবে। কিন্তু  
 যেদিকে মুখ ফেরানো হয় স্টো আসল জিনিস নয়, আসল জিনিস হচ্ছে সেই নেকী ও  
 কল্যাণগুলো যেগুলো অর্জন করার জন্য নামায পড়া হয়। কাজেই দিক ও স্থানের বিতর্কে  
 জড়িয়ে না পড়ে নেকী ও কল্যাণ অর্জনে বাধিয়ে পড়তে হবে।

يَا يَهُآ الَّذِينَ أَمْنَوا اسْتَعِنُو بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلِكُنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَئِيْمَ الْحَوْفِ وَالْجَمْعُ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَرُ الصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعونَ ﴿١٧﴾

১৯ ঝুক্ত

হে ইমানদারগণ।<sup>১৫৩</sup> সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।<sup>১৫৪</sup> আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এই ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা থাকে না।<sup>১৫৫</sup> আর নিচয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আয়দানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে এবং যখনই কোন বিপদ আসে বলে : “আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে,”<sup>১৫৬</sup>—তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

১৫০. অর্থাৎ আমাদের এই নির্দেশটি পুরোপুরি মেনে চলো। কখনো যেন তোমাদের ভিন্নরকম আচরণ না দেখা যায়। তোমাদের কাউকে যেন নিদিষ্ট দিকের পরিবর্তে কখনো অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখা না যায়। অন্যথায় শক্রী তোমাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করার সুযোগ পাবে : আহা, কী চমৎকার ‘মধ্যপন্থী উদ্ঘাত’। এরাই হয়েছে আবার সত্যের সাক্ষী। এরা মুখে বলে, এই নির্দেশটি আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে কিন্তু কাজের সময় এর দ্বিরুদ্ধাচরণ করছে।

১৫১. এখানে অনুগ্রহ বলতে নেতৃত্ব বুঝানো হয়েছে। বনী ইসরাইলদের থেকে কেড়ে নিয়ে এই নেতৃত্ব উদ্ঘাতে মুসলিমাকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ প্রণীত বিধান অনুযায়ী একটি উদ্ঘাতকে দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতৃত্বের আসলে অধিষ্ঠিত করা এবং মানবজাতিকে সংকর্মশীলতা ও আল্লাহর ইবাদাতের পথে পরিচালিত করার দায়িত্বে তাকে নিয়োজিত করা ছিল তার সত্যানুসারিতার চরম পুরক্ষার। এই নেতৃত্বের দায়িত্ব যে উদ্ঘাতকে দেয়া হয়েছে তার ওপর আসলে অল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত পরিপূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ

এখানে বলছেন, কিব্লাহ পরিবর্তনের এ নির্দেশটি আসলে এই পদে তোমাদের সমাসীন করার নিশানী। কাজেই অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানীর প্রকাশ ঘটলে যাতে এ পদটি তোমাদের থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয় সে জন্যও তোমাদের আমার এই নির্দেশ মেনে চলা দরকার। এটা মেনে চললে তোমাদের প্রতি এই নিখামত ও অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে।

১৫২. অর্থাৎ এই নির্দেশ মেনে চলার সময় মনে মনে এই আশা পোষণ করতে থাকো। এটা একটা রাজকীয় বর্ণনাভঙ্গী মাত্র। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহর পক্ষ থেকে যখন তাঁর কোন চাকরকে বলে দেয়া হয়, বাদশাহর পক্ষ থেকে অমুক অমুক অনুগ্রহ ও দানের আশা করতে পারো, তখন কেবলমাত্র এতটুকু ঘোষণা শুনেই সংশ্লিষ্ট চাকর বা রাজকর্মচারী তার গৃহে আনন্দ-উত্তুল্য করতে পারে এবং লোকেরাও তাকে মোবারকবাদ দিতে পারে।

১৫৩. নেতৃত্ব পদে আসীন করার পর এবার এই উস্তাতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বিধান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সবার আগে যে কথাটির প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে, তোমাদের জন্য যে বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে সেটা কোন ফুলের বিছানা নয়। একটি বিরাট, মহান ও বিপদ সংকুল কাজের বোৰা তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বোৰা মাথায় ওঠাবার সাথে সাথেই তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে বিপদ-আপদ ঝাপিয়ে পড়তে থাকবে। কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের ঠেলে দেয়া হবে। অগভিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে যখন তোমরা আগ্নাহর পথে এগিয়ে যেতে থাকবে তখনই তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে তাঁর অনুগ্রহরাশি।

১৫৪. অর্থাৎ এই কঠিন দায়িত্বের বোৰা বহন করার জন্য তোমাদের দু'টো আভ্যন্তরীন শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, নিজের মধ্যে সবর, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শক্তির লালন করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত নামায পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিভিন্ন আলোচনায় সবরের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেখানে বিভিন্ন শুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শুণাবন্নীর সামগ্রিক রূপ হিসেবে সবরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আসলে এটিই হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। এর সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোন লক্ষ অর্জনে সফলতা লাভ সম্ভব নয়। এভাবে সামনের দিকে নামায সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে নামায কিভাবে মু'মিন ব্যক্তি ও সমাজকে এই মহান কাজের যোগ্যতা সম্পর্ক করে গড়ে তোলে।

১৫৫. মৃত্যু শব্দটি এবং এর ধারণা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুর কথা শুনে সে সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই আগ্নাহর পথে শহীদদেরকে মৃত বলতে নিয়েধ করা হয়েছে। কারণ তাদেরকে মৃত বললে ইসলামী দলের লোকদের জিহাদ, সংঘর্ষ ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা স্তর হয়ে যাবার সন্তাননা দেখা দেবে। এর পরিবর্তে দ্বিমানদারদের মনে এই চিন্তা বৰুম্বুল করতে বলা হয়েছে যে, আগ্নাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরতন জীবন লাভ করে। এই চিন্তাটি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ চিন্তা পোষণের ফলে সাহস ও হিমত তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতেও থাকে।

أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَئِكَ هُمُ  
الْمَهْتَلُونَ ۝ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۝ فَمَنْ حِجَرَ الْبَيْتَ  
أَوْ أَعْتَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهِمَا ۝ وَمَنْ تَطَوعَ خَيْرًا ۝ فَإِنَّ  
اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ ۝

তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে এবং এই ধরনের লোকরাই হয় সত্যানুসারী।

নিসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিশানীসমূহের অন্তরভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করে<sup>১৫৭</sup> তার জন্য ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে 'সাঁঙ্গ' করায় কোন গোণাহ নেই।<sup>১৫৮</sup> আর যে ব্যক্তি বেছায় ও সাগ্রহে কোন সৎ ও কল্যাণের কাজ করে,<sup>১৫৯</sup> আল্লাহ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য দান করবেন।

১৫৬. বলার অর্থ কেবল মুখে বলা নয় বরং মনে মনে একথা শীকার করে নেয়া যে, "আমরা আল্লাহর কর্তৃত্বধীন।" তাই আল্লাহর পথে আমাদের যে কোন জিনিস কুরবানী করা হয়, তা ঠিক তার সঠিক ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়। যার জিনিস ছিল তার কাজেই ব্যয়িত হয়েছে। আর "আল্লাহরই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে"—এর অর্থ হচ্ছে, চিরকাল আমাদের এ দুনিয়ায় থাকতে হবে না। অবশেষে একদিন আল্লাহরই কাছে যেতে হবে। কাজেই তাঁর পথে লড়াই করে প্রাণ দান করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটাই তো ভালো। এতাবে মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটা আমাদের স্বাতাবিকভাবে জীবন যাপন করে কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়ে বা রোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার চাইতে নাখো শুণে শ্রেয়।

১৫৭. যিনহজ্জ মাসের নির্ধারিত তারিখে কা'বা শরীফ যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে। এই তারিখগুলো ছাড়া অন্য স্ময় কা'বা যিয়ারত করাকে উমরাহ বলে।

১৫৮. সাফা ও মারওয়া মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়। আল্লাহ হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে হজ্জের যে সমস্ত অনুষ্ঠান শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঁঙ্গ' করা বা দৌড়ানো ছিল অন্যতম। পরে মকায় ও তার আশপাশের এলাকায় মুশরিকী জাহেলীয়াত তথা পৌত্রলিক ধর্ম ছড়িয়ে পড়লে সাফার ওপর 'আসাফ' ও মারওয়ার ওপর 'নায়েলা'র পূজাবেদী নির্মাণ করা হয়। এর চারদিকে তাওয়াফ করা হতো। তারপর নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের মাধ্যমে আরববাসীদের কাছে ইসলামের আলো পৌছাবার পর মুসলমানদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, সাফা ও মারওয়ার 'সাঁঙ্গ' কি হজ্জের অনুষ্ঠানাদির অন্তরভুক্ত অথবা এটা নিছক জাহেলী যুগের মুশরিকদের উচ্চত কোন অনুষ্ঠান? কাজেই এই ধরনের একটি কর্মকে হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তরভুক্ত করে তারা কোন মুশরিকী কাজ করে যাচ্ছে কি না এ ব্যাপারে

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ  
مَا بَيْنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَبِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُم  
اللَّعْنُونَ ﴿١﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ آتُوبُ  
عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ

যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জল শিক্ষাবলী ও বিধানসমূহ গোপন করে, অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।<sup>১৬০</sup> তবে যারা এই নীতি পরিহার করে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা কিছু গোপন করে যাচ্ছিল সেগুলো বিবৃত করতে থাকে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেবো আর আসলে আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

তাদের মনে দ্বিতীয় সংক্ষার হয়। তাছাড়া হয়রত আয়েশার (রা) রেওয়ায়াত থেকেও জানা যায়, মদীনাবাসীদের মনে আগে থেকেই সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ের ব্যাপারে অপছন্দ ও বিরক্তির ভাব ছিল। কারণ তারা ছিল ‘মানাত’-এর ভক্ত। ‘আসাফ’ ও ‘নায়েলা’কে তারা মানতো না। এসব কারণে মসজিদুল হারামকে কিবলাহ নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়ার সম্পর্কিত প্রচলিত ভূল ধারণা দূর করা এবং এই পাহাড় দু’টির মাঝখানে দৌড়ানো হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ বলে লোকদেরকে জানিয়ে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আর এই সংগে লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যে, এই দু’টি স্থানের পবিত্রতা জাহেলী যুগের মুশরিকদের মনগড়া নয় বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে।

১৫৯. অর্থাৎ নির্দেশ মানার জন্য তোমাদের কাজ তো করতেই হবে, তবে তালো হয় যদি মানসিক আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে তা করো।

১৬০. ইহাদি আলেমদের বৃহত্তম অপরাধ এই ছিল যে, তারা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে তাকে রাখী ও একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ জনমানুষ তো দূরের কথা ইহাদি জনতাকেও এই জ্ঞানের স্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। সাধারণ অঙ্গতার কারণে জনগণ যখন ব্যাপকভাবে ঝট্টার শিকার হলো তখন ইহাদি আলেমসমাজ জনগণের চিন্তা ও কর্মের সংস্কার সাধনে ভূতী হয়নি। বরং উট্টো জনগণের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য যে ঝট্টার ও শরীয়ত বিরোধী কর্ম জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো তাকে তারা নিজেদের কথা ও কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করতো। এই ধরনের প্রবণতা ও কর্মনীতি অবলম্বন না করার জন্য

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَلُّو هُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٦١﴾ خَلِيلُ بْنِ فِيْهَا لَا يُخْفَى عَنْهُمْ  
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٦٢﴾ وَالْمُكَرَّرُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٦٣﴾

যারা কুফরীর নীতি<sup>(৬১)</sup> অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবতার লানত। এই লানত বিন্দু অবস্থায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে না এবং তাদের অন্য কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

তোমাদের আল্লাহ এক ও একক। সেই দয়াবান ও করুণাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

মুসলমানদেরকে তাকীদ করা হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বাসীকে হিদায়াত করার গুরুত্বায়িত যে উচ্চাতের ওপর সোপন করা হয়েছে, সেই হিদায়াতকে কৃপণের ধনের মতো আগলে না রেখে বেশী করে সম্প্রসারিত করাই হচ্ছে তার কর্তব্য।

১৬১. কুফরের আসল মানে হচ্ছে গোপন করা, লুকানো। এ থেকেই অস্থীকারের অর্থ বের হয়েছে। ঈমানের বিপরীত পক্ষে এ শব্দটি বলা হয়। ঈমান অর্থ মেনে নেয়া, কবুল করা, স্থীকার করা। এর বিপরীতে ‘কুফর’-এর অর্থ না মানা, প্রত্যাখ্যান করা, অস্থীকার করা। কুরআনের বর্ণনার প্রেক্ষিতে কুফরীর মনোভাব ও আচরণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

এক : আল্লাহকে একেবারেই না মানা। অথবা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্থীকার না করা এবং তাঁকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, প্রভু, উপাস্য ও মাবুদ হিসেবে মেনে নিতে অস্থীকার করা। অথবা তাঁকে একমাত্র মালিক ও মাবুদ বলে না মানা।

দুই : আল্লাহকে মেনে নেয়া কিন্তু তাঁর বিধান ও হিদায়াতসমূহকে জ্ঞান ও আইনের একমাত্র উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্থীকার করা।

তিনি : নীতিগতভাবে একথা মেনে নেয়া যে, তাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিধান ও বাণীসমূহ যেসব নবী-রসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাদেরকে অস্থীকার করা।

চারি : নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজের পছন্দ ও মানসিক প্রবণতা বা গোত্রীয় ও দর্শীয়প্রীতির কারণে তাদের মধ্য থেকে কাউকে মেনে নেয়া এবং কাউকে না মানা।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الَّيلِ وَالنَّهَارِ  
وَالْفَلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا إِنَّمَا فَاحِيَّ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا  
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّكَابِ الْمَسْخِرِيَّينَ السَّمَاءَ  
وَالْأَرْضَ لَا يَبْتَلِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

২০ রক্ত

(এই সত্যটি চিহ্নিত করার জন্য যদি কোন নির্দেশন বা আলামতের প্রয়োজন হয় তাহলে) যারা বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর ঘটনাকৃতিতে, রাত্রিদিনের অনবরত আবর্তনে, মানুষের প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগর দরিয়ার চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, যা আল্লাহ বর্ণণ করেন ওপর থেকে তারপর তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করেন এবং নিজের এই ব্যবস্থাপনার বদৌলতে পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নির্দেশন রয়েছে। ۱۶۲

পাঁচ : নবী ও রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চারিত্ব ও জীবন যাপনের বিধান সংযুক্ত যেসব শিক্ষা বিবৃত করেছেন সেগুলো অথবা সেগুলোর কোন কোনটি গ্রহণ করা।

ছয় : এসব কিছুকে যতবাদ হিসেবে মেনে নেয়ার পর কার্যত জেনে বুঝে আল্লাহর বিধানের নাফরমানী করা এবং এই নাফরমানীর ওপর জোর দিতে থাকা। আর এই সঙ্গে দুনিয়ার জীবনে আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানীর ওপর নিজের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপন করা।

আল্লাহর মোকাবিলায় এসব বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও কাজ মূলত বিদ্রোহাত্মক। এর মধ্য থেকে প্রতিটি চিন্তা ও কর্মকে কুরআন কুফরী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ ছাড়াও কুরআনের কোন কোন জায়গায় ‘কুফর’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহর দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার অর্থে। সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতার বিপরীতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘শোকর’-এর অর্থ হচ্ছে, যিনি অনুগ্রহ করেছেন তাঁর প্রতি অনুগ্রহীত থাকা, তাঁর অনুগ্রহকে যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দান করা, তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহকে তাঁর সম্মুতি ও নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করা এবং অনুগ্রহীত ব্যক্তির মন অনুগ্রহকারীর প্রতি বিশ্বস্ততার আবেগে পরিপূর্ণ থাকা। এর বিপরীত পক্ষে কুফর বা অনুগ্রহের প্রতি

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَلَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يَحْبُونَهُ كَحْبَ  
اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا شَلْحَبَلَهِ وَلَوْبَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ  
الْعَذَابَ «أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» وَأَنَّ اللَّهَ شَلِيلُ الْعَذَابِ

কিন্তু (আল্লাহর একত্রের প্রমাণ নির্দেশক এসব সুস্পষ্ট নির্দেশন থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করায়<sup>১৬৩</sup> এবং তাদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত—অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভালোবাসে।<sup>১৬৪</sup> হায়! আয়ার সামনে দেখে এই যালেমরা যা কিছু অনুধাবন করার তা যদি আজই অনুধাবন করতো যে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর অধীন এবং শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।

অকৃত্ততা হচ্ছে : অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার না করা এবং এই অনুগ্রহকে নিজের যোগ্যতা বা অন্য কারোর দান বা সুপারিশের ফল মনে করা অথবা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ প্রদান করা সত্ত্বেও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করা। এই ধরনের কুফরীকে আমরা নিজেদের ভাষায় সাধারণত কৃতঘৃতা, অকৃত্ততা, নিমিক্তহারামী ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি।

১৬২. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এই যে বিশাল কারখানা মানুষের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত সঞ্চয়, মানুষ যদি তাকে নিছক নির্বোধ জন্ম-জানোয়ারের দৃষ্টিতে না দেখে বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ করে তার সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সকল প্রকার ইঠধর্মিতা পরিহার করে পক্ষপাতাইনভাবে মুক্ত মনে চিন্তা করে তাহলে চতুর্দিকে যেসব নির্দেশন সে প্রত্যক্ষ করছে সেগুলো তাকে এই সিদ্ধান্তে পৌছে দেয়ার জন্য যথেষ্ট যে, বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা একজন অসীম ক্ষমতাধর জ্ঞানবান সন্তান বিধানের অনুগত। সমস্ত ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সেই একক সন্তান হাতে কেন্দ্রীভূত। এই ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর স্বাধীন হস্তক্ষেপের বা অঙ্গীদারীতের সামান্যতম অবকাশই নেই। কাজেই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সৃষ্টিজগতের তিনিই একমাত্র প্রভু, ইলাহ ও আল্লাহ। তাঁর ছাড়া আর কোন সন্তান কোন বিষয়ে সামান্যতম ক্ষমতাও নেই। কাজেই খোদায়ী কর্তৃত্ব ও উপাস্য হবার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে আর কারোর কোন অশ্রু নেই।

১৬৩. অর্থাৎ সার্বভৌম কর্তৃত্বের যে বিশেষ গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত তার মধ্য থেকে কোন কোনটাকে অন্যদের সাথে সম্পর্কিত করে। আর আল্লাহ হিসেবে বান্দার ওপর তাঁর যে অধিকার রয়েছে তার মধ্য থেকে কোন কোনটা তারা তাদের এসব বানোয়াট মাবুদদের জন্যও আদায় করে। যেমন বিশ্ব-জগতের যাবতীয় কার্যকারণ পরম্পরার উপর কর্তৃত্ব, অভাব দূর করা ও প্রয়োজন পূর্ণ করা, সংকট মোচন, অভিযোগ ও প্রার্থনা শ্রবণ, দৃশ্য-অদৃশ্য নির্বিশেষে সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়ার—এ গুণগুলো একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্ক

إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ أَتَيْعُوا مِنَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَ  
تَقْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا لَوْا نَكَرَةٌ  
فَنَبَرَ أَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّ وَامْنَأَ كُلُّ لَكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَتٍ  
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَرِيجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

যখন তিনি শাস্তি দেবেন তখন এই সমস্ত নেতা ও প্রধান ব্যক্তিরা, দুনিয়ায় যাদের অনুসরণ করা হতো, তাদের অনুগামীদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করতে থাকবে। কিন্তু শাস্তি তারা পাবেই এবং তাদের সমস্ত উপায়-উপকরণের ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যেসব লোক দুনিয়ায় তাদের অনুসারী ছিল তারা বলতে থাকবে, হায়! যদি আমাদের আর একবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছে তেমনি আমরাও এদের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে দেখিয়ে দিতাম।<sup>১৬৫</sup> এভাবেই দুনিয়ায় এরা যে সমস্ত কাজ করছে সেগুলো আল্লাহ তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যাতে তারা কেবল দুঃখ ও আক্ষেপই করতে থাকবে কিন্তু জাহানামের আগুন থেকে বের হবার কোন পথই খুঁজে পাবে না।

বলে মানবে, একমাত্র তাঁরই সামনে বন্দেগীর স্বীকৃতি সহকারে মাথা নোয়াবে, নিজের অভাব-অভিযোগ-প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁরই দিকে এগিয়ে যাবে, তাঁরই কাছে সাহায্যের আবেদন জানবে, তাঁরই ওপর ভরসা ও নির্ভর করবে, তাঁরই কাছে আশা করবে এবং একমাত্র তাঁকেই ভয় করবে বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবেও—এগুলো হচ্ছে বান্দার ওপর আল্লাহর হক। অনুরপত্বাবে সমগ্র বিশ্ব-জগতের একচ্ছত্র মালিক হবার কারণে মানুষের জন্য হালাল-হারামের সীমা নির্ধারণ করার, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণের, তাদের আদেশ নিয়েদের বিধান দান করার এবং তিনি মানুষকে যেসব শক্তি ও উপায় উপকরণ দান করেছেন সেগুলো তারা কিভাবে, কোন কাজে এবং কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে তা জানিয়ে দেয়ার ও নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর আছে। এ ছাড়া বান্দার ওপর আল্লাহর যে অধিকার সেই অনুযায়ী বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করে নেবে। তাঁর নির্দেশকে আইনের উৎস হিসেবে মেনে নেবে। তাঁকেই যে কোন কাজের আদেশ করার ও তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করার একচ্ছত্র অধিকারী মনে করবে। নিজের জীবনের সকল ব্যাপারেই তাঁর নির্দেশকে চূড়ান্ত গণ্য করবে। দুনিয়ায় জীবন যাপন করার জন্য বিধান ও পথনির্দেশনা লাভের ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই মুখ্যপক্ষী হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এই গুণবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকেও অন্যের সাথে সম্পর্কিত করে এবং তাঁর এই অধিকারগুলোর

يَا يَهُمَا النَّاسُ كُلُّوْمَا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طِبَّا ۗ وَلَا تَتَبِعُوْ  
 خَطُوطِ الشَّيْطَنِ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ  
 وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا إِلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوْ  
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاعَنَا ۖ أَوْلَوْكَانَ  
 أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَلُونَ ۝ وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 كَمَّلَ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۝ صَرَبَكُمْ  
 عَمَّى فَهُمْ لَا يَعْتَلُونَ ۝

২১ ইন্দ্ৰ

হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যে সমস্ত হালাল ও পাক জিনিস রয়েছে সেগুলো খাও এবং শয়তানের দেখানো পথে চলো না।<sup>১৬৬</sup> সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি। সে তোমাদের অসৎকাজ ও অনাচারের নির্দেশ দেয় আর একথাও শেখায় যে, তোমরা আল্লাহর নামে এমন সব কথা বলো যেগুলো আল্লাহ বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই।<sup>১৬৭</sup>

তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নায়িল করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা তো সে পথে চলবো।<sup>১৬৮</sup> আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা যদি একটুও বুদ্ধি থাটিয়ে কাজ না করে থেকে এবং সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে থাকে তাহলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করে যেতে থাকবে? আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলতে যারা অঙ্গীকার করেছে তাদের অবস্থা ঠিক তেমনি যেমন রাখাল তার পশ্চদের ডাকতে থাকে কিন্তু হাঁক ডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই তাদের কানে পৌছে না।<sup>১৬৯</sup> তারা কালা, বোবা ও অঙ্ক, তাই কিছুই বুবতে পারে না।

মধ্য থেকে কোন একটি অধিকারণ অন্যকে দান করে, সে আসলে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বা যে সংস্থা এই গুণবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণেরও দাবীদার সাজে এবং মানুষের কাজ এই অধিকারণগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি অধিকার দাবী করে সেও মুখে খোদায়ী কর্তৃত্বের দাবী না করলেও আসলে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ সাজে।

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا كُلُّوْمِ مَطْبِعٌ مَارْزَقْنُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ  
كَتَمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ۱۱۰ إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمِيتَةَ وَالَّدَّأَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ  
وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمِنْ أَضْطَرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ۱۱۱

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথাথৰই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো, তাহলে যে সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি সেগুলো নিশ্চিতভে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।<sup>۱۹۰</sup> আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যদি কোন নিষেধাজ্ঞা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, মৃতদেহ খেয়ো না, রক্ত ও শূকরের গোশত থেকে দূরে থাকো। আর এমন কোন জিনিস খেয়ো না যার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়েছে।<sup>۱۹۱</sup> তবে যে ব্যক্তি অক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় আইন ভঙ্গ করার কোন প্রেরণা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে এর মধ্য থেকে কোনটা খায়, সে জন্য তার কোন গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও কর্মণাময়।<sup>۱۹۲</sup>

১৬৪. অর্থাৎ এটা ঈমানের দাবী। একজন ঈমানদারের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্য সবার সন্তুষ্টির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে এবং কোন জিনিসের প্রতি ভালোবাসা তার মনে এমন প্রভাব কিঞ্চিৎ করবে না এবং এমন মর্যাদার আসনে সমাজীন হবে না যার ফলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার মোকাবিলায় তাকে পরিহার করতে সে কখনো কৃষ্ণিত হবে না।

১৬৫. এখানে পথডেকারী নেতৃবর্গ ও তাদের নির্বোধ অনুসারীদের পরিণতির উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতরা যে সমস্ত ভূলের শিকার হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছিল মুসলমানরা যেন সে সম্পর্কে সতর্ক হয় এবং ভূল ও নির্ভূল নেতৃত্ব এবং সঠিক ও বেঠিক নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। ভূল ও বেঠিক নেতৃত্বের পেছনে চলা থেকে যেন তারা নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারে।

১৬৬. অর্থাৎ পানাহারের ক্ষেত্রে কুসংস্কার ও জাহেলী রাতিনীতির ভিত্তিতে যেসব বিধি-নিয়েদের প্রচলন রয়েছে সেগুলো ভেঙে ফেলো।

১৬৭. অর্থাৎ এই সমস্ত কুসংস্কার ও তথ্যকথিত বিধি-নিয়েদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্মীয় বিষয়াবন্নী মনে করা আসলে শয়তানী প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে, এ ধারণার পেছনে কোন প্রমাণ নেই।

১৬৮. অর্থাৎ বাপ-দাদাদের থেকে এভাবেই চলে আসছে এ ধরনের খোঢ়া যুক্তি পেশ করা ছাড়া তাদের কাছে এসব বিধি-নিয়েধের পক্ষে পেশ করার মতো আর কোন সবল যুক্তি-প্রমাণ নেই। বোকারা মনে করে কোন পদ্ধতির অনুসরণ করার জন্য এই ধরনের যুক্তি যথেষ্ট।

১৬৯. এই উপমাটির দু'টি দিক রয়েছে। এক, তাদের অবস্থা সেই নির্বোধ প্রাণীদের মতো, যারা এক একটি পালে বিভক্ত হয়ে নিজেদের রাখালদের পেছনে চলতে থাকে এবং না জেনে বুঝেই তাদের ইক-ডাকের ওপর চলতে ফিরতে থাকে। দুই, এর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, তাদেরকে আহবান করার ও তাদের কাছে দীনের দাওয়াত প্রচারের সময় মনে হতে থাকে যেন নির্বোধ ঝন্তু-জানোয়ারদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে, তারা কেবল আওয়াজ শুনতে পারে কিন্তু কি বলা হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারে না। আল্লাহ এখানে এমন ঘূর্ণবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার ফলে এই দু'টি দিকই এখানে একই সাথে ফুটে উঠেছে।

১৭০. অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমান এনে কেবলমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকো, যেমন তোমরা দাবী করছো, তাহলে জাহেলী যুগে তোমাদের ধর্মীয় পত্তি, পুরোহিত, পাদরী, যাজক, যোগী ও সন্যাসীরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব অবাঞ্ছিত আচার-আচরণ ও বিধি-নিয়েধের বেড়াজাল সৃষ্টি করেছিল সেগুলো ছির তির করে দাও। আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে অবশ্যি দূরে থাকো। কিন্তু যেগুলো আল্লাহ হালাল করেছেন কোন প্রকার ঘৃণা-সংকোচ ছাড়াই সেগুলো পানাহার করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসে এদিকেই ইংগিত করেছেন।

**مَنْ صَلَّى صَلَوَاتَنَا وَاسْتَقَبَلَ قِبَلَتَنَا وَأَكَلَ زِيَختَنَا فَذَلِكَ**

**الْمُسْلِمُ الْخ**

“যে ব্যক্তি আমাদের মতো করে নামায পড়ে, আমরা যে কিব্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়ি তার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খায় সে মুসলমান।”

এর অর্থ হচ্ছে, নামায পড়া ও কিব্লাহর দিকে মুখ করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে পানাহারের ব্যাপারে অতীতের জাহেলী যুগের বিধি-নিয়েধগুলো ভেঙ্গে ফেলে এবং জাহেলিয়াত পর্হীরা এ ব্যাপারে যে সমস্ত কৃসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়। কারণ এই জাহেলী বিধি-নিয়েধগুলো মেনে চলাটাই একথা প্রমাণ করবে যে, জাহেলিয়াতের বিষ এখনো তার শিরা উপশিরায় গতিশীল।

১৭১. এই নিয়েধাজ্ঞাটি এমন সব প্রাণীর গোশতের ওপর আরোপিত হয় যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নামে যবেহ করা হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে নজরানা হিসেবে যে খাদ্য তৈরি করা হয় তার ওপরও আরোপিত হয়। আসলে প্রাণী, শস্য, ফলমূল বা অন্য যে কোন খাদ্যের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই ঐ জিনিসগুলো আমাদের

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا  
 قَلِيلًاٌ وَلِئَكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا نَارٌ وَلَا يَكِلُّهُمْ  
 اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزْكِي هُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>১৩</sup> وَلِئَكَ الَّذِينَ  
 اشْتَرَوُ الْفَلَلَةَ بِالْهُدْىٰ وَالْعَنَّابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَىٰ  
 النَّارِ<sup>১৪</sup> ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا  
 فِي الْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ<sup>১৫</sup>

মূলত আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে সমস্ত বিধান অবতীর্ণ করেছেন সেগুলো যারা গোপন করে এবং সামান্য পার্থির স্বার্থের বেদীমূলে সেগুলো বিসর্জন দেয় তারা আসলে আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করছে।<sup>১৩</sup> কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেন না, তাদের পবিত্রতার ঘোষণাও দেবেন না<sup>১৪</sup> এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরাই হিদায়তের বিনিময়ে ঝষ্টতা কিনে নিয়েছে এবং ক্ষমার বিনিময়ে কিনেছে শাস্তি। এদের কী অদ্ভুত সাহস দেখো। জাহানামের আয়াব বরদাস্ত করার জন্যে এরা প্রস্তুত হয়ে গেছে। এসব কিছুই ঘটার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তো যথার্থ সত্য অনুযায়ী কিতাব নাখিল করেছিলেন কিন্তু যারা কিতাবে মতবিরোধ উদ্ভাবন করেছে তারা নিজেদের বিরোধের ক্ষেত্রে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

দান করেছেন। কাজেই সেগুলোর ওপর অনুগ্রহের স্বীকৃতি, সাদকাহ বা নজরানা হিসেবে একমাত্র আল্লাহরই নাম নেয়া যেতে পারে। আর কারোর নয়। এগুলোর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়ার অর্থ হবে, আল্লাহর পরিবর্তে অথবা আল্লাহর সাথে সাথে তার প্রাধান্যও স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে এবং তাকেও অনুগ্রহকারী ও নিয়ামত দানকারী মনে করা হচ্ছে।

১৭২. এই আয়াতে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে হারাম জিনিসের ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এক, যথার্থ অক্ষমতার মুখ্যমূল্য হলে, যেমন ক্ষুধা বা পিপাসা প্রাণ সংহারক প্রমাণিত হতে থাকলে, অথবা রোগের কারণে প্রাণনাশের আশংকা থাকলে এবং এ অবস্থায় হারাম জিনিস ছাড়া আর কিছু না পাওয়া গেলে। দুই, মনের মধ্যে আল্লাহর আইন তৎগ করার ইচ্ছা পোষণ না করলে। তিনি, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করলে যেমন

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولِوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
 وَلِكُنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَبِ  
 وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حِبَّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  
 وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
 الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكُوْنَ وَالْمُؤْمِنُ بِعَهْدِهِ إِذَا عَمَلَ وَاعْ  
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۖ أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ صَلَّقُوا ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

২২ ইকু

তোমাদের মূখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাবার মধ্যে কোন পুণ্য নেই। ১৭৫  
 বরং সৎকাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতা আল্লাহর  
 অবতীর্ণ কিতাব ও নবীদেরকে মনে প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বৃক্ষ  
 হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির,  
 সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর নামায কায়েম  
 করবে এবং যাকাত দান করবে। যাত্রা অংগীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং  
 বিপদে-অনটনে ও হক-বাতিলের সংগ্রামে সবর করবে তারাই সৎ ও সত্যাগ্রহী  
 এবং তারাই মুস্তাকী।

কোন হারাম পানীয়ের কয়েক ফৌটা বা কয়েক ঢেক পান করলে অথবা হারাম খাদ্যের  
 কয়েক মুঠো খেলে যদি প্রাণ বীচে তাহলে তার বেশী ব্যবহার না করা।

১৭৩. এর অর্থ হচ্ছে, সাধারণ লোকদের মধ্যে যত প্রকার বিভিন্নিকর কুসংস্কার  
 প্রচলিত আছে এবং বাতিল রীতিনীতি ও অর্থহীন বিধি-নিয়েদের যেসব নতুন নতুন  
 শরীয়াত তৈরি হয়ে গেছে—এসবগুলোর জন্য দায়ী হচ্ছে সেই আলেম সমাজ, যাদের কাছে  
 আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ছিল কিন্তু তারা সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌছায়নি। তারপর  
 অঙ্গতার কারণে লোকদের মধ্যে যখন ভুল পদ্ধতির প্রচলন হতে থাকে তখনে ঐ জালেম  
 গোষ্ঠী মুখ বক্ষ করে বসে থেকেছে। বরং আল্লাহর কিতাবের বিধানের ওপর আবরণ পড়ে  
 থাকাটাই নিজেদের জন্য লাজুলক বলে তাদের অনেকেই মনে করেছে।

بِأَيْمَانِهِ أَنِّي نَسِيَتُ كِتَابَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلِ إِنَّ  
بِالْحِرْرِ وَالْعَبْلِ بِالْعَبْلِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عَفَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
شَرِعَ فَاتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَادْعُوا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ  
مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْذَلَ فَعَلَّمَهُ فَلَهُ عَلَّمَانِ أَبْلَغَ

হে ইমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে।<sup>১৭৬</sup> স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে তার বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাস হত্যাকারী হলে ঐ দাসকেই হত্যা করা হবে, আর নারী এই অপরাধ সংঘটিত করলে সেই নারীকে হত্যা করেই এর কিসাস নেয়া হবে।<sup>১৭৭</sup> তবে কোন হত্যাকারীর সাথে তার ভাই যদি কিছু কোমল ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়,<sup>১৭৮</sup> তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী<sup>১৭৯</sup> রক্তপণ দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সততার সঙ্গে রক্তপণ আদায় করা হত্যাকারীর জন্য অপরিহার্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাঢ়াবাঢ়ি করবে<sup>৮০</sup> তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৪. যেসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মিথ্যা দাবী করে এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রচারণা চালায় এখানে আসলে তাদের সমস্ত দাবী ও প্রচারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা সঙ্গব্য সকল উপায়ে নিজেদের পৃত-পবিত্র সন্তান অধিকারী হবার এবং যে ব্যক্তি তাদের পেছনে চলবে কিয়ামতের দিন আন্তরাহ কাছে তার সুপারিশ করে তার গোনাহখাতা মাফ করিয়ে নেয়ার ধারণা জনগণের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে এবং জনগণও তাদের একথায় বিশ্বাস করে। জবাবে মহান ও সর্বশক্তিমান আন্তরাহ বলছেন, আমি তাদের সাথে কথাই বলবো না এবং তাদের পবিত্রতার ঘোষণাও দেবো না।

১৭৫. পূর্ব ও পশ্চিমের দিকে মুখ করার বিষয়টিকে নিছক উপমা হিসেবে আনা হয়েছে। আসলে এখানে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে, ধর্মের কতিপয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করা, শুধুমাত্র 'নিয়ম' পালনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কয়েকটা ধর্মীয় কাজ করা এবং তাকওয়ার কয়েকটা পরিচিত রূপের প্রদর্শনী করা আসল সংকাজ নয় এবং আন্তরাহ কাছে এর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই।

১৭৬. 'কিসাস' হচ্ছে রক্তপাতের বদলা বা প্রতিশোধ। অর্থাৎ হত্যাকারীর সাথে এমন ব্যবহার করা যেমন সে নিহত ব্যক্তির সাথে করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, হত্যাকারী যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ঠিক সেভাবেই তাকেও হত্যা করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে একজনকে হত্যা করেছে, তাকেও হত্যা করা হবে।

১৭৭. জাহেলী যুগে হত্যার বদলা নেয়ার ব্যাপারে একটি পদ্ধতি প্রচলন ছিল। কোন জাতি বা গোত্রের লোকেরা তাদের নিহত ব্যক্তির রক্তকে যে পর্যামের মূল্যবান মনে করতো হত্যাকারীর পরিবার, গোত্র বা জাতির কাছ থেকে ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যের রক্ত আদায় করতে চাইতো। নিহত ব্যক্তির বদলায় কেবলমাত্র হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করেই তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতো না। বরং নিজেদের একজন লোক হত্যা করার প্রতিশোধ নিতে চাইতো তারা প্রতিপক্ষের শত শত লোককে হত্যা করে। তাদের কোন অভিজাত ও সমানী ব্যক্তি যদি অন্য গোত্রের একজন সাধারণ ও নীচু শ্রেণির লোকের হাতে মারা যেতো, তাহলে এ ক্ষেত্রে তারা নিষ্ক হত্যাকারীকে হত্যা করাই যথেষ্ট মনে করতো না। বরং হত্যাকারীর গোত্রের ঠিক সমপরিমাণ অভিজাত ও মর্যাদাশীল কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করতে অধিবা তাদের কয়েকজনকে হত্যা করতে চাইতো। বিগরীত পক্ষে নিহত ব্যক্তি তাদের দুষ্টিতে যদি কোন সামান্য ব্যক্তি হতো আর অন্যদিকে হত্যাকারী হতো বেশী মর্যাদাশীল ও অভিজাত, তাহলে এ ক্ষেত্রে তারা নিহত ব্যক্তির প্রাণের বদলায় হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করতে দিতে চাইতো না। এটা কেবল প্রাচীন জাহেলী যুগের রেওয়াজ ছিল না। বর্তমান যুগেও যাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুসভ্য জাতি মনে করা হয় তাদের সরকারী ঘোষণাবলীতেও অনেক সময় নির্ণজ্ঞের মতো দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দেয়া হয় : আমাদের একজন নিহত হলে আমরা হত্যাকারীর জাতির পঞ্চাশজনকে হত্যা করবো। প্রায়ই আমরা শুনতে পাই, এক ব্যক্তিকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির আটককৃত বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। এই বিশ শতকের একটি ‘সুসভ্য’ জাতি নিজেদের এক ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে সমগ্র মিসরীয় জাতির ওপর। অন্যদিকে এই তথাকথিত সুসভ্য জাতিগুলোর বিধিবন্ধ আদালতসমূহেও দেখা যায়, হত্যাকারী যদি শাসক জাতির এবং নিহত ব্যক্তি পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তাদের বিচারকরা প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত দিতে চায় না। এসব অন্যায় ও অবিচারের পথ বঙ্গ করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারীর কোন প্রকার মর্যাদার বাছ-বিচার না করে নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র হত্যাকারীরই প্রাণ সংহার করা হবে।

১৭৮. “ভাই” শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মধ্যে চরম শক্তির সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃসমাজেরই একজন সদস্য। কাজেই তোমাদের একজন অপরাধী ভাইয়ের বিমুক্তে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে নিজেদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে যদি দমন করতে পারো তাহলে এটাই হবে তোমাদের মানবিক ব্যবহারের যথার্থ উপযোগী। এ আয়াত থেকে একথাও জানা গেলো যে, ইসলামী দণ্ডবিধিতে নরহত্যার মতো মারাত্মক বিষয়টিও উভয় পক্ষের মজীর ওপর নির্ভরশীল। নিহত : ব্যক্তির উভরাধিকারীরা হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়ার অধিকার রাখে এবং এ অবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের ওপর জোর দেয়া আদালতের জন্য বৈধ নয়। তবে পরবর্তী আয়াতগুলোর বর্ণনা অনুযায়ী হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়া হলে তাকে অবশ্যি রক্তপণ আদায় করতে হবে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِبْوَةٌ يَا وَلِي الْأَلَابَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ  
 ১৩) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَهْلَكُمُ الْمَوْتَ إِنَّ تَرْكَ خَيْرًا<sup>الْوَصِيَّةُ</sup>  
 لِلَّوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ১৪) فَمَنْ  
 بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَعَى فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَيِّنُونَهُ إِنَّ اللَّهَ  
 سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ১৫) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْمِنٍ جَنَفَأَوْ إِثْمًا فَاصْلُحْ بَيْنَهُمْ  
 ১৬) فَلَا إِثْمَرَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরা। তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে। ১৮১ আশা করা যায়, তোমরা এই আইনের বিরক্তাচরণ করার ব্যাপারে সতর্ক হবে।

তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে যেতে থাকলে পিতামাতা ও আত্মীয় ব্রজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরয করা হয়েছে, মৃত্যুকীদের জন্য এটা একটা অধিকার। ১৮২ তারপর যদি কেউ এই অসিয়ত শুনার পর তার মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলে তাহলে ঐ পরিবর্তনকারীরাই এর সমস্ত গোনাহের ভাগী হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পক্ষপাতিত্ব বা হক নষ্ট হবার আশংকা করে এবং সে বিষয়টির সাথে সম্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ফীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৭৯. এখানে কুরআনে “মা’রফ” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে ওঠে হী এটিই তারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রাইতিকেও (Common Law) ইসলামী পরিভাষায় “উরফ” ও “মা’রফ” বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরীয়াত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি এমন সব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

১৮০. যেমন হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ আদায় করার পরও আবার প্রতিশোধ নেয়ার প্রচেষ্টা চালায় অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করার ব্যাপারে টালবাহানা করে

০<sup>০</sup> এবং নিঃহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তার প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করে নিজের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের মাধ্যমে তার জবাব দেয়। এসবগুলোকেই বাড়াবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৮১. এটি দ্বিতীয় একটি জাহেলী চিন্তা ও কর্মের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আগের মতো আজো বহু মন্ত্রিকে এই চিন্তা দানা বেঁধে আছে। জাহেলিয়াত পছন্দের একটি দল যেমন প্রতিশেখ গ্রহণের প্রশ্নে এক প্রাতিকাতায় চলে গেছে তেমনি আর একটি দল ক্ষমার প্রশ্নে আর এক প্রাতিকাতায় চলে গেছে এবং প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে তারা এমন জবরদস্ত প্রচারণা চালিয়েছে যার ফলে অনেক লোক একে একটি ঘৃণ্য ব্যাপার মনে করতে শুরু করেছে এবং দুনিয়ার বহু দেশ প্রাণদণ্ড রহিত করে দিয়েছে। কুরআন এ প্রসঙ্গে বৃদ্ধি-বিবেক সম্পর্ক ব্যক্তিদের সম্মোধন করে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, কিসাস বা 'প্রাণ হত্যার শাস্তি স্থরূপ প্রাণদণ্ডাদেশের' ওপর সমাজের জীবন নির্ভর করছে। মানুষের প্রাণের প্রতি যারা মর্যাদা প্রদর্শন করে না তাদের প্রাণের প্রতি যে সমাজ মর্যাদা প্রদর্শন করে সে আসলে তার জামার আস্তিনে সাপের লালন করছে। তোমরা একজন হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা করে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের প্রাণ সংকটাপন্ন করে তুলছো।

১৮২. এ বিধানটি এমন এক যুগে দেয়া হয়েছিল, যখন উত্তরাধিকার বটন সম্পর্কিত কোন আইন ছিলো না। সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে অসিয়তের মাধ্যমে তার উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এভাবে মৃত্যুর পরে পরিবারের মধ্যে কোন বিরোধ এবং কোন হকদারের হক নষ্ট হবারও ভয় থাকে না। পরে উত্তরাধিকার বটনের জন্য আল্লাহ নিজেই যখন একটি বিধান দিলেন (সূরা আল নিসায় এ সম্পর্কিত বিভাগিত আলোচনা করা হয়েছে) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াসীয়ত ও মীরাসের বিধান ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিহোক্ত নিয়ম দু'টি ব্যক্ত করলেন :

এক : এখন থেকে ওয়ারিসের জন্য কোন ব্যক্তি আর কোন অসিয়ত করতে পারবে না। অর্থাৎ যেসব আত্মীয়ের অংশ কুরআন নির্ধারিত করে দিয়েছে, অসিয়তের মাধ্যমে তাদের অংশ কম-বেশী করা যাবে না এবং কোন ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীকে মীরাস থেকে বক্ষিতও করা যাবে না। আর কোন ওয়ারিস আইনগতভাবে যা পায় অসিয়তের সাহায্যে তার চেয়ে বেশী কিছু তাকে দেয়াও যাবে না।

দুই : সমগ্র সম্পদ ও সম্পত্তির মাত্র তিনি তাগের এক ভাগ অসিয়ত করা যেতে পারে।

এ দু'টি ব্যাখ্যামূলক নির্দেশের পর এখন এই আয়াতের অর্থ দাঢ়াচ্ছে, সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিসদের জন্য রেখে যেতে হবে। মৃত্যুর পর এগুলো মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে কুরআন নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী বিটিত হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যেতে পারে তার এমন সব আত্মীয়ের জন্য যারা তার উত্তরাধিকারী নয়। তার নিজের গৃহে বা পরিবারে যারা সাহায্য লাভের মুখাপেক্ষী অথবা পরিবারের বাইরে যাদেরকে সে সাহায্য লাভের যোগ্য মনে করে বা যেসব জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য দান করা প্রয়োজনীয় বলে সে মনে করে—এমন সব ক্ষেত্রে সে এই এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত করে যেতে পারে। পরবর্তীকালে লোকেরা এ

يَا يَهَا أَلِّيْنَ أَمْنَوْا كَتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  
 الِّيْنَ يِنْ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ ۝ أَيَا مَا مَعْلُودٍ دِتْ فِمَنْ  
 كَانَ مِنْكُمْ رَبِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَلَّهُ مِنْ أَيَا مِنْ أَخْرَ وَعَلَى  
 الِّيْنَ يِنْ يَطِيقُونَهُ فِلَيْهِ طَعَامٌ مِسْكِينٌ ۝ فِمَنْ تَطْوعَ خَيْرًا فَهُوَ  
 خَيْرٌ لَهُ ۝ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

## ২৩ রূক্তি

হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোয়া ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে।<sup>১৮৩</sup> এ কতিপয় নির্দিষ্ট দিনের রোয়া। যদি তোমাদের কেউ হয়ে থাকে রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় এই সংখ্যা পূর্ণ করে। আর যাদের রোয়া রাখার সামর্থ আছে (এরপরও রাখে না) তারা যেন ফিদিয়া দেয়। একটি রোয়ার ফিদিয়া একজন মিস্কিনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি ব্রেঙ্গায় ও সানলে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য ভালো। তবে যদি তোমরা সঠিক বিশয় অনুধাবন করে থাকে<sup>১৮৪</sup> তাহলে তোমাদের জন্য রোয়া রাখাই ভালো।<sup>১৮৫</sup>

অসিয়তের নির্দেশটিকে নিচেক একটি সুপারিশমূলক বিধান গণ্য করে। এমনকি সাধারণতাবে অসিয়ত একটি 'মানসু' বা রাহিত পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদে এটিকে একটি 'হক'—অধিকার গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুস্তাকীদের ওপর এই হক বর্তেছে। এই হকটি যথাযথতাবে আদায় করা হতে থাকলে মীরাসের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং যেগুলো আজকের সমাজ মানসকে অনেক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে তার মীমাংসা অতি সহজেই হয়ে যেতে পারে। যেমন দাদা ও নানার জীবদ্ধশায় যেসব নাতি-নাতনীর বাপ বা মা মারা যায় তাদেরকে এই এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত থেকে সহজেই অংশ দান করা যায়।

১৮৩. ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো রোয়াও পর্যায়ক্রমে ফরয হয়। শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে মাত্র প্রতি মাসে তিন দিন রোয়া রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রোয়া ফরয ছিল না। তারপর হিজরীতে রম্যান মাসের রোয়ার এই বিধান কুরআনে নাফিল হয়। তবে এতে এতটুকুন সুযোগ দেয়া হয়, রোয়ার কষ্ট বরদাশত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা রোয়া রাখবেন না তারা প্রত্যেক রোয়ার

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبِنُصْرٍ  
 مِنَ الْمُهْلِكِيْ وَالْفَرَقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِلَ مِنْكُرَ الشَّهْرِ فَلِيَصْمِهِ  
 وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى ۖ يُرِيدُ اللَّهُ  
 بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلَتُكَبِّرُوا الْعِلَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا  
 اللَّهَ عَلَى مَا هُلَّ بِكُمْ ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং এমন ঘৃথহীন শিক্ষা সর্বনিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কাজেই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাত পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোয়া রাখা অপরিহার্য এবং যে ব্যক্তি রোগঘন্ট হয় বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য দিনগুলোয় রোয়ার সংখ্যা পূর্ণ করে। ১৮৬ আল্লাহ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না। তাই তোমাদেরকে এই পদ্ধতি জানানো হচ্ছে, যাতে তোমরা রোয়ার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন সে জন্য যেন তোমরা আল্লাহর শেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তার স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। ১৮৭

বদলে একজন মিসকিনকে আহার করাবে। পরে দ্বিতীয় বিধানটি নাযিল হয়। এতে পূর্ব পদ্ধতি সাধারণ সুযোগ বাতিল করে দেয়া হয়। কিন্তু রোগী মুসাফির, গর্ভবতী মহিলা বা দুষ্প্রাপ্য শিশুর মাতা এবং রোয়া রাখার ক্ষমতা নেই এমন সব বৃন্দদের জন্য এ সুযোগটি আগের মতোই বহাল রাখা হয়। পরে ওদের অক্ষমতা দ্বর হয়ে গেলে রমযানের যে ক'টি রোয়া তাদের বাদ গেছে সে ক'টি প্রৱণ করে দেয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

১৮৪. অর্থাৎ একাধিক মিসকিনকে আহার করায় অথবা রোয়াও রাখে আবার মিসকিনকেও আহার করায়।

১৮৫. দ্বিতীয় হিজরাতে বদর যুদ্ধের আগে রমযানের রোয়া সম্পর্কে যে বিধান নাযিল হয়েছিল এ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক বিধানই বর্ণিত হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াত এর এক বছর পরে নাযিল হয় এবং বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।

১৮৬. সফররত অবস্থায় রোয়া না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা ও পর্যন্তের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে যেতেন। তাদের কেউ রোয়া রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরম্পরের বিরুদ্ধে

আপন্তি উঠাতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও সফরে কখনো রোয়া রেখেছেন, কখনো রাখেননি। এক সফরে এক ব্যক্তি বেহশ হয়ে পড়ে গেলো। তার চারদিকে লোক জড়ে হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো, এই ব্যক্তি রোয়া রেখেছে। জবাব দিলেন : এটা সৎকাজ নয়। যুদ্ধের সময় তিনি রোয়া না রাখার নির্দেশ জারী করতেন, যাতে দুশমনের সাথে পাঞ্জা লড়াবার ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা দেখা না দেয়। হযরত উমর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, “দু’বার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রম্যান মাসে যুদ্ধে যাই। প্রথমবার বদরে এবং শেষবার মক্কা বিজয়ের সময়। এই দু’বারই আমরা রোয়া রাখিনি।” ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : “এটা কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের দিন, কাজেই রোয়া রেখো না।” অন্য হাদীসে নিমোক্তভাবে বলা হয়েছে : نَكِمْ قَدْ دَنُوتْمَ عَدُوكْ فَقَطْرُواْ أَقْوَىْ لَكُمْ অর্থাৎ “শক্রের সাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কাজেই রোয়া রেখো না। এর ফলে তোমরা যুদ্ধ করার শক্তি অর্জন করতে পারবে।”

সাধারণ সফরের ব্যাপারে কতটুকুন দূরত্ব অতিক্রম করলে রোয়া ভাঙা যায়, রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট হয় না। সাহাবায়ে কেরামের কাজও এ ব্যাপারে বিভিন্ন। এ ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে পরিমাণ দূরত্ব সাধারণে সফর হিসেবে পরিগণিত এবং যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলে মুসাফিরী অবস্থা অনুভূত হয়, তাই রোয়া ভাঙার জন্য যথেষ্ট।

যেদিন সফর শুরু করা হয় সেদিনের রোয়া না রাখা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাধীন, এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। মুসাফির চাইলে ঘর থেকে খেয়ে বের হতে পারে আর চাইলে ঘর থেকে বের হয়েই খেয়ে নিতে পারে। সাহাবীদের থেকে উভয় প্রকারের কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন শহর শক্রদের দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই শহরের অধিবাসীরা নিজেদের শহরে অবস্থান করা সত্ত্বেও জিহাদের কারণে রোয়া ভাঙ্গতে পারে কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কোন কোন আলেম এর অনুমতি দেননি। কিন্তু আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে এ অবস্থায় রোয়া ভাঙ্গকে পুরোপুরি জায়ে বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

১৮৭. অর্থাৎ আল্লাহ রোয়া রাখার জন্য কেবল রম্যান মাসের দিনগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং কোন শরীয়ত সমর্থিত ওজরের কারণে যারা রম্যানে রোয়া রাখতে অপারগ হয় তারা অন্য দিনগুলোয় এই রোয়া রাখতে পারে, এর পথও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। মানুষকে কুরআনের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তার শুকরিয়া আদায় করার মূল্যবান সুযোগ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা।

এ প্রসংগে একথাটি অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, রম্যানের রোয়াকে কেবলমাত্র তাকওয়ার অনুবীক্ষনই গণ্য করা হয়নি বরং কুরআনের আকারে আল্লাহ যে বিরাট ও মহান নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন রোয়াকে তার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবেও

وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ  
إِذَا دَعَانِ «فَلَيَسْتَجِيبُوا إِلَيْيِ وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعْلَمْ يَرْشَدُونَ

আর হে নবী! আমার বাস্তা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজেস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার উপর ঈমান আনা উচিত।<sup>১৮৮</sup> একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, ইয়তো সত্য-সরল পথের সঞ্চান পাবে।<sup>১৮৯</sup>

গণ্য করা হয়েছে। আসলে একজন বৃক্ষিমান, জ্ঞানী ও সুবিবেচক ব্যক্তির জন্য কোন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের এবং কোন অনুগ্রহের বীকৃতি প্রদানের জন্য সর্বোন্ম পদ্ধতি একটিই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে পূর্ণ করার জন্য সেই নিয়ামতটি দান করা হয়েছিল তাকে পূর্ণ করার জন্য নিজেকে সর্বান্তকভাবে প্রস্তুত করা। কুরআন আমাদের এই উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে যে, আমরা এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ জেনে নিয়ে নিজেরা সে পথে চলবো এবং অন্যদেরকেও সে পথে চলাবো। এই উদ্দেশ্যে আমাদের তৈরি করার সর্বোন্তক মাধ্যম হচ্ছে রোয়া। কাজেই কুরআন নাখিলের মাসে আমাদের রোয়া রাখা কেবল ইবাদাত ও নৈতিক অনুশীলনই নয় বরং এই সংগে কুরআন রূপ নিয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া আদায়ও এর মাধ্যমে সম্ভব হয়।

১৮৮. অর্থাৎ যদিও তোমরা আমাকে দেখতে পাও না এবং ইল্লিয়ের সাহায্যে অনুভবও করতে পারো না তবুও আমাকে তোমাদের থেকে দূরে মনে করো না। আমি আমার প্রত্যেক বাস্তার অতি নিকটেই অবস্থান করছি। যখনই তারা চায় আমার কাছে আর্জি পেশ করতে পারে। এমনকি মনে মনে আমার কাছে তারা যা কিছু আবেদন করে তাও আমি শুনতে পাই। আর কেবল শুনতেই পাই না বরং সে সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করি। নিজেদের অঙ্গতা ও মূর্খতার কারণে যে সমস্ত অলীক, কান্দনিক ও অক্ষম সন্তানদেরকে তোমরা উপাস্য ও প্রত্বু গণ্য করেছো তাদের কাছে তোমাদের নিজেদের দৌড়িয়ে যেতে হয় এবং তারপরও তারা তোমাদের কোন আবেদন নিবেদন শুনতে পায় না। তোমাদের আবেদনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অন্যদিকে আমি হচ্ছি এই বিশাল বিস্তৃত বিশ্ব-জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি। সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তোমাদের এতো কাছে আমি অবস্থান করি যে, কোন প্রকার মাধ্যম ও সুপারিশ ছাড়াই তোমরা নিজেরাই সরাসরি সর্বত্র ও সবসময় আমার কাছে নিজেদের আবেদন নিবেদন পেশ করতে পারো। কাজেই একের পর এক অক্ষম ও বানোয়াট খোদার দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকে মরার অঙ্গতা ও মূর্খতার বেড়াজ্ঞাল তোমরা ছিড়ে ফেলো। আমি তোমাদের যে আহবান জানাচ্ছি সে আহবানে সাড়া দাও। আমার আদর্শকে আঁকড়ে ধরো। আমার দিকে ফিরে এসো। আমার উপর নির্তর করো। আমার বন্দেগী ও আনুগত্য করো।

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ  
 لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَيْمَ اللَّهُ أَنْكَرَ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ  
 أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ  
 وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ  
 الْخَيْطُ الْأَبِيسُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَنْمُوا الصِّيَامَ  
 إِلَى الظَّلَلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِيفُونَ «فِي الْمَسْجِلِ»  
 تِلْكَ حُلُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كُلُّ لَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقَوَّنُ ﴿٦﴾

রোয়ার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।<sup>১৯০</sup> আগ্নাহ জানতে পেরেছেন, তোমরা চূপি চূপি নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্঵সঘাতকতা করছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিবাস করো এবং যে স্বাদ আগ্নাহ তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো।<sup>১৯১</sup> আর পানাহার করতে থাকে।<sup>১৯২</sup> যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা সুষ্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।<sup>১৯৩</sup> তখন এসব কাজ ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত নিজের রোয়া পূর্ণ করো।<sup>১৯৪</sup> আর যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফে বসো তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।<sup>১৯৫</sup> এগুলো আগ্নাহের নির্ধারিত সীমাবেষ্টি, এর ধারে কাছেও যেয়ো না।<sup>১৯৬</sup> এভাবে আগ্নাহ তাঁর বিধান লোকদের জন্য সুষ্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় এর ফলে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

১৮৯. অর্থাৎ তোমার মাধ্যমে এই ক্রম সত্য জ্ঞানার পর তাদের চোখ খুলে যাবে। তারা সঠিক ও নির্ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করবে, যার মধ্যে তাদের নিজেদের কল্যাণ নিহিত।

১৯০. অর্থাৎ পোশাক ও শরীরের মাঝখানে যেমন কোন পরদা বা আবরণ থাকতে পারে না এবং উভয়ের সম্পর্ক ও সম্মিলন হয় অবিছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য, ঠিক তেমনি তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কও।

১৯১. শুরুতে রম্যন মাসের রাত্রিকালে স্ত্রীর সাথে রাত্রিবাস করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সংযুক্ত কোন সূপ্রট নির্দেশ না থাকলেও লোকেরা এমনটি করা অবৈধ মনে করতো। তারপর এই অবৈধ বা অপচন্দনীয় হবার ধারণা মনে মনে পোষণ করে অনেক সময় তারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে চলে যেতো। এটা যেন নিজের বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হতো। এর ফলে তাদের মধ্যে একটি অপরাধ ও পাপ মনোবৃত্তির লালনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ প্রথমে তাদেরকে বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন অতপর বলেছেন, এটি তোমাদের জন্য বৈধ। কাজেই এখন তোমরা খারাপ কাজ মনে করে একে করো না বরং আল্লাহ প্রদত্ত অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে মন ও বিবেকের পূর্ণ পরিত্রাতা সহকারে করো।

১৯২. এ ব্যাপারেও শুরুতে লোকদের ভুল ধারণা ছিল। কারোর ধারণা ছিল, এশার নামায পড়ার পর থেকে পানাহার হারাম হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করতো, রাতে যতক্ষণ জেগে থাকা হয় ততক্ষণ পানাহার করা যেতে পারে, ঘুমিয়ে পড়ার পর আবার উঠে কিছু খাওয়া যেতে পারে না। লোকেরা মনে মনে এই বিধান কল্পনা করে ব্রেথেছিল এর ফলে অনেক সময় তাদের বড়ই ভোগাত্তি হতো। এই আয়াতে এই ভুল ধারণাগুলো দূর করা হয়েছে। এখানে রেয়ার সীমানা বর্ণনা করা হয়েছে প্রভাতের শেত আভার উদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অন্যদিকে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে প্রভাতের সাদা রেখা জেগে না ওঠা পর্যন্ত সারা রাত পানাহার ও স্ত্রীসংগোগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেহোৱা খাওয়ার নিয়মের প্রচলন করেছেন, যাতে প্রভাতের উদয়ের ঠিক পূর্বেই লোকেরা তালোভাবে পানাহার করে নিতে পারে।

১৯৩. ইসলাম তার ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য সময়ের এমন একটি মান নির্ণয় করে দিয়েছে যার ফলে দুনিয়ায় সর্বকালে সকল তামাদুনিক ও সাঙ্গৃতিক পরিবেশে শালীত লোকেরা সব দেশে ও সব জায়গায় ইবাদাতের সময় নির্ধারণ করে নিতে সক্ষম হয়। ঘড়ির সাহায্যে সময় নির্ধারণ করার পরিবর্তে আকাশে ও দিগন্তে উদ্ভাসিত সূপ্রট নির্দশনসমূহের প্রেক্ষিতে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু অন্ত ও আনাড়ী লোকেরা এই সময় নির্ধারণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে সাধারণত এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেছে যে, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটে, যেখানে রাত ও দিন হয় কয়েক মাসের, সেখানে এই সময় নির্ধারণ পদ্ধতি কিভাবে কাজে লাগবে? অথচ অগভীর ভূগোল জ্ঞানের কারণে তাদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছে। আসলে আমরা বিশুব রেখার আশেপাশের এলাকার লোকেরা যে অর্থে দিন ও রাত শব্দ দু'টি বলে থাকি উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু এলাকায় ঠিক সেই অর্থে ছ'মাস রাত ও ছ'মাস দিন হয় না। রাত্রির পালা বা দিনের পালা যাই হোক না কেন, মোট কথা সকাল ও সন্ধ্যার আলামত সেখানে যথারীতি দিগন্তে ফুটে ওঠে এবং তারই প্রেক্ষিতে সেখানকার লোকেরা আমাদেরই মতো নিজেদের ঘুমোবার, জাগবার, কাজকর্ম করার ও বেড়াবার আয়োজন করে থাকে। যে যুগে ঘড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল না সে যুগেও ফিল্যাও, নরওয়ে, শ্রীল্যাঙ্ক ইত্যাদি দেশের লোকেরা নিজেদের সময় অবশ্য জেনে নিতো।

সে আমলে তাদের সময় জানার উপায় ছিল এই দিগন্তের আলামত। কাজেই দুনিয়ার আর সব ব্যাপারে এই আলামতগুলো যেমন তাদের সময় নির্ধারণে সাহায্য করতে তেমনিভাবে নামায, রোয়া, সেহরী ও ইফতারের ব্যাপারেও তাদের সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম।

১৯৪. রাত পর্যন্ত রোয়া পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে, যেখানে রাতের সীমানা শুরু হচ্ছে সেখানে তোমাদের রোয়ার সীমানা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সবাই জানেন, রাতের সীমানা শুরু হয় সূর্যাস্ত থেকে। কাজেই সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা উচিত। সেহরী ও ইফতারের সঠিক আলামত হচ্ছে, রাতের শেষ ভাগে যখন পূর্ব দিগন্তে প্রভাতের শুভতার সরু রেখা ডেসে উঠে ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায়। আবার যখন দিনের শেষ ভাগে পূর্ব দিগন্ত থেকে রাতের আধাৰ ওপরের দিকে উঠতে থাকে তখন ইফতারের সময় হয়। আজকাল লোকেরা সেহরী ও ইফতারে উভয় ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতার কারণে কিছু অথবা কড়াকড়ি শুরু করেছে। কিন্তু শরীরাত ঐ দু'টি সময়ের এমন কোন সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি যে তা থেকে কয়েক সেকেণ্ড বা কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে রোয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রভাত কালে রাত্রির কালো বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা ফুটে ওঠার মধ্যে যথেষ্ট সময়ের অবকাশ রয়েছে। ঠিক প্রভাতের উদয় মুহূর্তে যদি কোন ব্যক্তির ঘূম ভেঙে যায় তাহলে সংগতভাবেই সে তাড়াতাড়ি উঠে কিছু পানাহার করে নিতে পারে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলগ্রাহ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ সেহরী খাচ্ছে এমন সময় আয়ানের আওয়াজ কানে এসে গিয়ে থাকে তাহলে সংগেই সে যেন আহার ছেড়ে না দেয় বরং পেট ভরে পানাহার করে নেয়। অনুরূপভাবে ইফতারের সময়ও সূর্য অন্ত যাওয়ার পর অথবা দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। নবী সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম সূর্য ডোবার সাথে সাথেই বেলাল রাদিয়ান্নাহ আনহকে ডেকে বলতেন, আমার শরবত আনো। বেলাল রাদিয়ান্নাহ আনহ বলতেন, হে আন্নাহর রসূল! এখনো তো দিনের আলো ফুটে আছে। তিনি জবাব দিতেন, যখন রাতের আধাৰ পূর্বাকাশ থেকে উঠতে শুরু করে তখনই রোয়ার সময় শেষ হয়ে যায়।

১৯৫. ইতিকাফে বসার মানে হচ্ছে, রম্যানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করা এবং এই দিনগুলোকে আন্নাহর যিকিরের জন্য নির্দিষ্ট করা। এই ইতিকাফে থাকা অবস্থায় নিজের মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় কিন্তু যৌন স্বাদ আবাদন করা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা একান্ত অপরিহার্য।

১৯৬. এই সীমারেখাশুলো অতিক্রম করার কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, এশুলোর ধারে কাছেও যেয়ো না। এর অর্থ হচ্ছে, যেখান থেকে গোনাহের সীমানা শুরু হচ্ছে ঠিক সেই শেষ প্রান্তে সীমানা লাইন বরাবর ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক। সীমান্ত থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ সীমান্ত বরাবর ঘোরাফেরা করলে ভুলেও কখনো সীমান্তের ওপারে পা চলে যেতে পারে। তাই এ ব্যাপারে নবী সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম বলেছেন :

لَكُلْ مَلَكٌ حَمِيٌّ وَإِنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمٌ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى  
بُوْشَكُ أَنْ يَقْعُ فِيهِ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْبًا إِلَى  
الْحَكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না  
এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে  
ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ যাওয়ার সুযোগ পেয়ে  
যাও। ১৯৭

“প্রত্যেক বাদশাহের একটি ‘হিমা’ থাকে। আর আল্লাহর হিমা হচ্ছে তাঁর নির্ধারিত  
হারাম বিয়য়গুলো। কাজেই যে ব্যক্তি হিমার চারদিকে ঘূরে বেড়ায় তার হিমার মধ্যে  
পড়ে যাবার আশংকাও রয়েছে।”

আরবী ভাষায় ‘হিমা’ বলা হয় এমন একটি চারণফেত্রকে যাকে কোন নেতা বা  
বাদশাহ সাধারণ মানুষের মধ্যে নিযিন্দ্র করে দেন। এই উপমাটি ব্যবহার করে নবী  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, প্রত্যেক বাদশাহের একটি হিমা আছে আর  
আল্লাহর হিমা হচ্ছে তাঁর সেই সীমানাগুলো যার মাধ্যমে তিনি হালাল ও হারাম এবং  
আনুগত্য ও অবাধ্যতার পার্থক্য সূচিটি করেছেন। যে পশ্চি ‘হিমার’ (বেড়া) চারপাশে চরতে  
থাকে একদিন সে হয়তো হিমার মধ্যেও চুক্তি পড়তে পারে। দুঃখের বিয় শরীয়াতের  
মৌল প্রাণসন্তা সম্পর্কে অনবহিত লোকেরা সবসময় অনুমতির শেষ সীমায় চলে যাওয়ার  
জন্য পীড়াগীতি করে থাকে। আবার অনেক আলেম ও মাশায়েখ এই বিপজ্জনক সীমান্ত  
তাদের ঘোরাফেরা করতে দেয়ার উদ্দেশ্যে দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করে অনুমতির শেষ সীমা  
তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার কাজ করে যেতে থাকেন। অথচ অনুমতির এই শেষ সীমায়  
আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে মাত্র চুল পরিমাণ ব্যবধান থেকে যায়। এরই ফলে আজ  
অসংখ্য লোক গোনাই এবং তার থেকে অগ্রসর হয়ে গোমরাহীতে নিষ্ঠ হয়ে চলেছে।  
কারণ ঐ সমস্ত সূচিতাসূচি সীমান্ত রেখার মধ্যে পার্থক্য করা এবং তাদের কিনারে পৌছে  
নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ কথা নয়।

১৯৭. এই আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, শাসকদেরকে উৎকোচ দিয়ে অবৈধভাবে লাভবান  
হবার চেষ্টা করো না। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই যখন জানো এগুলো  
অন্যের সম্পদ তখন শুধুমাত্র তার কাছে তার সম্পদের মালিকানার কোন প্রমাণ না  
থাকার কারণে অথবা একটু এদিক সেদিক করে কোন প্রকারে পাঁচে ফেলে তার সম্পদ  
তোমরা ধাস করতে পারো বলে তার মামলা আদালতে নিয়ে যেয়ো না। মামলার ধারা  
বিবরণী শোনার পর হয়তো তারই ভিত্তিতে আদালত তোমাকে ঐ সম্পদ দান করতে  
পারে। কিন্তু বিচারকের এ ধরনের ফায়সালা হবে আসলে সাজানো মামলার নকল  
দলিলপত্র ‘ঢারা প্রতারিত হবার ফলশ্রুতি। তাই আদালত থেকে ঐ সম্পদ বা সম্পত্তির

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ ۝ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَرُ  
وَلَيْسَ الْبَرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبَيْوَاتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلِكَنَّ الْبَرَّ  
مِنِ الْقَىٰ ۝ وَأَتُوا الْبَيْوَاتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ۝

২৪ রুক্ত

লোকেরা তোমাকে চৌদ ছোট বড়ো হওয়ার ব্যাপারে জিজেস করছে। বলে দাও : এটা হচ্ছে লোকদের জন্য তারিখ নির্ণয় ও ইজ্জের আলামত। ১৯৮ তাদেরকে আরো বলে দাও : তোমাদের পেছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী নেই। আসলে নেকী রয়েছে আল্লাহর অস্ত্রুটি থেকে বীচার মধ্যেই, কাজেই তোমরা দরজা পথেই নিজেদের গৃহে প্রবেশ করো। তবে আল্লাহকে ডয় করতে থাকো, ইয়তো তোমরা সাফল্য লাভে সক্ষম হবে। ১৯৯

বৈধ মালিকানা অধিকার লাভ করার পরও প্রকৃতপক্ষে তুমি তার বৈধ মালিক হতে পারবে না। আল্লাহর কাছে তা তোমার জন্য হারামই থাকবে। হাদীসে বিবৃত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّمَا إِنْ شَرُّ وَإِنْتَ مُتَخَصِّصٌ إِلَىٰ وَلَعِلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ الْحَنْ  
بِحْجَتَهُ مِنْ بَعْضِ فَاقْضِي لَهُ عَلَىٰ نَحْنٍ مَا اسْمَعْ مِنْهُ - فَمَنْ  
قَضَيْتَ لَهُ بَشَّيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّمَا اقْضَيْتَ لَهُ قَطْعَةً مِنَ النَّارِ

“আমি তো একজন মানুষ। হতে পারে, তোমরা একটি মামলা আমার কাছে আনলে। এ ক্ষেত্রে দেখা গেলো তোমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের তুলনায় বেশী বাকপটু এবং তাদের যুক্তি-আলোচনা শুনে আমি তাদের পক্ষে রায় দিতে পারি। কিন্তু জেনে রাখো, তোমার ভাইয়ের অধিকারভূক্ত কোন জিনিস যদি তুমি এভাবে আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভ করো, তাহলে আসলে তুমি দোষ্যের একটি টুকরা লাভ করলে।”

১৯৮. চাঁদের হাস বৃদ্ধি হওয়ার দৃশ্যটি প্রতি যুগের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অতীতে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ সম্পর্কে নানা ধরনের রহস্যময়তা, কান্দনিকতা ও কুসংস্কারের প্রচলন ছিল এবং আজো রয়েছে। আরবের লোকদের মধ্যেও এ ধরনের কুসংস্কার ও অমূলক ধারণা-কল্পনার প্রচলন ছিল। চাঁদ থেকে ভালো মন্দ ‘লক্ষণ’ গ্রহণ করা হতো। কোন তারিখকে সৌভাগ্যের ও কোন তারিখকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক মনে করা

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَقْاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ⑤٥٠ وَاقْتُلُوهُمْ حِيثُ شِئْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ  
مِّنْ حِيتَّ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ  
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتْلُوكُمْ  
فَاقْتُلُوهُمْ كُلُّ لِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِينَ ⑤٥١ فَإِنْ أَنْتُمْ وَا فَإِنْ

اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤٥١

আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, ২০০ কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। ২০১ তাদের সাথে যেখানেই তোমাদের মোকাবিলা হয় তোমরা যুদ্ধ করো এবং তাদের উৎখাত করো সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে উৎখাত করেছে। কারণ হত্যা যদিও খারাপ, ফিতনা তার চেয়েও বেশী খারাপ। ২০২ আর মসজিদে হারামের কাছে যতশ্বন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তোমরাও যুদ্ধ করো না। কিন্তু যদি তারা সেখানে যুদ্ধ করতে সংকোচবোধ না করে, তাহলে তোমরাও নিসংকোচে তাদেরকে হত্যা করো। কারণ এটাই এই ধরনের কাফেরদের যোগ্য শাস্তি। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। ২০৩

হতো। কোন তারিখকে বিদেশ-বিভুইয়ে যাত্রার জন্য, কোন তারিখকে কাজ শুরু করার জন্য এবং কোন তারিখকে বিয়ে-সাদীর জন্য অপয়া বা অকল্যাণকর মনে করা হতো। আবার একথাও মনে করা হতো যে, ঢাঁদের উদয়াস্ত, হাস-বৃদ্ধি ও আবর্তন এবং চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব মানুষের ভাগ্যের ওপর পড়ে। দুনিয়ার অন্যান্য অস্ত্র ও মূর্খ জাতিদের মতো আরবদের মধ্যেও এ সমস্ত ধারণা-কম্পনার প্রচলন ছিল। এ সম্পর্কিত নানা ধরনের কুসংস্কার, স্নীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসব বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে মহান আল্লাহ বলেন, ঢাঁদের হাস-বৃদ্ধি হওয়ার ভাগ্যে এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এটা একটা প্রাকৃতিক ক্যালেঙ্গার, যা আকাশের গায়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতি দিন আকাশ কিনারে উকি দিয়ে এ ক্যালেঙ্গারটি একই সাথে সারা দুনিয়ার মানুষকে তারিখের হিসেব জানিয়ে দিতে থাকে। এখানে হঙ্গের উল্লেখ বিশেষ করে করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের ধর্মীয় তামাদুনিক ও অধিনৈতিক জীবনে এর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। বছরের

০"

"০

এক-তৃতীয়াংশ সময় অর্থাৎ চারটি মাসই ছিল ইজ্জ ও উমরাহর সাথে সম্পর্কিত। এ মাসগুলোয় যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকতো, পথঘাট সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকতো এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় থাকার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটতো।

১৯৯. আরবে যে সমস্ত কুসংস্কারমূলক প্রথার প্রচলন ছিল তার মধ্যে একটি ছিল হজ্জ সম্পর্কিত। কোন ব্যক্তি হজ্জের জন্য ইহরাম বৌধার পর নিজের গৃহের দরজা দিয়ে আর ভেতরে প্রবেশ করতো না। বরং গৃহে প্রবেশ করার জন্য পেছন থেকে দেয়াল টপকাতো বা দেয়াল কেটে জানালা বানিয়ে তার মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতো। তাহাড়া সফর থেকে ফিরে এসেও পেছন থেকে গৃহে প্রবেশ করতো। এই আয়াতে কেবলমাত্র এই প্রথাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদই জানানো হয়নি বরং এই বলে সকল প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রাথর মূলে আঘাত হানা হয়েছে যে, নেকী ও সৎকর্মশীলতা হচ্ছে আসলে আল্লাহকে তয় করা এবং তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকার নাম। নিছক বাপ-দাদার অঙ্ক অনুসরণের বশবর্তী হয়ে যেসব অধৈরীন নিয়ম প্রথা পালন করা হচ্ছে এবং যেগুলোর সাথে মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কোন সম্পর্কই নেই, সেগুলো আসলে নেকী ও সৎকর্ম নয়।

২০০. আল্লাহর কাজে যারা তোমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী তোমরা জীবন ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করতে চাও বলে যারা তোমাদের শক্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তোমাদের সংশোধন ও সংস্কার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য জুনুম-অত্যাচার চালাচ্ছে ও শক্তি প্রয়োগ করছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। এর আগে মুসলমানরা যতদিন দুর্বল ও বিছির বিস্তি ছিল, তাদেরকে কেবলমাত্র ইসলাম প্রচারের হকুম দেয়া হয়েছিল এবং বিপক্ষের জুনুম-নির্যাতনে সবর করার তাকীদ করা হচ্ছিল। এখন মদ্দীনায় তাদের একটি ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথমবার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যারাই এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ। তারপর একের পর এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতেই থাকে।

২০১. অর্থাৎ বন্তুগত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধ করবে না। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না তাদের ওপর তোমরা হস্তক্ষেপ করবে না। যুদ্ধের ব্যাপারে জাহেলী যুগের পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহতদের গায়ে হাত ওঠানো, শক্র পক্ষের নিহতদের লাশের চেহারা বিকৃত করা, শস্যক্ষেত্রে ও গবাদি পশু অযথা ধ্রংস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় জুনুম ও বর্বরতামূলক কর্মকাণ্ড “বাড়াবাড়ি”-এর অন্তরভুক্ত। হাদীসে এসবগুলোর ওপর নিয়েধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, একমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রেই শক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং ঠিক ততটুকু পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে যতটুকু সেখানে প্রয়োজন।

২০২. এখানে ফিতনা শব্দটি ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যে অর্থে ইংরেজীতে Persecution শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা দল প্রচলিত চিন্তাধারা ও মতবাদের পরিবর্তে অন্য কোন চিন্তা ও মতবাদকে সত্য হিসেবে জানার কারণে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সমালোচনা ও প্রচারের মাধ্যমে সমাজে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার

وَقُتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ  
أَنْتُمْ فَلَا عَلَوْا إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾ أَلَّا هَذَا الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ  
الْحَرَامِ وَالْحِرْمَةُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَ لِعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ وَأَعْلَمُ  
بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَ لِعَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٦﴾ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقَوْا بِآيَدِيهِ  
إِلَّا التَّهْلِكَةُ هُنَّ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾

তোমরা তাদের সাথে যুক্ত করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।<sup>২০৪</sup> তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো যানেমদের ছাড়া আর কারোর ওপর ইতক্ষেপ করা বৈধ নয়।<sup>২০৫</sup>

হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত মর্যাদা সম্পর্কায়ের বিনিময়ের অধিকারী হবে।<sup>২০৬</sup> কাজেই যে ব্যক্তি তোমার ওপর ইতক্ষেপ করবে তুমিও তার ওপর ঠিক তেমনিভাবে ইতক্ষেপ করো। তবে আল্লাহকে তয় করতে থাকো এবং একথা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাঁর নির্ধারিত সীমান্তগুলি করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর পথে যায় করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধৰ্মসের মুখে নিক্ষেপ করো না।<sup>২০৭</sup> অনুগ্রহ প্রদর্শনের পথে অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদেরকে ভালোবাসেন।<sup>২০৮</sup>

সংশোধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, নিছক এ জন্য তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানো। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে : নরহত্যা নিসদেহে একটি জঘণ্য কাজ কিন্তু কোন মানবিক গোষ্ঠী বা দল যখন জোরপূর্বক নিজের বৈরতান্ত্রিক ও জুলুমতান্ত্রিক চিকিৎসারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়, সত্য গ্রহণ থেকে লোকদেরকে জোরপূর্বক বিরত রাখে এবং যুক্তির পরিবর্তে পাশবিক শক্তি প্রয়োগে জীবন গঠন ও সংশোধনের বৈধ ও ন্যায়সংগত প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে শুরু করে তখন সে নরহত্যার চাইতেও জঘণ্যতম অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। এই ধরনের গোষ্ঠী বা দলকে অন্তরে সাহায্যে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া যে সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সংগত তাতে সন্দেহ নেই।

২০৩. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো তিনি নিকৃষ্টম অপরাধী ও পাপীকেও মাফ করে দেন, যদি সে তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ পরিহার করে, এটিই তাঁর

গুণ-বৈশিষ্ট। এই গুণ-বৈশিষ্ট তোমরা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করো। تَخْلِقُوا بِالْخَلْقِ اللَّهُ  
আল্লাহর চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট নিজেদেরকে সংজ্ঞিত করো, রসূলের এ বাণীর তাৎপর্যও  
এটিই। প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তোমরা যুদ্ধ করবে না। তোমরা যুদ্ধ করবে  
আল্লাহর দীনের পথ পরিষ্কার ও সুগম করার জন্য। কোন দল যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পথে  
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ততক্ষণ তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিন্তু যখনই সে নিজের  
প্রতিবন্ধকতার নীতি পরিহার করবে তখনই তোমরা তার উপর থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।

২০৪. ইতিপূর্বে ‘ফিতনা’ শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে তার থেকে একটু  
স্বত্ত্ব অর্থে তার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পূর্বাপর আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে  
যে, এখনে ‘ফিতনা’ বলতে এমন অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যখন ‘দীন’ আল্লাহ ছাড়া অন্য  
কোন সন্তান জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্যই হয়  
ফিতনাকে নির্মূল করে দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। আবার ‘দীন’  
শব্দটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, আরবী ভাষায় দীন অর্থ হচ্ছে “আনুগত্য”  
এবং এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে জীবন ব্যবস্থা যেখানে কোন  
সন্তানকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মেনে নিয়ে তার প্রদত্ত বিধান ও আইনের  
আনুগত্য করা হয়। দীনের এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথা সুন্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমাজে যখন  
মানুষের উপর মানুষের প্রভূত ও সার্বভৌম কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর বিধান  
অন্যায়ী জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সমাজের এই অবস্থাকে ফিতনা বলা হয়।  
এই ফিতনার জায়গায় এমন একটি ব্যবস্থার সৃষ্টি করা ইসলামী জিহাদের লক্ষ যেখানে  
মানুষ একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুগত থাকবে।

২০৫. বিরত হওয়ার অর্থ কাফেরদের নিজেদের কুফরী ও শিরুক থেকে বিরত হওয়া  
নয়। বরং ফিতনা সৃষ্টি করা থেকে বিরত হওয়া। কাফের, মুশরিক, নাতিক প্রত্যেকের  
নিজের ইচ্ছামতো আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করার অধিকার আছে। তারা যার ইচ্ছে তার  
ইবাদাত-উপাসনা করতে পারে। অথবা চাইলে কারোরও ইবাদাত নাও করতে পারে।  
তাদেরকে এই গোমরাহী ও ভৃষ্টা থেকে বের করে আনার জন্য উপদেশ দিতে হবে,  
অনুরোধ করতে হবে। কিন্তু এ জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। তবে আল্লাহর যমীনে  
আল্লাহর আইন ছাড়া তাদের বাতিল আইন কানুন জারী করার এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে  
আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বান্দায় পরিণত করার অধিকার তাদের নেই। এই ফিতনা  
নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন ও সুযোগ মতো মৌখিক প্রচারণা ও অস্ত্র উভয়টিই ব্যবহার  
করা হবে। আর কাফের ও মুশরিকরা এই ফিতনা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত মু’মিন  
তার সংশ্লাপ থেকে নিষ্ঠেষ্ট ও নিবৃত্ত হবে না।

আর “যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো জালেমদের ছাড়। আর কারোর উপর  
হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না”—একথা থেকে এই ইঁধিগত পাওয়া যায় যে, বাতিল জীবন  
ব্যবস্থার পরিবর্তে সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর সাধারণ লোকদের মাফ  
করে দেয়া হবে। কিন্তু নিজেদের শাসনামলে যারা সত্যের পথ রোধ করার জন্য ছড়ান্ত  
পর্যায়ে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিল সত্যপর্হীরা তাদেরকে অবশ্য শাস্তিদান করতে পারবে।  
যদিও এ ব্যাপারে ক্ষমা করে দেয়া এবং বিজয় লাভ করার পর জালেমদের থেকে  
প্রতিশোধ না নেয়াই সৎকর্মশীল মু’মিনদের জন্য শোভনীয় তবুও যাদের অপরাধের

তালিকা অনেক বেশী কালিমানিষ্ঠ তাদেরকে শাস্তি দান করা একান্তই বৈধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অথচ তাঁর চেয়ে বেশী ক্ষমা ও উদারতা আর কে প্রদর্শন করতে পারে? তাই দেখা যায়, বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য থেকে উকবাহ ইবনে আবী মুস্তফ ও নবর ইবনে হারিসকে তিনি হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর সতের জন লোককে সাধারণ ক্ষমার বাইরে রেখেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। উপরোক্তভিত্তি অনুমতির ভিত্তিতে তিনি এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন।

২০৬. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে আরবদের মধ্যে যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম এই তিনটি মাস হজ্জের জন্য নির্ধারিত থাকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। আর রজব মাসকে উমরাহর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল। এই চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা, লুঠন ও রাহাজানি নিষিদ্ধ ছিল। কা'বা যিয়ারতকারীদেরকে নিশ্চিন্তভাবে ও নিরাপদে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার এবং স্থান থেকে আবার নিজেদের গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ জন্য এ মাসগুলোকে হারাম মাস বলা হতো। অর্থাৎ এ মাসগুলো হলো সম্মানিত। এখানে উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, হারাম মাসগুলোর মর্যাদা রক্ষায় যদি কাফেররা তৎপর হয় তাহলে মুসলমানদেরও তৎপর হতে হবে। আর যদি কাফেররা এই মাসগুলোর মর্যাদা পরোয়া না করে কোন হারাম মাসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে মুসলমানরাও হারাম মাসে ন্যায়-সংগতভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে।

আরবদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লুটরাজের ক্ষেত্রে 'নাসী' প্রথা প্রচলিত থাকার কারণে এই অনুমতির প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। এই প্রথা অনুযায়ী তারা কারোর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অথবা লুটরাজ করার জন্য কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে কোন একটি হারাম মাসে তার ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালাতো তারপর অন্য একটি হালাল মাসকে তার জায়গায় হারাম গণ্য করে পূর্বের হারাম মাসের মর্যাদাহান্তির বদলা দিতো। তাই মুসলমানদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দিল যে, কাফেররা যদি 'নাসী'র বাহালা বানিয়ে কোন হারাম মাসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে তখন তারা কি করবে? এই প্রশ্নের জবাব এই আয়াতে দেয়া হয়েছে।

২০৭. আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো হয় তাতে অর্থ ব্যয় করা। এখানে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহর দীনের শির উচ্চ রাখার এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের অর্থ সম্পদ ব্যয় না করো এবং তার মোকাবিলায় নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সবসময় প্রিয় বলে মনে করতে থাকো তাহলে এটা তোমাদের জন্য দুনিয়ায় ধৰ্মসের কারণ হবে এবং আখেরাতেও। দুনিয়ায় তোমরা কাফেরদের হাতে পরাজিত ও পর্যন্ত এবং আখেরাতে আল্লাহর সামনে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

২০৮. এখানে মূলে 'ইহসান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইহসান' শব্দটি এসেছে 'হসন' থেকে। এর মানে হচ্ছে, কাজ ভালোভাবে ও সূচারূপে সম্পন্ন করা। কাজ করার বিভিন্ন ধরন আছে। তার একটা ধরন হচ্ছে, যে কাজটা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সেটি কেবল নিয়ম-মাফিক সম্পন্ন করা। দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে, তাকে সূচারূপে সম্পন্ন

وَأَتِمُوا الْحِجْرَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فِيَنْ أَحْصِرْتُرْ فِيَنْ أَسْتِيَسِرْ مِنَ الْمَدِيَ  
وَلَا تَحْلِقُوا رَءُو سَكْرَ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَدِي مَحْلَهُ فِيَنْ كَانَ  
مِنْكُمْ مِرِيضاً أَوْ بَهْ أَذْيَ مِنْ رَأْسِهِ فَقِلْيَهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَلَقَةٍ  
أَوْ نُسْكٍ فَإِذَا أَمْنِتَرْتُهُ فِيَنْ تَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحِجْرِ فِيَنْ أَسْتِيَسِرْ  
مِنَ الْمَدِي فِيَنْ لَمْ يَجِدْ فِصِيَامٌ ثَلَثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحِجْرِ وَسَبْعَةٍ إِذَا  
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةَ كَامِلَةَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهَ حَاضِرِي  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

## الْعِقَابِ

আল্লাহর সত্ত্বে অর্জনের জন্য যখন ইজ্জ ও উমরাহ করার নিয়ত করো তখন তা পূর্ণ করো। আর যদি কোথাও আটকা পড়ো তাহলে যে কুরবানী তোমাদের আয়তাধীন হয় তাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করো। ২০৯ আর কুরবানী তার নিজের জ্ঞানগায় পৌছে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মাথা মুওন করো না। ২১০ তবে যে ব্যক্তি বোগগ্রস্ত হয় অথবা যার মাথায় কোন কষ্ট থাকে এবং সেজন্য মাথা মুওন করে তাহলে তার ‘ফিদিয়া’ হিসেবে রোয়া রাখা বা সাদকা দেয়া অথবা কুরবানী করা উচিত। ২১১ তারপর যদি তোমাদের নিরাপত্তা অর্জিত হয়ে ১২ (এবং তোমরা ইজ্জের আগে মকায় পৌছে যাও) তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ইজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরাহর সুযোগ লাভ করে সে যেন সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী করে। আর যদি কুরবানীর যোগাড় না হয়, তাহলে ইজ্জের যামানায় তিনটি রোয়া এবং সাতটি রোয়া ঘরে ফিরে গিয়ে, এভাবে পুরো দশটি রোয়া যেন রাখে। এই সুবিধে তাদের জন্য যাদের বাড়ী-ঘর মসজিদে হারামের কাছাকাছি নয়। ২১৩ আল্লাহর এ সমস্ত বিধানের বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো এবং ভালোভাবে জেনে নাও আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।

করা এবং নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও উপায় উপকরণ তার পেছনে নিয়োজিত করে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সুসম্পর্ন করার চেষ্টা করা। প্রথম ধরনটি নিছক আনুগত্যের

১০ "পর্যায়ভূক্ত। এ জন্য তাকওয়া ও ভীতি যথেষ্ট। আর দিতীয় ধরনটি হচ্ছে ইহসান। এ জন্য ভালোবাসা, প্রেম ও গভীর মনোসংযোগ প্রয়োজন হয়।

২০৯. অর্থাৎ পথে যদি এমন কোন কারণ দেখা দেয় যার ফলে সামনে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে পথেই থেমে যেতে হয় তাহলে উট, গরু, ছাগলের মধ্য থেকে যে পশুটি পাওয়া সম্ভব হয় সেটি আল্লাহর জন্য কুরবানী করো।

২১০. কুরবানী তার নিজের জায়গায় পৌছে যাওয়ার অর্থ কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। হানাফী ফকীহদের মতে এর অর্থ হচ্ছে হারাম শরীফ। অর্থাৎ হজ্জযাত্রী যদি পথে থেমে যেতে বাধ্য হয় তাহলে নিজের কুরবানীর পশু বা তার মৃত্যু পাঠিয়ে দেবে এবং তার পক্ষ থেকে হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে কুরবানী করতে হবে। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফেটের (র) মতে হজ্জযাত্রী যেখানে আটক হয়ে যায় সেখানে কুরবানী করে দেয়াই হচ্ছে এর অর্থ। মাথা মুণ্ড করার অর্থ হচ্ছে, মাথার চুল চোঁচে ফেলা। অর্থাৎ কুরবানী না হওয়া পর্যন্ত মাথার চুল চোঁচে ফেলতে পারবে না।

২১১. হাদীস থেকে জানা যায়, এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন রোয়া রাখা বা ছয়জন মিসকিনকে আহার করানো অথবা কমপক্ষে একটি ছাগল খবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২১২. অর্থাৎ যে কারণে পথে তোমাদের বাধ্য হয়ে থেমে যেতে হয়েছিল সে কারণ যদি দূর হয়ে যায়। যেহেতু সে যুগে ইসলাম বৈরী গোত্রদের বাধা দেয়ার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হজ্জের পথ বন্ধ হয়ে যেতো এবং হাজীদের পথে থেমে যেতে হতো, তাই আল্লাহ ওপরের আয়াতে “আটকা পড়ো” এবং তার মোকাবিলায় “নিরাপত্তা অর্জিত হয়” শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু “আটকা পড়া”র মধ্যে যেমন শক্তির বাধা দেয়া ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সাথে সাথে অন্যান্য যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অর্থও অন্তরভূত হয় তেমনি “নিরাপত্তা অর্জিত হয়” শব্দের মধ্যেও যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাবার অর্থ অন্তরভূত হয়।

২১৩. জাহেলী যুক্তে আরবের লোকেরা ধারণা করতো, একই সফরে হজ্জ ও উমরাহ দু'টো সম্পর্ক করা মহাপাপ। তাদের মনগড়া শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী হজ্জের জন্য একটি সফর এবং উমরাহের জন্য আর একটি সফর করা অপরিহার্য ছিল। মহান আল্লাহ তাদের আরোপিত এই বাধ্য-বাধকতা খতম করে দেন এবং বাইর থেকে আগমনকারীদেরকে একই সফরে হজ্জ ও উমরাহ করার সুবিধে দান করেন। তবে যারা মক্কার আশেপাশের মীকাতের (যে স্থান থেকে হজ্জযাত্রীকে ইহরাম বাঁধতে হয়) সীমার মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে এই সুযোগ দেয়া হয়নি। কারণ তাদের পক্ষে হজ্জ ও উমরাহের জন্য পৃথক সফর করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরাহের সুযোগ লাভ করার অর্থ হচ্ছে, উমরাহ সম্পর্ক করে ইহরাম খুলে ফেলতে হবে এবং ইহরাম থাকা অবস্থায় যেসব বিধিনিয়েধ মেনে চলতে হচ্ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর হজ্জের সময় এলে আবার নতুন করে ইহরাম বেঁধে নেবে।

أَكْبَرُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَرَ فَلَأَرْفَثَ  
وَلَا فُسْقَ وَلَا جَلَالَ فِي الْحَجَرِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يُعْلَمُهُ  
اللَّهُ وَتَرَوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزَادِ التَّقْوَىٰ وَأَتَقُونَ يَأْوِلِ

### الْأَلْبَابُ ⑤

২৫ রুক্ত

হজ্জের মাসগুলো সবার জানা। যে ব্যক্তি এই নিদিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জ করার নিয়ত করে, তার জেনে রাখা উচিত, হজ্জের সময়ে সে যেন যৌন সংজ্ঞাগ, ২১৪ দুষ্কর্ম<sup>১৫</sup> ও ঝগড়া-বিবাদে<sup>১৬</sup> লিঙ্গ না হয়। আর যা কিছু সৎকাজ তোমরা করবে আল্লাহর তা জানেন। হজ্জ সফরের জন্য পাথেয় সংগে নিয়ে যাও আর সবচেয়ে ভালো পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা! আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো।<sup>১৭</sup>

২১৪. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবলমাত্র যৌন সম্পর্কই নিয়ন্ত্রণ নয় বরং যৌন সংজ্ঞাগের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে এমন কোন কথাবার্তাও তাদের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

২১৫. যদিও সাধারণ অবস্থায়ই যে কোন গোনাহের কাজ করা অবৈধ কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এ কাজগুলো সংঘটিত হলে তার গোনাহের মাত্রা অনেক বেশী কঠিন হয়ে পড়ে।

২১৬. এমনকি চাকরাকে ধর্মক দেয়াও জায়েয় নয়।

২১৭. জাহেলী যুগে হজ্জের জন্য পাথেয় সংগে করে নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়াকে দুনিয়াদারীর কাজ মনে করা হতো। একজন ধর্মীয় ব্যক্তি সম্পর্কে আশা করা হতো সে দুনিয়ার কোন সহল না নিয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে রওয়ানা হবে। এ আয়তে তাদের এ ভুল চিত্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, পাথেয় না নিয়ে সফর করার মধ্যে মাহাত্ম্য নেই। আসল মাহাত্ম্য হচ্ছে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়া, তাঁর বিধি-নিয়েদের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকা এবং জীবনকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কল্যাণ মুক্ত করা। যে ব্যক্তি সংস্কারিত্বিক শুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে সে অনুযায়ী নিজের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেনি এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত না হয়ে অসৎকাজ করতে থাকে, সে যদি পাথেয় সংগে না নিয়ে নিছক বাহ্যিক ফকীরী ও দরবেশী প্রদর্শনী করে বেড়ায়, তাহলে তাতে তার কোন লাভ নেই। আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের দৃষ্টিতে সে লাঞ্ছিত হবে। যে ধর্মীয় কাজটি সম্পর্ক করার জন্য সে সফর করছে তাকেও লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جِنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ  
 مِنْ عِرَفِي فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعُرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ  
 كَمَا هُلْكَمْ وَإِنْ كَتَمْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْفَالِيْنَ ۝  
 أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
 ۝

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

আর ইজের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহের স্বাক্ষর করতে থাকো তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। ২১৮ তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে 'মাশআরুল হারাম' (মুয়দালিফা) এর কাছে থেমে আল্লাহকে শ্রণ করো এবং এমনভাবে শ্রণ করো যেতাবে শ্রণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নয়তো ইতিপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথের উপর অস্তরতুক। ২১৯ তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে শুমা চাও। ২২০ নিসন্দেহে তিনি শুমাশীল ও করুণাময়।

তার মনে যদি আল্লাহর প্রতি ভয় জাগরুক থাকে এবং তার চিরিত্র নিষ্কল্প হয় তাহলে আল্লাহর ওখানে সে মর্যাদার অধিকারী হবে এবং মানুষও তাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে। তার খাবারের থলিতে খাবার ভরা থাকলেও তার এ মর্যাদার কোন কম-বেশী হবে না।

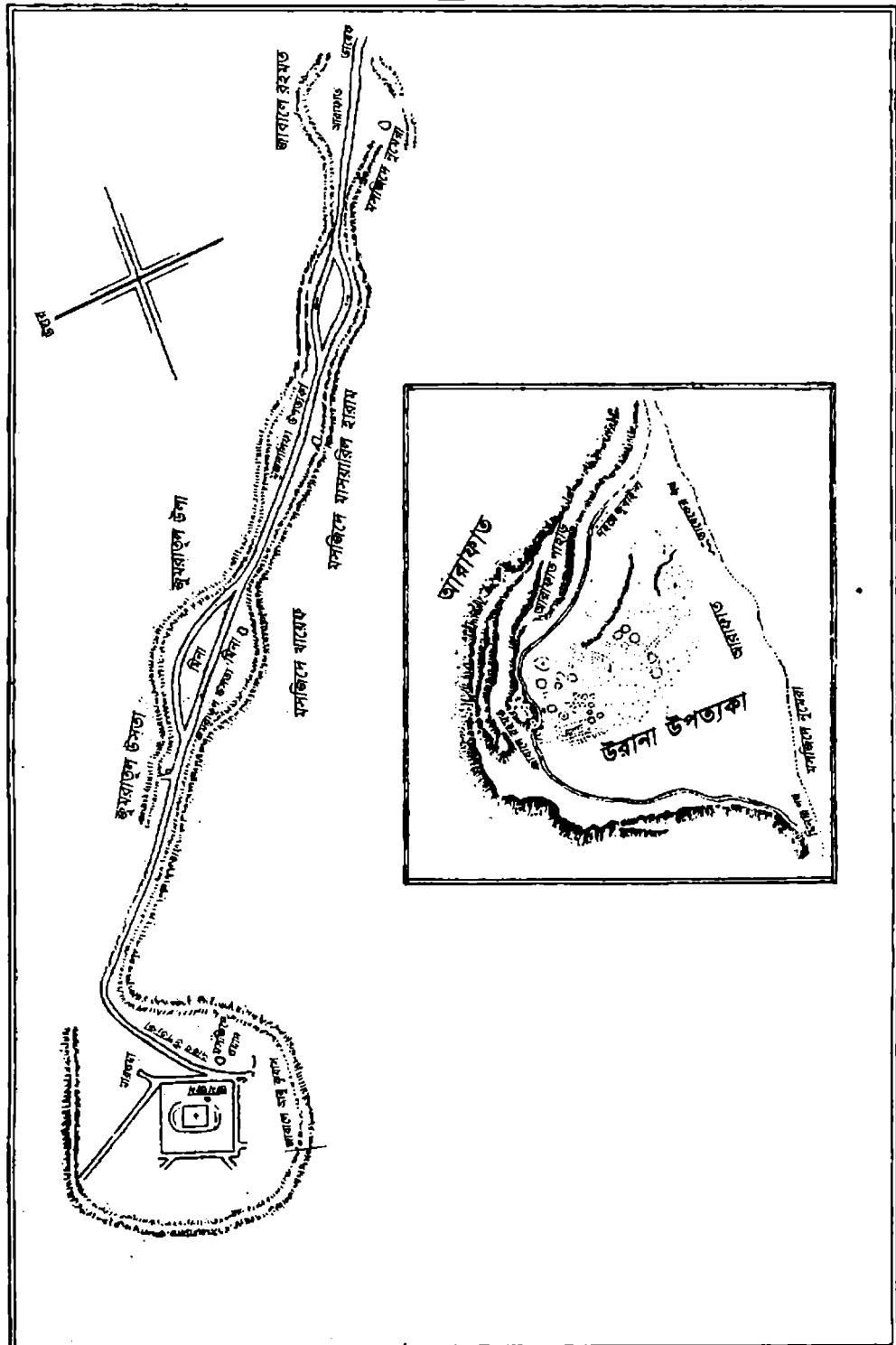
২১৮. এটিও প্রাচীন আরবের একটি জাহেলী ধারণা ছিল। ইজ্জ সফর কালে অর্থ উপার্জনের জন্য কোন কাজ করা তারা খারাপ মনে করতো। কারণ তাদের মতে, অর্থ উপার্জন করা একটি দুনিয়াদারীর কাজ। কাজেই ইজের মতো একটি ধর্মীয় কাজের মধ্যে এ দুনিয়াদারীর কাজটি করা তাদের চোখে নিন্দনীয়ই ছিল। কুরআন এ ধারণার প্রতিবাদ করছে এবং তাদের জানিয়ে দিচ্ছে, একজন আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন আল্লাহর আইনের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে নিজের অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায় তখন আসলে সে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বাক্ষর করে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সে যদি আল্লাহর সন্মুক্তি অর্জনের জন্য সফর করতে গিয়ে তার মাঝখানে তাঁর অনুগ্রহের স্বাক্ষরও করে ফেরে, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না।

২১৯. অর্থাৎ জাহেলী যুগে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে অন্য যে সমস্ত মুশরিকী ও জাহেলী ক্রিয়া কর্মের মিশ্রণ ঘটেছিল সেগুলো পরিহার করো এবং এখন আল্লাহ যে সমস্ত হিদায়াত তোমাদের দান করেছেন সে অনুযায়ী নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাতের পথ অবলম্বন করো।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَلِّ كُرْكُمْ  
 أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدِرْكُرْكُمْ فِيمَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا  
 فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ⑩ وَمِنْهُمْ مَنْ  
 يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
 عَلَابَ النَّارِ ⑪ أَوْ لِئَكَ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ  
 الحِسَابِ ⑫

অতপর যখন তোমরা নিজেদের ইজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পর্ক করবে তখন আগ্নাহকে এমনভাবে শ্রবণ করবে যেমন ইতিপূর্বে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে শ্রবণ করতে ২২১ বরং তার চেয়ে অনেক বেশী করে শ্রবণ করবে। (তবে আগ্নাহকে শ্রবণকারী লোকদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে) তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় সবকিছু দিয়ে দাও। এই ধরনের লোকের জন্য আবেরাতে কোন অংশ নেই। আবার কেউ বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আবেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আগুনের আঘাব থেকে আমাদের বঁচাও। এই ধরনের লোকেরা নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী (উভয় স্থানে) অংশ পাবে। মূলত হিসেব সম্পর্ক করতে আগ্নাহর একটুও বিলম্ব হয় না।

২২০. হ্যরত ইবরাহীম (আ) ও হ্যরত ইসমাইল (আ)-এর সময় আরবে ইজ্জের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি ছিল এই যে, ৯ই যিলহজ্জ তারা মিনা থেকে আরাফাত যেতো এবং ১০ তারিখের সকালে সেখান থেকে ফিরে এসে মুয়দালিফায় অবস্থান করতো। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ধীরে ধীরে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের ন্যায় আরবে কুরাইশদের ধর্মীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন তারা বললো, আমরা হারাম শরীফের অধিবাসী, সাধারণ আরবদের সাথে আমরা আরাফাত পর্যন্ত যাবো, এটা আমাদের জন্য মর্যাদাহানিকর। কাজেই তারা নিজেদের জন্য পৃথক মর্যাদাজনক ব্যবস্থা প্রচলন করলো। তারা মুয়দালিফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতো এবং সাধারণ লোকদের আরাফাত পর্যন্ত যাবার জন্য ছেড়ে দিতো। পরে বনী খুয়াআ ও বনী কিনানা গোত্রদ্বয় এবং কুরাইশদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য গোত্রও এই পৃথক অভিজ্ঞাতযুক্ত ব্যবস্থার অধিকারী হলো। অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছলো যে, কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর মর্যাদাও সাধারণ আরবদের তুলনায় অনেক উচু হয়ে গেলো। তারাও আরাফাতে যাওয়া বন্ধ করে



وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مُعْلَوْدَتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ  
 فَلَا إِثْمَرَ عَلَيْهِ ۖ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَرَ عَلَيْهِ ۖ لِمَنِ اتَّقَى ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشِرونَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ  
 يُعِجِّبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۗ  
 وَهُوَ أَلَّا يُحْصَأٌ ۝ وَإِذَا تَوَلَّ سَعْيَ فِي الْأَرْضِ لِيُفِسَدَ فِيهَا  
 وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝ وَإِذَا قِيلَ  
 لَهُ أَتَقِ اللهُ أَخْلَقَهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَخَسِبَهُ جَهَنَّمُ ۖ وَلَبِئْسَ  
 الْمِهَادُ ۝

এই হাতেগোণা কয়েকটি দিন, এ দিন ক'টি তোমাদের আল্লাহর শরণে অতিবাহিত করতে হবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে ফিরে আসে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি কেউ একটু বেশীক্ষণ অবস্থান করে ফিরে আসে তবে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। ২২২ তবে শর্ত হচ্ছে, এই দিনগুলো তাকে তাকওয়ার সাথে অতিবাহিত করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো এবং শুধু তালোভাবে জেনে রাখো, একদিন তাঁর দরবারে তোমাদের হাথির হতে হবে।

মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে পাথির জীবনে যার কথা তোমার কাছে বড়ই চমৎকার মনে হয় এবং নিজের সদিচ্ছার ব্যাপারে সে বারবার আল্লাহকে সাক্ষী মানে। ২২৩ কিন্তু আসলে সে সত্ত্বের নিকৃষ্টতম শক্তি। ২২৪ যখন সে কর্তৃত লাভ করে, ২২৫ পৃথিবীতে তার সমস্ত প্রচেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করার কাজে। অথচ আল্লাহ (যাকে সে সাক্ষী মেনেছিল) বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, এই ধরনের লোকের জন্য জাহানামই যথেষ্ট এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।

দিল। এ গব ও অহংকারের পুতুলিটিকে এ আয়াতে ভেঙে ছূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে বিশ্বেভাবে সমোধন করা হয়েছে কুরাইশ, তাদের আত্মীয় ও চূড়ি বন্ধ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِكُ نَفْسَهُ بِتِغَاءٍ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَالله  
رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ<sup>১০১</sup> يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلِيمَ كَافَةً<sup>১০২</sup>  
وَلَا تَبِعُوا أَخْطُوْتُ الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكَمْ عَلِّيٌّ وَمَبِينٌ<sup>১০৩</sup> فَإِنْ زَلَّ لَتَسْرِ  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَكْرِيرَ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>১০৪</sup>  
هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِنَ الْغَمَاءِ<sup>১০৫</sup>  
وَالْمَلِئَةُ وَقِصَى الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ<sup>১০৬</sup>

অন্যদিকে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের অভিযানে যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে। এই ধরনের বাদার ওপর আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান। হে দ্বিমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো<sup>২২৬</sup> এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশ্মন। তোমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট ও ঘৰ্থহীন হিদায়াত এসে গেছে তা লাভ করার পরও যদি তোমাদের পদস্থলন ঘটে তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞায়য়<sup>২২৭</sup> (এই সমস্ত উপদেশ ও হিদায়াতের পরও যদি লোকেরা সোজা পথে না চলে, তাহলে) তারা কি এখন এই অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছায়া দিয়ে ফেরেশতাদের বিপুল জয়ায়েত সংগে নিয়ে নিজেই সামনে এসে যাবেন এবং তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে?<sup>২২৮</sup> সমস্ত ব্যাপার তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই সামনে উপস্থাপিত হবে।

গোত্রগুলোকে এবং সাধারণতাবে সংৰোধন করা হয়েছে এমন সব লোকদেরকে যারা আগামীতে কখনো নিজেদের জন্য এ ধরনের পৃথক ব্যবস্থা প্রচলনের আকাংখা মনে মনে পোষণ করে। তাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, সবাই যতদূর পর্যন্ত যায় তোমরাও তাদের সাথে ততদূর যাও, তাদের সাথে অবস্থান করো, তাদের সাথে ফিরে এসো এবং এ পর্যন্ত জাহেলী অহংকার ও আন্তর্ভুরিতার কারণে, তোমরা সুন্নাতে ইবরাহিমীর যে বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছো সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

২২১. ইতিপূর্বে আরবের লোকেরা হঙ্গ শেষ করার পর পরই মিনায় সভা করতো। সেখানে প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা তাদের বাপ-দাদাদের কৃতিত্ব আলোচনা করতো। গব্ব ও অহংকারের সাথে এবং এতাবে নিজেদের শেষ্ঠত্বের বড়াই করতো। তাদের এ কার্যকলাপের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, এসব জাহেলী কথাবার্তা বন্ধ করো, ইতিপূর্বে

আজেবাজে কথা বলে যে সময় নষ্ট করতে এখন আল্লাহর অরণে ও তাঁর যিকিরে তা অতিবাহিত করো। এখানে যিকির বলতে মিনায় অবস্থানরত সময়ে যিকিরের কথা বলা হয়েছে।

২২২. অর্থাৎ 'আইয়ামে তাশৰীকে' মিনা থেকে মক্কার দিকে ১২ই বা ১৩ই যিলহজ্জ যেদিনেই ফিরে আসা হোক না কেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। কতদিন অবস্থান করা হয়েছিল, এটা কোন মৌলিক গুরুত্বের বিষয় নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, যতদিন অবস্থান করা হয়েছিল, সেই দিনগুলোয় আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? সেই দিনগুলোয় তোমরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলে, না মেলা দেখে আর উৎসব অনুষ্ঠানে ফুর্তি করে দিন কাটিয়ে দিয়েছো?

২২৩. অর্থাৎ সে বলে, আল্লাহ সাক্ষী, আমি কেবলমাত্র শুভ কামনা করি। আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই। শুধুমাত্র সত্য ও ন্যায়ের জন্য এবং মানুষের ভালো ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আমি কাজ করে যাচ্ছি।

২২৪. এখানে কুরআনে 'আলাদুল খিসাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এমন শক্ত যে সকল শক্তির বড়ো। অর্থাৎ সত্যের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সে সম্ভাব্য সব রকমের অন্ত ব্যবহার করে। মিথ্যা, জালিয়াতি, বেইমানি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং যে কোন ধরনের কপটতার অন্ত ব্যবহার করতে সে একটুও ইতস্তত করে না।

২২৫. 'ইয়া তাওয়াল্লা' শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এখানে আয়াতের অনুবাদে অবলম্বন করা হয়েছে। এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, মজার মজার হৃদয় প্রলুক্ককারী কথা বলে 'যখন সে ফিরে আসে' তখন এসব অপকর্ম করে।

২২৬. অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যক্তিক্রম ও সংরক্ষণ ছাড়াই, কিছু অংশকে বাদ না দিয়ে এবং কিছু অংশকে সংরক্ষিত না রেখে জীবনের সমগ্র পরিসরটাই ইসলামের আওতাধীন করো। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, আচরণ, ব্যবহারিক জীবন, লেনদেন এবং তোমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পূরোপুরি ইসলামের কর্তৃতাধীনে আনো। তোমাদের জীবনের কিছু অংশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবে আর কিছু অংশকে ইসলামী অনুশাসনের বাইরে রাখবে, এমনটি যেন না হয়।

২২৭. অর্থাৎ তিনি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এবং তিনি জানেন কিভাবে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হয়।

২২৮. এখানে উল্লেখিত শব্দগুলো যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগায়। এর ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা কেবলমাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে। সত্যকে না দেখে সে তাকে মানতে প্রতৃত কি না? আর মেনে নেয়ার পরও তার মধ্যে সত্যকে অমান্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য করার মতো নৈতিক শক্তি তার আছে কি না? কাজেই মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ, আসমানী কিতাব অবতরণ এমন কি মুজিয়াসমূহের ক্ষেত্রেও বৃক্ষি-বিবেকের পরীক্ষা ও নৈতিক শক্তি যাচাই করার ব্যবস্থা রেখেছেন। কখনো তিনি সত্যকে এমনভাবে আবরণমূক করে দেননি যার ফলে মানুষের পক্ষে তাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকেনি। কেননা এরপর তো আর পরীক্ষার কোন অর্থই থাকে না এবং পরীক্ষায়

سَلَّ بْنِ إِسْرَأِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ أَيَّةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يَبْدِلُ  
نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْلِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑤  
لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيُسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَالَّذِينَ اتَّقَوْفَقْهُمْ يَوْمُ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ  
بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑥

২৬ রূক্ষ

বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করো, কেমন সুস্পষ্ট নির্দশনগুলো আমি তাদেরকে দেখিয়েছি। আবার তাদেরকে একথাও জিজ্ঞেস করো, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার পর যে জাতি তাকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করে তাকে আল্লাহ কেমন কঠিন শাস্তিদান করেন। ২২৯

যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন বড়ই প্রিয় ও মনোমুক্তকর করে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদেরকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকওয়া অবলম্বন-কারীরাই তাদের মোকাবিলায় উন্নত মর্যাদায় আসীন হবে। আর দুনিয়ার জীবিকার ক্ষেত্রে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত দান করে থাকেন।

সাফল্য ও ব্যর্থতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, সেই সময়ের অপেক্ষায় থেকো না যখন আল্লাহ ও তাঁর রাজ্যের কর্মচারী ফেরেশতাগণ সামনে এসে যাবেন। কারণ তখন তো সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। ঈমান আনার ও আনুগত্যের শির অবলম্বন করার মূল্য ও মর্যাদা ততঙ্গণই দেয়া হবে যতক্ষণ প্রকৃত সত্য মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র ধৃক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করে নিজের বৃদ্ধিমস্তার পরিচয় দেবে এবং নিচৰুক সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে তার আনুগত্য করে নিজের নৈতিক শক্তির প্রমাণ দেবে। অন্যথায় যখন প্রকৃত সত্য সকল প্রকার আবরণ মুক্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, মানুষ চর্মচক্ষে আল্লাহকে দেখবে, তাঁর মহাপ্রতাপ ও পরাক্রমের সিংহাসনে সমাসীন, সীমাহীন এ বিশ্ব সংসারের বিশাল রাজত্ব তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হতে দেখবে, ফেরেশতাদের দেখবে আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় এবং মানুষের এ সত্তাকে আল্লাহর প্রচণ্ড শক্তির বাঁধনে একাত্ত অসহায় দেখতে পাবে—এসব কিছু চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর যদি কেউ ঈমান আনে ও সত্যকে মেনে চলতে উদ্যত হয় তাহলে তার এ ঈমান আনার ও সত্যকে মেনে চলার আকাংখার কোন

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِّرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبِيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهُنَّى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَازِنُهُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি, তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবী পাঠান। তারা ছিলেন সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেষ্টিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভৌতিকপ্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করা যায়।—(এবং প্রথমে তাদেরকে সত্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়নি বলে এ মতভেদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, তা নয়) মতভেদ তারাই করেছিল যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও কেবলমাত্র পরম্পরার ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাহিল বলেই সত্য পরিহার করে বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করে।<sup>২৩০</sup>—কাজেই যারা নবীদের ওপর দ্রুমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ নিজের ইচ্ছাক্রমে সেই সত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান সত্য সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

দামই নেই। সে সময় কোন পাক্ষ কাফের ও নিকৃষ্টতম অপরাধীও অস্থীকার ও নাফরমানি করার সাহস করবে না। আবরণ উন্নোচন করার মুহূর্ত আসার আগে পর্যন্ত দ্রুমান আনার ও আনুগত্য করার সুযোগ রয়েছে। আর যখন সে মুহূর্তটি এসে যায় তখন আর গরীবাও নেই, সুযোগও নেই। বরং তখন চূড়ান্ত মীমাংসা ও ফায়সালার সময়।

২২৯. দু'টি কারণে এ প্রশ্নের জন্য বনী ইসরাইলকে নির্বাচন করা হয়েছে। এক : প্রাচীন ধর্মসাবশেষের নিষ্পূর্ণ স্তুপের তুলনায় একটি জীবিত জাতি অনেক বেশী শিক্ষা ও উপদেশের বাহন হতে পারে। দুই : বনী ইসরাইলকে কিতাব ও নবুওয়াতের আলোকবর্তিকা দিয়ে বিশ্বাসীর নেতৃত্বদানের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বৈষয়িক প্রীতি, ভোগবাদ, মূনাফিকী এবং জ্ঞান ও কর্মের ভাস্তিতে লিপ্ত হয়ে এ নিয়ামত

۱۰۰ أَمْ حِسْبُرَ إِنْ تَلْخُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتِكُمْ مِثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  
 ۱۰۱ قَبْلِكُمْ مُسْتَهْمِمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزِلْزَلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ  
 ۱۰۲ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرًا لِلَّهِۚ أَلَا إِنْ نَصْرًا لِلَّهِ قَرِيبٌ

তোমর ২৩১ কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জানাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা দীমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্রেশ ও বিপদ-মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল এবং তাঁর সাথে যারা দীমান এনেছিল তারা চীৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে সাত্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, অবশ্যিই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।

থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছিল। কাজেই তাদের পরে যে জাতিকে বিশ-নেতৃত্বের আসনে বসানো হয়েছে, তারা এ ইসরাইলী জাতির পরিণাম থেকেই সবচেয়ে বেশী কার্যকর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৩০. অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকেরা আন্দাজ ও অনুমানের ডিন্তিতে “ধর্মের” ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বলে : মানুষের জীবনের সূচনা হয়েছে শিরকের অঙ্গকারের মধ্য দিয়ে। তারপর ক্রমিক বিবর্তন ও ক্রম-উন্নতির মাধ্যমে অঙ্গকার অপসৃত হতে ও আলোকময়লা বাড়তে থেকেছে। এভাবে অবশ্যে একদিন মানুষ তৌহীদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। বিপরীতপক্ষে কুরআন বলছে : পরিপূর্ণ আলোর মধ্যেই দুনিয়ায় মানুষের জীবন কালের সূচনা হয়েছে। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম যে মানুষটিকে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে প্রকৃত সত্যের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তার জন্য সঠিক পথ কোনটি তাও বলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনী আদম সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তারা একটি উষ্মাত ও একই দলভুক্ত ছিল। অতপর লোকেরা নতুন নতুন পথ ও বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে থাকে। তাদের প্রকৃত সত্যের জ্ঞান ছিল না বলে তারা এমনটি করেছিল তা নয় বরং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত থাকার পরও তাদের কেউ কেউ নিজেদের বৈধ অধিকারের চাইতে বেশী মর্যাদা, খার্থ ও দাত অর্জন করতে চাইতো। এ জন্য তারা পরম্পরারের ওপর যুলুম, উৎপীড়ন ও বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছা পোষণ করতো। এই গলদ ও অনিষ্টকারিতা দূর করার জন্য মহান আল্লাহ নবী পাঠাতে শুরু করেন। নবীদেরকে এ জন্য পাঠানো হয়নি যে, তাঁরা প্রত্যেকে একটি পৃথক ধর্মের ডিত গড়ে তুলবেন এবং প্রত্যেকের পৃথক উষ্মাত গড়ে উঠবে। বরং মানুষের সামনে তদের হারানো সত্যপথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে তাদেরকে পুনরায় একই উষ্মাতের অন্তরভুক্ত করাই ছিল তাঁদের পাঠাবার উদ্দেশ্য।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۝ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ  
 فَلِلَّهِ الْدِينُ وَالآقْرَبُينَ وَالْيَتَمَّى وَالْمَسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْهِ ۝ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ  
 وَهُوَ كَرِهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى  
 أَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

লোকেরা জিজ্ঞেস করছে, আমরা কি ব্যয় করবো? জবাব দাও, যে অর্থই তোমরা ব্যয় কর না কেন তা নিজেদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-বজন, ইয়াতীয়, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করো। আর যে সৎকাজই তোমরা করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত হবেন।

তোমাদের যুদ্ধ করার হস্তুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আবার হতে পারে কোন জিনিস তোমরা পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

২৩। ওপরের আয়াত ও এ আয়াতের মাঝখান একটি পূর্ণাংশ কাহিনী অবর্ণিত রয়ে গেছে। আয়াতে এদিকে ইথগিত করা হচ্ছে এবং কুরআনের মুক্তি সূরাগুলোয় (যেগুলো সূরা বাকারার পূর্বে নাফিল হয়েছে) এ কাহিনী বিশ্঳েষিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার যে কোন দেশে যখনই নবীদের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তাঁরা ও তাঁদের প্রতি বিশ্বাসহৃদানকারী গোষ্ঠী আল্লাহদেবৈ মানব সমাজের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা কোন অবস্থায়ই নিজেদের প্রাণের পরোয়া করেননি। বাতিল পক্ষতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তাঁরা আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ কখনো কুসুমাস্তীণ ছিল না। ইসলামের প্রতি ইমান আনার পর কেউ দু'দণ্ডের জন্য নিশ্চিতে আরামে বসে থাকতে পারেনি। প্রতি যুগে ইসলামের প্রতি ইমান আনার স্বাভাবিক দাবী হিসেবে ইমানদার গোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। যে শয়তানী ও বিদ্রোহী শক্তি এ সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তার শক্তির দর্প ছৃণ করার জন্য ইমানদারদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَسْلُو نَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۝ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ  
 وَصَلَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرِ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ  
 أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْ اللَّهِ وَالْفِتْنَةِ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ ۝ وَلَا يَرَى الْوَنَّ  
 يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرْدُوكُمْ عَنِ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوا  
 وَمَنْ يَرْتَدِ دِينَهُ فَإِيمَانُهُ هُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَيْطَتْ  
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ وَأَوْلَئِكَ أَعْنَبُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَلِونَ ⑯

## ২৭ রূক্তি

লোকেরা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজেস করছে। বলে দাও : এই মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথ আল্লাহ-বিশাসীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চাইতেও বেশী খারাপ কাজ। আর ফিত্না হত্যাকাণ্ডের চাইতেও গুরুতর অপরাধ। ২৩২ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেই যাবে, এমন কি তাদের ক্ষমতায় কুলোলে তারা তোমাদেরকে এই দীন থেকেও ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। (আর একথা খুব ভালোভাবেই জেনে রাখো), তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এই দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখ্যেরাতে উভয় স্থানে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ধরনের সমস্ত লোকই জাহানামের বাসিন্দা এবং তারা চিরকাল জাহানামে থাকবে। ২৩৩

২৩২. এ বিষয়টি একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিতীয় হিজরীর রজব মাসে মক্কা ও তায়েকের মধ্যবর্তী 'নাখল' নামক স্থানে আটজনের একটি বাহিনী পাঠান। কুরাইশদের গতিবিধি ও তাদের ভবিষ্যত সংকল্প সম্পর্কে তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেন। যুদ্ধ করার কোন অনুমতি তাদেরকে দেননি। কিন্তু পথে তারা কুরাইশদের একটি ছোট বাণিজ্যিক কাফেলার মুখ্যমুখ্যি হয়।

কামেলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা একজনকে হত্যা করে এবং বাদবাকি সবাইকে প্রেরিত করে অর্থ ও পণ্য সজ্ঞারসহ তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসে। তাদের এ পদক্ষেপটি এমন এক সময় গৃহীত হয় যখন রজব শেষ হয়ে শাবান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ আক্রমণটি রজব মাসে (অর্থাৎ হারাম মাসে) সংঘটিত হয়েছিল কি না এ ব্যাপারটি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কিন্তু কুরাইশরাও পর্দাস্তরালে তাদের সাথে যোগসাজকারী ইহুদি ও মদীনার মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার জন্য এ ঘটনাটির কথা চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকে। তারা কঠিন আপত্তি জানিয়ে প্রচার করতে থাকে হী, এরা বড়ই আল্লাওয়াল্লা হয়েছে। অর্থ হারাম মাসেও রক্তপাত করতে কৃতিত হয় না। এ আয়াতে তাদের এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। জবাবের সার নির্যাস হচ্ছে : হারাম মাসে লড়াই করা নিসন্দেহে বড়ই গহিত কাজ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপন করা তাদের জন্য শোভা পায় না, যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে তেরো বছর ধরে তাদের অসংখ্য ভাইয়ের ওপর যুদ্ধ নির্মাতন চালিয়ে এসেছে। তাদেরকে এমনভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করেছে যে, তারা বুদ্ধেশ ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারপর এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তাদের ঐ ভাইদের মসজিদে হারাম যাবার পক্ষও বক্ষ করে দিয়েছে। অর্থ মসজিদে হারাম কারোর নিজের সম্পত্তি নয়। গত দু'হাজার বছর থেকে কোন দিন কাউকে এ ঘরের যিয়ারতে বাধা দেয়া হয়নি। কাজেই এ ধরনের কল্পকিত চরিত্রের অধিকারী জালেমরা কোনু মুখে সামান্য একটি সীমান্ত সংরক্ষণ নিয়ে এত বড় হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে এবং আপত্তি ও অভিযোগ উথাপন করে চলছে? অর্থ এ সংবর্ষে নবীর অনুমতি ছাড়াই সবকিছু ঘটেছে। এ ঘটনাটিকে বড় জোর এভাবে বলা যেতে পারে, একটি ইসলামী জামায়াতের কয়েকজন লোক একটি দায়িত্বহীন কাজ করে বসেছে।

এ প্রসংগে একথা মনে রাখা দরকার যে, এ তথ্য সংগ্রাহক বাইনীটি বল্পী ও গনীমাত্রের মাল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদ্যমতে হারিয়ে হবার সাথে সাথেই তিনি বলেন, আমি তো তোমাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেইনি। তাছাড়া তারা যে গনীমাত্রের মাল এনেছিল তা থেকে তিনি বাইতুল মালের অংশ নিতেও অঙ্গীকৃতি জানান। তাদের এ শুরু অবৈধ ছিল, এটি তারই প্রমাণ। সাধারণ মুসলমানরাও এ পদক্ষেপের কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট নিজেদের লোকদেরকে কঠোরভাবে তিরকার করে। মদীনার একটি লোকও তাদের এ কাজের প্রশংসা করেনি।

২৩৩. সততা ও সংখ্যবণ্ণতার ভূল ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের কোন কোন সরলমনা ব্যক্তি মকার কাফের ও ইহুদিদের উপরোক্তিত অভিযোগে প্রত্যাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এই আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের এসব কথায় তোমাদের ও তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যাবে, একথা মনে করো না। তারা বেঝাপড়ার জন্য অভিযোগ করছে না। তারা তো আসলে কাঁদা কুড়তে চায়। তোমরা কেন এই দীনের প্রতি ঈমান এনেছো এবং কেন দুনিয়াবাসীর সামনে এর দ্বাওয়াত পেশ করে চলেছো—একথা তাদের মনে কাঁচার মতো বিধুছে। কাজেই ষষ্ঠিদিন তারা নিজেদের কুফীর ওপর আটে রয়েছে এবং তোমরাও এই দীন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছো

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَنَّمْ وَأَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ  
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ ۝ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْافِعُ النَّاسِ زَوْاْءٌ هُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ  
نَفْعِهِمَا ۝ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ ۝ قُلِ الْعَفْوُ كُلُّ لَكَ يَبْسِ  
اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمِ ۝ قُلِ اصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ  
فَإِغْوَانَكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَا عَنْتَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

বিপরীত পক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে ও  
জিহাদ করেছে<sup>৩৪</sup> তারা সংগতভাবেই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ  
তাদের ভূল-ক্ষতি ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের প্রতি নিজের কর্মণাধারা বর্ণ করবেন।

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে : মদ ও জুয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কি ? বলে দাও :  
ঐ দু'টির মধ্যে বিরাট ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যদিও লোকদের জন্য তাতে কিছুটা  
উপকারিতাও আছে, কিন্তু তাদের উপকারিতার চেয়ে গোনাহ অনেক বেশী।<sup>৩৫</sup>

তোমাকে জিজ্ঞেস করছে : আমরা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবো ? বলে দাও :  
যা কিছু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য  
স্থৰ্থহীন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, হয়তো তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়  
হানের জন্য চিঠ্ঠা করবে।

জিজ্ঞেস করছে : এতিমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে ? বলে দাও :  
যে কর্মপক্ষতি তাদের জন্য কল্যাণকর তাই অবলম্বন করা ভালো।<sup>৩৬</sup> তোমারা  
যদি তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপাতি ও ধাকা-ধাওয়া যৌথ ব্যবস্থাপনায়  
রাখো তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তারা তো তোমাদের ভাই। অনিষ্টকারী ও  
হীতকারী উভয়ের অবস্থা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আল্লাহ চাইলে এ ব্যাপারে  
তোমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ও পরাক্রমের  
অধিকারী হিবার সাথে সাথে জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী।

ততদিন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন প্রকার বোবাপড়া ও সমরোতা হতে পারে না। আর এই ধরনের শক্তিদেরকে তোমরা মামুলি শক্তি মনে করো না। যারা তোমাদের অর্থ-সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে চায় তারা অপেক্ষাকৃত হোট পর্যায়ের শক্তি। কিন্তু যারা তোমাদেরকে আল্লাহর সত্য দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে চায় তারাই তোমাদের নিন্তৃষ্টতম শক্তি। কারণ প্রথম শক্তি তোমাদের বৈষয়িক ক্ষতি করতে চায় কিন্তু বিতীয় শক্তি চায় তোমাদেরকে আখেরাতের চিরন্তন আয়াবের মধ্যে ঠেলে দিতে এবং এ জন্য সে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২৩৪. জিহাদ অর্থ হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনে নিজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটি নিছক যুদ্ধের সমার্থক কোন শব্দ নয়। যুদ্ধের জন্য আরবীতে ‘কিতাল’ (রক্তপাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়। জিহাদের অর্থ তার চাইতে ব্যাপক। সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধনা এর অন্তরভুক্ত। মুজাহিদ এমন এক ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সর্বক্ষণ নিজের উদ্দেশ্য ও দাঙ্গ সাধনে নিমগ্ন, যার মতিজ্ঞ সবসময় ঐ উদ্দেশ্য সম্পাদনের উপায় ও কৌশল উদ্ভাবনে ব্যস্ত। যার কঠ ও দেখনী, নিজের উদ্দেশ্যের প্রচারণায় নিয়োজিত। মুজাহিদের হাত, পা ও শরীরের প্রতিটি অংশ প্রত্যুৎসূ জিহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সারাক্ষণ প্রচেষ্টা, সাধনা ও প্রতিষ্ঠান করে চলছে। জিহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সে নিজের সম্ভাব্য সমস্ত উপায়-উপকরণ মিলিয়ে করে, পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই পথের সমস্ত বাধার মোকাবিলা করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন প্রাণ উৎসর্গ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন নিখিলায় এগিয়ে যায়। এর নাম “জিহাদ”। আর আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছে : এ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। এই দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর দীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহর বাণী ও বিধান দুনিয়ার সমস্ত মতবাদ, চিন্তা ও বিধানের উপর বিজয় লাভ করবে। মুজাহিদের সামনে এ ছাড়া আর বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ ধাকবে না।

২৩৫. এটি হচ্ছে মদ ও জ্যো সম্পর্কে প্রথম নির্দেশ। এখানে শুধুমাত্র অপছন্দের কথা ব্যক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে মন ও মতিক তার হারাম হবার বিষয়টি গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। পরে মদ পান করে নামায পড়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর সবশেষে মদ ও জ্যো এবং এই পর্যায়ের সমস্ত বস্তুকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়। (দেখুন সূরা নিসা, ৪৩ আয়াত এবং সূরা মা-য়েদাহ, ৯০ আয়াত)।

২৩৬. এই আয়াত নাযিল হবার আগে এতিমদের অধিকার সরক্ষণের ব্যাপারে কুরআনে বারবার কঠোর নির্দেশ এসে গিয়েছিল। সে নির্দেশগুলোয় এতদূর বলে দেয়া হয়েছিল যে, “এতিমদের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না” এবং “যারা যুক্ত নিয়াতন চালিয়ে এতিমদের সম্পদ ধায় তারা আগন্তের সাহায্যে নিজেদের পেট ভরে।” এই কঠোর নির্দেশের ভিত্তিতে এতিম ছেলেমেয়েদের লাখন পালনকারীরা এতদূর ভীত ও সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, তারা এতিমদের ধাওয়া পরার ব্যবহা নিজেদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। এই ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার পরও তারা এতিমদের সম্পদের কিছু অংশ তাদের নিজেদের সাথে মিলে যাবার ভয় করছিল। তাই তারা এই এতিম ছেলেমেয়েদের সাথে লেনদেন ও আচরণের সঠিক পদ্ধতি কি হতে পারে সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন।

وَلَا تَنِكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا فَلَا مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ  
 مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا تَنِكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى  
 يُؤْمِنُوا وَلَعِبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ  
 أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يُنَزِّلُ مَعَهُمْ<sup>مَّا</sup> جَنَّةٌ وَالْمَفِيرَةُ  
 بِرَادِنَّهُ وَيَبِسِّنَ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ⑩

মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা দ্বিমান আনে। একটি সত্রাত্ত মুশরিক নারী তোমাদের মনহরণ করলেও একটি মু'মিন দাসী তার চেয়ে ভালো। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে নিজেদের নারীদের কখনো বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা দ্বিমান আনে। একজন সত্রাত্ত মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুক্ষ করলেও একজন মুসলিম দাস তার চেয়ে ভালো। তারা তোমাদের আহবান জানাচ্ছে আগুনের দিকে<sup>২৩৭</sup> আর আল্লাহই নিজ ইচ্ছায় তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন জানাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি নিজের বিধান সূপ্তিষ্ঠ ভাষায় লোকদের সামনে বিবৃত করেন। আশা করা যায়, তারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে।

২৩৭. মুশরিকদের সাথে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে শুধরে যে কথা বলা হয়েছে এটি হচ্ছে তার মূল কারণ ও যুক্তি। নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়েটা নিছক একটি যৌন সম্পর্ক মাত্র নয়। বরং এটি একটি গভীর তামাদুনিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মানসিক সম্পর্ক। মু'মিন ও মুশরিকের মধ্যে যদি মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে যেখানে 'একদিকে' মু'মিন স্বামী বা স্ত্রী প্রভাবে মুশরিক স্ত্রী বা স্বামী এবং তার পরিবার ও পরবর্তী বংশধররা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন ধারায় গভীরভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে, সেখানে অন্যদিকে মুশরিক স্বামী বা স্ত্রীর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও আচার-ব্যবহারে কেবলমাত্র মু'মিন স্বামীর বা স্ত্রীরই নয় বরং তার সমগ্র পরিবার ও পরবর্তী বংশধরদেরও প্রভাবিত হবার সঙ্গাবন্ধ রয়েছে। এই ধরনের দাস্পত্য জীবনের ফলশ্রুতিতে ইসলাম কুফর ও শিরকের এমন একটি মিথিত জীবন ধারা সেই গৃহে ও পরিবারে লালিত হবার সঙ্গাবনাই বেশী, যাকে অমুসলিমরা যতই পছন্দ করুক্ষ না কেন ইসলাম তাকে পছন্দ করতে এক মূল্যবৰ্ত্তের জন্যও প্রস্তুত নয়। কোন খাটি ও সাঢ়া মু'মিন নিছক নিজের যৌন লালসা পরিত্বার জন্য কখনো নিজ গৃহে ও পরিবারে কাফেরী ও মুশরিকী চিন্তা-আচার-আচারণ লালিত হবার এবং নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের জীবনের কোন ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকে প্রভাবিত হয়ে যাবার বিপদ ডেকে আনতে পারে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোন মু'মিন কোন মুশরিকের প্রেমে পড়ে গেছে তাহলেও

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيفِ قُلْ هُوَذِيٌّ فَاعْتَرِزْ لِلْنِسَاءِ فِي  
الْمَحِيفِ وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا نَطَهْرَنَ فَأَتُوهُنَّ  
مِنْ حِلْثَ أَمْرَكَرَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ نِسَاءُكُرْ حَرَثْ لَكُرْ فَاتُوا حَرَثَكَرَانِي  
شِئْتُمْ رَوْقِيلْ مَوْا لَأَنْفِسَكَرْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُرْ مَلْقُوتَهُ ۝  
وَبِشْرِ الْمُؤْمِنِي ۝

২৮ রূপকৃত

তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি? বলে দাও : সেটি একটি অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। ২৩৮ এ সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধারে কাছেও যেয়ো না। ২৩৯ তারপর যখন তারা পাক-পবিত্র হয়ে যায়, তাদের কাছে যাও যেভাবে যাবার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। ২৪০ আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষিক্ষেতে যাও, ২৪১ তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো ২৪২ এবং আল্লাহর অস্তোষ থেকে দূরে থাকো। একদিন তোমাদের অবশ্যি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, একথা ভালোভাবেই জেনে রাখো। আর হে নবী! যারা তোমার বিধান মেনে নেয় তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুখবর শুনিয়ে দাও।

তার ঈমানের দাবী হচ্ছে এই যে, সে নিজের পরিবার, বশ্বধর ও নিজের দীন, নৈতিকতা ও চরিত্রের স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত আবেগকে কুরবানী করে দেবে।

২৩৮. মূল আয়াতে 'আয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় অশুচিতা, অপরিচ্ছন্নতা আবার রোগ-ব্যধি। হায়েয কেবলমাত্র একটি অশুচিতা ও অপরিচ্ছন্নতাই নয় বরং চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই অবস্থাটি সুস্থতার তুলনায় অসুস্থতারই বেশী কাছাকাছি।

২৩৯. এ ধরনের বিষয়গুলোকে কুরআন মজীদ উপমা ও রূপকের মাধ্যমে পেশ করে। তাই এখানে দূরে থাকা ও ধারে কাছে না যাওয়া শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عَرْضَةً لِّإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبْرُوا وَتَتَقَوَّ  
وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ۝ لَا يَرَاخِلُ كُمْ  
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي إِيمَانِكُمْ وَلَكُمْ بِإِيمَانِكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ  
۝ قُلْ وَبِكُمْ رَوَاهُ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

যে শপথের উদ্দেশ্য হয় সৎকাজ, তাকওয়া ও মানব কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা, তেমনি ধরনের শপথবাক্য উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহর নাম ব্যবহার করো না। ২৪৩ আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কথা শুনছেন এবং তিনি সবকিছু জানেন। তোমরা অনিচ্ছায় যেসব অর্থহীন শপথ করে ফেলো সেগুলোর জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, ২৪৪ কিন্তু আন্তরিকভাব সাথে তোমরা যেসব শপথ গ্রহণ করো সেগুলোর জন্য তিনি অবশ্যি পাকড়াও করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।

এই নয় যে, ঝুঁতুবতী নারীর সাথে এক বিছানায় বসা বা এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে না। তাদেরকে অশ্রু-অশুচি মনে করে এক ধারে ঠেলে দিতে হবে, এমন কথা নয়। যদিও ইহুদি, হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম জাতিদের মধ্যে ঝুঁতুবতী স্ত্রীদের সাথে এ ব্যবহার কোথাও কোথাও প্রচলিত দেখা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যায়, ঝুঁতুবতী অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কেবলমাত্র সহবাস ছাড়া বাকি সকল প্রকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

২৪০. এখানে শরীয়াতের নির্দেশের কথা বলা হয়নি। বরং এমন নির্দেশের কথা বলা হয়েছে যা স্বত্বাব সিদ্ধ ও প্রকৃতিজ্ঞাত। মানুষ ও জীবজন্তুর স্বত্বাব ও প্রকৃতির মধ্যে যাকে নারীবে ও সংগোপনে ক্রিয়াশীল রাখা হয়েছে এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি প্রাণী যে সম্পর্কে ব্রাতাবিকভাবেই সচেতন।

২৪১. অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়ম নারীকে পুরুষের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করেনি বরং তাদের উভয়ের মধ্যে জমি ও কৃষকের মতো একটা সম্পর্ক রয়েছে। জমিতে কৃষক নিছক বিচরণ ও ভূমণ করতে যায় না। জমি থেকে ফসল উৎপাদন করার জন্যই সে সেখানে যায়। মানব বৎস ধারার কৃষককেও মানবতার এই জমিতে স্থান উৎপাদন ও বৎশধারাকে সমুত্তৰ রাখার লক্ষ্যেই যেতে হবে। মানুষ এই জমিতে কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে সে সহজে আল্লাহর শরীয়াতের কোন বক্তব্য নেই। তবে তার দাবী কেবল এতটুকুন যে, তাকে জমিতেই যেতে হবে এবং সেখান থেকে ফসল উৎপাদন করার লক্ষ্যেই যেতে হবে।

لِلَّذِينَ يَرْكُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُو فَإِنْ  
اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>(১)</sup>

যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ। ২৪৫ যদি তারা রঞ্জ করে (ফিরে আসে) তাহলে আল্লাহহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ২৪৬ আর যদি তারা তালাক দেবার সংকল্প করে ২৪৭ তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। ২৪৮

২৪২. এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দু'টি অর্থ হয়। দু'টিরই গুরুত্ব সমান। এর একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের বৎসরার ব্রক্ষা করার চেষ্টা করো। তোমাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগেই যেন তোমাদের স্থান গ্রহণকারী তৈরি হয়ে যায়। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যে পরবর্তী বৎসরকে তোমরা নিজেদের স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছো, তাকে দীন, ইমান, চরিত্র, নৈতিকতা ও মানবিক শুণাবনীতে ভূষিত করার চেষ্টা করো। পরবর্তী বাক্যে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, এই দু'টি দায়িত্ব পালনে তোমরা যদি বেছেয় গাফলতি বা ত্রুটি করো তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

২৪৩. সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খাওয়ার পর যখন কসম তেঙ্গে ফেলাই তার জন্য কল্প্যাণকর বলে সুম্পষ্টভাবে বুঝাতে পারে তখন তার কসম তেঙ্গে ফেলা এবং তার কাফ্ফারা আদায় করা উচিত। কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা হচ্ছে, দশজন মিসকিনকে আহার করানো অথবা তাদের বন্দুদান করা বা একটি দাস মুক্ত করে দেয়া অথবা তিনি দিন রোয়া রাখা। (সূরা মা-য়েদাহর ৮৯ আয়াত দেখুন)।

২৪৪. অর্থাৎ কথার কথা হিসেবে অনিষ্ট্যকৃতভাবে যেসব শপথ বাক্য তোমাদের মুখ থেকে বের হয়ে যায়, সেগুলোর জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

২৪৫. ফিকাহর পরিভাষায় একে বলা হয় 'ইলা'। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবসময় মধুর সম্পর্ক থাকা তো সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময় সম্পর্ক তেঙ্গে যাওয়ার বহুবিধ কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর শরীয়াত এমন ধরনের সম্পর্ক ভাঙ্গা পছন্দ করে না যার ফলে উভয়ে অইনগতভাবে দাস্পত্য বৌধনে আটকে থাকে কিন্তু কার্যত পরম্পর এমনভাবে আলাদা থাকে যেন তারা স্বামী-স্ত্রী নয়। এই ধরনের সম্পর্ক বিকৃতির জন্য আল্লাহহ চার মাস সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই চার মাসের মধ্যে উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করতে হবে। অন্যথায় এই সম্পর্ক ছির করে দিতে হবে। তারপর উভয়ে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারবে।

আয়াতে যেহেতু 'কসম খেয়ে বসা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই হানাফী ও শাফেই ফকীহগণ এই আয়াতের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, যেখানে স্বামী তার

স্তুর সাথে দাপ্তর সম্পর্ক না রাখার কসম খায় একমাত্র সেখানেই এই বিধানটি কার্যকর হবে। আর কসম না খেয়ে দাপ্তর সম্পর্ক যত দীর্ঘকালের জন্য ছিল করুক না কেন এই আয়াতের নির্দেশ সেখানে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু মালেকী ফকীহদের যত হচ্ছে, কসম খাক বা না খাক উভয় অবস্থায় এই চার মাসের অবকাশ পাবে। ইমাম আহমাদের (র) একটি বক্তব্যও এর সমর্থনে পাওয়া যায়।

হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরীর (র) মতে এই নির্দেশটি শুধুমাত্র বিকৃতির কারণে যে সম্পর্কছেদ হয় তার জন্য প্রযোজ্য। তবে কোন অসুবিধার কারণে স্থামী-স্তুর মধ্যে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় স্থামী যদি স্তুর সাথে দৈহিক সম্পর্কছেদ করে তবে তার উপর এই নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু অন্যান্য ফকীহদের মতে স্থামী-স্তুর মধ্যকার দৈহিক সম্পর্ক ছিলকারী প্রত্যেকটি শপথই ‘ঈলা’র অন্তরভূত এবং সন্তুষ্টির সাথে হোক বা অসন্তুষ্টির সাথে হোক চার মাসের বেশী সময় পর্যন্ত এই ধরনের অবস্থা অব্যাহত থাকা উচিত নয়।

২৪৬. কোন কোন ফকীহ এ বাক্যের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, এই নির্দিষ্ট সময়-কালের মধ্যে যদি তারা নিজেদের কসম ডেঙ্গে ফেলে এবং তাদের স্থামী-স্তুর সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করে নেয়, তাহলে তাদের কসম ভাঙার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। আল্লাহ তাদেরকে এমনিতেই মাফ করে দেবেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর মত হচ্ছে এই যে, কসম ভাঙার জন্য কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু বলার মানে এই নয় যে, কাফ্ফারা মাফ করে দেয়া হয়েছে। বরং এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদের কাফ্ফারা কবুল করে নেবেন এবং সম্পর্কছেদের সময়ে তোমরা পরম্পরের উপর যেসব বাড়াবাড়ি করেছিলে সেগুলো মাফ করে দেবেন।

২৪৭. হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রযুক্ত সাহাবীগণের মতে ‘রঞ্জু’ করার অর্থাংশ শপথ ভাঙার ও পুনরায় স্থামী-স্তুর সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ চার মাস সময়-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সময়টি অতিবাহিত হয়ে যাওয়া এই অর্থ বহন করে যে, স্থামী তালাক দেয়ার সংকল্প করেছে। তাই এ অবস্থায় এই নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথেই আপনা আপনি তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। সেটি হবে এক ‘তালাকে বায়েন’। অর্থাৎ ইদত পালনকালে স্থামীর আর স্তুকে গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। তবে তারা উভয়ে চাইলে আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারবে। হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা) খেকেও এই ধরনের একটি বক্তব্য উদ্ভৃত হয়েছে। হানাফী ফকীহগণ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন।

সাইদ ইবনে মুসাইয়োর, মাকহুল, যুহরী প্রমুখ ফকীহগণ এই মতটির এই অংশটুকুর সাথে একমত হয়েছেন যে, চার মাস সময় অতিবাহিত হবার পর স্বত্ত্বত্বভাবে তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের মতে সেটা হবে এক ‘তালাকে রঞ্জন্ত’। অর্থাৎ ইদত পালন কালে স্থামী আবার স্তুকে রঞ্জ করার তথা দাপ্তর সম্পর্কে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে। আর যদি ‘রঞ্জু’ না করে তাহলে ইদত অতিবাহিত হবার পর দু’জন আবার চাইলে বিয়ে করতে পারবে।

وَالْمَطْلُقُتْ يَتَرْبَصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُونٍ وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ  
 آن يَكْتَمُ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنْ يَؤْمِنُ بِإِلَهٖهِ  
 وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
 إِصْلَاحًا وَلَهُنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
 عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

۱۶۶

তালাক প্রাণ্ডাগণ তিনবার মাসিক ঝুঁতুস্বাব হওয়া পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের কথনো এমনটি করা উচিত নয়, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাদের স্বামীরা পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত হয়, তাহলে তারা এই অবকাশ কালের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে। ২৪৯

নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর। তবে পুরুষদের তাদের ওপর একটি মর্যাদা আছে। আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী।

২৪৮. অর্থাৎ যদি ভূমি অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে নিশ্চল থেকো না। তিনি তোমার বাড়াবাড়ি ও অন্যায় সম্পর্কে অনবিহিত নন।

২৪৯. এই আয়াতে প্রদত্ত বিধানটির ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের একটি দলের মতে, স্ত্রীর তৃতীয় ঝুঁতুস্বাব বক্ত হয়ে যাবার পর যতক্ষণ সে গোসল করে পাক-সাফ না হয়ে যাবে ততক্ষণ তালাকে বায়েন অনুষ্ঠিত হবে না। এবং ততক্ষণ স্বামীর ঝুঁতু করার অধিকার থাকবে। হ্যরত আবু বকর (রা), হ্যরত উমর (রা), হ্যরত অলী (রা), হ্যরত ইবনে আব্রাহাম (রা), হ্যরত আবু মূসা আশ'আরী (রা), হ্যরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবীগণ এই মত পোষণ করেন। হানাফী ফকীহগণও এই মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। বিপরীত পক্ষে অন্য দলটি স্ত্রীর তৃতীয় ঝুঁতুস্বাব শুরু হবার সাথে সাথেই স্বামীর 'রঞ্জু' করার অধিকার ব্যতম হয়ে যাবে। এই মত পোষণ করেন, হ্যরত আয়েশা (রা), হ্যরত ইবনে উমর (রা), হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), শাফেঈ ও মালেকী ফকীহগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই

الطلاق مرتين فاما مسأك بمعروف أو تسرير بحسان  
 ولا يحشى لك أن تأخذ مما أتيت وهو شيئاً إلا أن  
 يخافاً إلا يقيها حذود الله فإن خفتر لا يقيها حذل وذ الله  
 فلا جناح على هما فيما افتلت به تلك حذل وذ الله فلا  
 تعتل وها ومن يتعل حذل وذ الله فوالله هم الظالمون

(٤)

২৯ মৃক্ষ

তালাক দু'বার। তারপর সোজাসুজি স্ত্রীকে রেখে দিবে অথবা তালোভাবে বিদায় করে দিবে। ২৫০

আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। ২৫১ তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশংকা করে, তাহলে এহেন অবস্থায় যদি তোমরা আশংকা করো, তারা উভয়ে আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রীর কিছু বিনিময় দিয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ লাভ করায় কোন ক্ষতি নেই। ২৫২ এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলো অতিক্রম করো না। মূলত যারাই আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই জালেম।

নির্দেশটি কেবলমাত্র যখন স্বামী তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয় তখনকার অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। স্বামী তিন তালাক দেয়ার পর আর তার রুক্ষ করার অধিকার থাকবে না।

২৫০. এই ছেট্ট আয়াতটিতে জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত একটি বড় রকমের সামাজিক ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরবে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অসংখ্য তালাক দিতে পারতো। স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হয়ে গেলে তাকে বারবার তালাক দিতে এবং আবার ফিরিয়ে নিতো। এভাবে বেচারী স্ত্রী না স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারতো আর না স্বাধীনভাবে আর কাউকে বিয়ে করতে পারতো। কুরআন মজীদের এই আয়াতটি এই জুন্মের পথ রুক্ষ করে দিয়েছে। এই আয়াতের দৃষ্টিতে স্বামী একটি বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে নিজের স্ত্রীকে বড় জোর দু'বার 'রজস্ট তালাক' দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু'বার তালাক দেয়ার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়েছে সে তার

জীবনকালে যখন তাকে তৃতীয়বার তালাক দেবে তখন সেই স্তৰী তার থেকে স্থায়ীভাবে বিছির হয়ে যাবে।

কুরআন ও হাদীস থেকে তালাকের যে সঠিক পদ্ধতি জানা যায় তা হচ্ছে এই : স্তৰীকে 'তুহর' (খৃতুকালীন রক্ত প্রবাহ থেকে পরিত্র) -এর অবস্থায় তালাক দিতে হবে। যদি এমন সময় স্তৰীর সাথে ঝগড়া হয় যখন তার মাসিক খৃতুস্ত্রাব চলছে, তাহলে তখনই তালাক দেয়া সংগত নয়। বরং খৃতুস্ত্রাব বন্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর এক তালাক দেয়ার পর চাইলে দ্বিতীয় 'তুহরে' আর এক তালাক দিতে পারে। অন্যথায় প্রথম তালাকটি দিয়ে ক্ষান্ত হওয়াই ভালো। এ অবস্থায় ইন্দত অতিক্রান্ত হবার আগে স্বামীর স্তৰীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। আর ইন্দত শেষ হয়ে যাবার পরও উভয়ের জন্য পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হওয়ার সুযোগও থাকে। কিন্তু তৃতীয় 'তুহরে' তৃতীয়বার তালাক দেয়ার পর স্বামী আর স্তৰীকে ফিরিয়ে নেয়ার বা পুনর্বার উভয়ের এক সাথে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হবার কোন অধিকার থাকে না। তবে একই সময় তিনি তালাক দেয়ার ব্যাপারটি যেমন অস্ত লোকেরা আজকাল সাধারণভাবে করে থাকে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে কঠিন গোনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে এর নিন্দা করেছেন। এমনকি হয়রত উমর (রা) থেকে এতদূর প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একই সময় স্তৰীকে তিনি তালাক দিতো তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন।

(তবুও একই সময় তিনি তালাক দিলে চার ইমামের মতে তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে কিন্তু তালাকদাতা কঠিন গোনাহের অধিকারী হবে। আর শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটি মুগাল্লায়া বা গর্হিত তালাক হিসেবে গণ্য হবে।)

২৫১. অর্থাৎ মোহরানা, গহনাপত্র ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি, যেগুলো স্বামী ইতিপূর্বে স্তৰীকে দিয়েছিল। সেগুলোর কোন একটি ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার নেই। এমনিতে কোন ব্যক্তিকে দান বা উপহার হিসেবে কোন জিনিস দিয়ে দেয়ার পর তার কাছ থেকে আবার তা ফিরিয়ে নিতে চাওয়া ইসলামী নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ঘৃণ্য কাজকে হাদীসে এমন কুরুরের কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে নিজে বমি করে আবার তা থেয়ে ফেলে। কিন্তু বিশেষ করে একজন স্বামীর জন্য নিজের স্তৰীকে তালাক দিয়ে তাকে বিদায় করার সময় সে নিজে তাকে এক সময় যা কিছু দিয়েছিল সব তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নেয়া অত্যন্ত লজ্জাকর। বিপরীতপক্ষে স্তৰীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করার নৈতিক আচরণ ইসলাম শিখিয়েছে। (৩১ রুক্ব'র শেষ আয়াতটি দেখুন)

২৫২. শরীয়াতের পরিভাষায় একে বলা হয় 'খুলা' তালাক। অর্থাৎ স্বামীকে কিছু দিয়ে স্তৰী তার কাছ থেকে তালাক আদায় করে নেয়া। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্তৰীর মধ্যে ঘরোয়াভাবেই যদি কিছু স্থিরীকৃত হয়ে যায় তাহলে তাই কার্যকর হবে। কিন্তু ব্যাপারটি যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে আদালত কেবল এতটুকু অনুসন্ধান করবে যে, এই ভদ্রমহিলা তার স্বামীর প্রতি যথার্থই এত বেশী বিরূপ হয়ে পড়েছে কিনা যার ফলে

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتْنِكَ زَوْجًا غَيْرَهُ  
 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ  
 يُقِيمَا حَلْ وَدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حَلْ وَدَ اللَّهِ يَبْيَنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অতপর যদি (দু'বার তালাক দেবার পর স্বামী তার স্ত্রীকে ত্তীয় বার) তালাক দেয়, তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না। তবে যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় এবং সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রথম স্বামী এবং এই মহিলা যদি আল্লাহর সীমাবেষ্যার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে মনে করে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরম্পরের দিকে ফিরে আসায় কোন ক্ষতি নেই। ২৫৩ এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমাবেষ্য। (এগুলো ভংগ করার পরিণতি) যারা জানে তাদের হিদায়তের জন্য এগুলো সৃষ্টি করে তুলে ধরছেন।

তাদের দু'জনের এক সাথে ঘর সংসার করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সঠিক অনুসরান চালিয়ে নিশ্চিত হবার পর আদালত অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোন বিনিময় নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। এই বিনিময় গ্রহণ করে স্বামীর অবশ্য তার স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। স্বামী ইতিপূর্বে যে পরিমাণ সম্পদ তার ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল তার চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিময় হিসেবে তাকে ফেরত দেয়া সাধারণত ফর্কীহণ পছন্দ করেননি।

'খুলা' তালাক 'রজন্দ' নয়। বরং এটি 'বায়েনা' তালাক। যেহেতু স্ত্রীলোকটি মূল্য দিয়ে এক অর্থে তালাকটি যেন কিনে নিয়েছে, তাই এই তালাকের পর আবার রুম্জু করার তথা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না। তবে আবার যদি তারা পরম্পরের প্রতি সতৃষ্ট হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবক্ষ হতে চায়, তাহলে এমনটি করা তাদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ।

অধিকাংশ ফিকাহ শাস্ত্রবিদের মতে 'খুলা' তালাকের ইদতও সাধারণ তালাকের সমান। কিন্তু আবু দাউদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি হাদীসগুলু এমন বহুত হাদীস উদ্ভৃত হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক খতুকালকে এর ইদত গণ্য করেছিলেন। হ্যরত উসমান (রা) এই অনুযায়ী একটি মাযলারও ফায়সালা দিয়েছিলেন। (ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

২৫৩. সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রাতমূলকভাবে কারোর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এই ধরনের

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا إِلَّا تَعْتَدُ وَمَنْ  
يَفْعُلْ ذَلِكَ فَقُلْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخَلُّ وَا لِيَتِ اللَّهُ  
هُرَوَّا زَوَّادُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ  
مِّنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةٌ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>(১)</sup>

আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদত পূর্ণ হবার পর্যায়ে পৌছে যায় তখন হয় সোজাসুজি তাদেরকে রেখে দাও আর নয়তো ভালোভাবে বিদায় করে দাও। নিছক কষ্ট দেবার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না। কারণ এটা হবে বাড়াবাড়ি। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে আসলে নিজের উপর জুলুম করবে।<sup>২৫৪</sup> আগ্নাহর আয়াতকে খেলা-তামাসায় পরিগত করো না। ভূলে যেয়ো না আগ্নাহ তোমাদের কত বড় নিয়মামত দান করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেছেন, যে কিতাব ও হিকমাত তিনি তোমাদের উপর নাফিল করেছেন তাকে যর্যাদা দান করো।<sup>২৫৫</sup> আগ্নাহকে তয় করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আগ্নাহ সব কথা জানেন।

বিয়ে মোটেই বিয়ে বলে গণ্য হবে না। বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যতিচার। আর এই ধরনের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোন ক্রমেই কোন মহিলা তার সাথেকে স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। হ্যরত আলী (রা), ইবনে মাসউদ (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও উকবা ইবনে আমের (রা) প্রমুখ সহাবীগণ নবী সান্নাহ আলাইহি ওয়া সালাম থেকে একযোগে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করা হয় তাদের উভয়ের উপর লানত বর্ষণ করেছেন।

২৫৪. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তারপর ইদত শেষ হবার আগে আবার তাকে ফিরিয়ে নেয় শুধুমাত্র কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ লাভ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে এটা কোনক্রমেই সঠিক কাজ বলে গণ্য হবে না। আগ্নাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, ফিরিয়ে নিতে চাইলে এই উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নাও যে, এবার থেকে তার সাথে সদাচারণ করবে। অন্যথায় ভদ্রভাবে তাকে বিদায় দাও। (আরো জানার জন্য ২৫০নং চীকা দেখুন)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلْغَنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَأَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يَوْعَظُ بِهِ  
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِيٌّ  
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُ لَا تَعْلَمُونَ  
১১০

৩০ রুম্ভু

তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর যখন তারা ইন্দত পূণ করে নেয় তখন তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত স্থামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমরা বাধা দিয়ো না, যখন তারা প্রচলিত পদ্ধতিতে পরম্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সশ্রত হয়। ২৫৬ এ ধরনের পদক্ষেপ কখনো গ্রহণ না করার জন্য তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যদি তোমরা আগ্নাহ ও পরকালের প্রতি দ্রীমান এনে থাকো। এ থেকে বিরত থাকাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে পরিমার্জিত ও সর্বাধিক পবিত্র পদ্ধতি। আগ্নাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।

২৫৫. অর্থাৎ এ সত্যটি ভুলে যেয়ো না যে, মহান আগ্নাহ তোমাদের কিতাব ও হিকমত তথা জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত করছেন। তোমাদেরকে ঘধ্যপঙ্খী উচ্চাতের (উচ্চাতে ওয়াসাত) মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদেরকে সত্যতা, সৎবৃত্তি, সৎকর্মশীলতা ও ন্যায়নিষ্ঠার মৃত্তিমান প্রতীক হিসেবে দাঢ় করানো হয়েছে। বাহনাবাজী করে আগ্নাহর আয়তকে খেল-তামাশায় পরিণত করা তোমাদের সাজে না। আইনের শব্দের আড়ালে আইনের মূল প্রাণসন্তান বিরুদ্ধে ঐবৈধ সুযোগ গ্রহণ করো না। বিশাসীকে সঠিক পথের সদ্বান দেয়ার পরিবর্তে তোমরা নিজের গৃহে জালেম ও পথচর্টের ভূমিকায় অবস্থীর্ণ হয়ো না।

২৫৬. অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোককে তার স্থামী তালাক দিয়ে দেয়ার পর ইন্দতকালের মধ্যে যদি তাকে ফিরিয়ে না নেয় এবং ইন্দতকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা দু'জন পারম্পরিক সমত্বক্রমে আবার বিয়ে করতে চায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজনদের তাদের এই পদক্ষেপে বাধা দেয়া উচিত নয়। এ ছাড়া এ আয়তটির এ অর্থও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইন্দতকাল অতিক্রম করার পর তার থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে নিজের পছন্দমতো অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়। এ ক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী স্থামী কোন হীন মানসিকতার বশবর্তী হয়ে যেন তার এ বিয়েতে বাধা হয়ে না দাঢ়ায়। যে মহিলাকে সে ত্যাগ করেছে তাকে যাতে আর কেউ গ্রহণ করতে এগিয়ে না আসে এ জন্য যেন সে প্রচেষ্টা চালাতে না থাকে।

وَالْوَالِدُتْ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ  
أَنْ يُتِمَ الرَّضَاةَ وَعَلَى الْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ  
بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكُلْ نَفْسٍ إِلَّا وَسَعَهَا لَا تَضَارُ وَاللَّهُ  
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ  
فَإِنْ أَرَادَ أَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَ تِمْرًا نَسْتَرِمْعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
○  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

যে পিতা তার স্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়; সে ক্ষেত্রে যায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের স্তানদের দুধ পান করবে।<sup>২৫৭</sup> এ অবস্থায় স্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে যায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে। কিন্তু কারোর ওপর তার সামর্থের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। কোন মা'কে এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, স্তানটি তার। আবার কোন বাপকেও এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, এটি তারই স্তান। দুধ দানকারিগীর এ অধিকার যেমন স্তানের পিতার ওপর আছে তেমনি আছে তার ওয়ারিশের ওপরও।<sup>২৫৮</sup> কিন্তু যদি উভয় পক্ষ পারম্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে এমনটি করায় কোন ক্ষতি নেই। আর যদি তোমার স্তানদের অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাবার কথা তুমি চিন্তা করে থাকো, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এ জন্য যা কিছু বিনিময় নির্ধারণ করবে তা প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করবে। আগ্নাহকে তয় করো এবং জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো না কেন সবই আগ্নাহর নজরে আছে।

২৫৭ এ নির্দেশটি এমন এক অবস্থার জন্য যখন স্থামী-স্ত্রী পরম্পর থেকে তালাক বা 'খুলা' তালাকের মাধ্যমে অথবা আদালত কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং স্ত্রীর কোলে রয়েছে দুঃখপোষ্য শিশু।

وَالَّذِينَ يَتُوفَّونَ مِنْكُمْ وَيَلْرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصُنَ  
بِإِنْفِسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاءَ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جَنَاحَ  
عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَيْرٌ وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ إِنَّ خِطْبَةَ النِّسَاءِ  
أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمًا اللَّهُ أَنْكَرَ سَقْلَ كَرْوَنَهُنَّ  
وَلِكُنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْرُرُوهُ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যায়, তাদের পরে যদি তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, তাহলে তাদের চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে (বিবাহ থেকে) বিরত রাখতে হবে। ১৫৮ তারপর তাদের ইন্দিত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা ইচ্ছামতো নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে যা চায় করতে পারে, তোমাদের ওপর এর কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ তোমাদের সবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবাহিত। ইন্দিতকালে তোমরা এই বিধাদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা ইশ্রা ইঙ্গিতে প্রকাশ করলে অথবা মনের গোপন কোণে লুকিয়ে রাখলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ জানেন, তাদের চিন্তা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু দেখো, তাদের সাথে কোন গোপন চুক্তি করো না। যদি কোন কথা বলতে হয়, প্রচলিত ও পরিচিত পদ্ধতিতে বলো। তবে বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত ততক্ষণ করবে না যতক্ষণ না ইন্দিত পূর্ণ হয়ে যায়। যুব ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের মনের অবস্থাও জানেন। কাজেই তাঁকে ডয় করো। এবং একথাও জেনে রাখো, আল্লাহ ধৈর্যশীল এবং ছোট খাটো ক্রটিগুলো এমনিতেই ক্ষমা করে দেন।

১৫৮- অর্থাৎ বাপ যদি মারা গ্রিয়ে থাকে, তাহলে তার অভিভাবককে এ অধিকার আদায় করতে হবে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفِرِضُوا  
 لَهُنْ فَرِيضَةٌ وَمِتِعَوْهُنَّ عَلَى الْمُوَسِّعِ قَدْرَةٍ وَعَلَى الْمُفْتَرِ  
 قَدْرَةٌ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقَاعَى الْمُحْسِنِينَ ۚ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ  
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقُلْ فَرِضْتُمْ لَهُنْ فَرِيضَةٌ فِي نَصْفِ  
 مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْلَةٌ  
 النِّكَاحِ ۖ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ  
 يَنْكِرُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوةِ  
 وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ ۖ وَقُومُوا لِلَّهِ قُتْبَيْنَ ۚ

৩১ রূক্ষ

নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার বা মোহরানা নির্ধারণ করার আগেই যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও তাহলে এতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যি কিছু না কিছু দিতে হবে। ২৬০ সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র তার সংস্থান অনুযায়ী প্রচলিত পদ্ধতিতে দেবে। সৎলোকদের ওপর এটি একটি অধিকার। আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তোমরা তালাক দিয়ে দাও কিন্তু মোহরানা নির্ধারিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় মোহরানার অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। স্ত্রী যদি নরম নীতি অবলম্বন করে (এবং মোহরানা না নেয়) অথবা সেই ব্যক্তি নরমনীতি অবলম্বন করে, যার হাতে বিবাহ বন্ধন নিবন্ধ (এবং সম্পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয়) তাহলে সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) নরম নীতি অবলম্বন করো। এ অবস্থায় এটি তাকওয়ার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক ব্যাপারে তোমরা উদারতা ও সহস্যতার নীতি ভুলে যেয়ো না। ২৬১ তোমাদের কার্যাবলী আল্লাহ দেখছেন।

তোমাদের নামাযগুলো ২৬২ সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে এমন নামায যাতে নামাযের সমস্ত গুণের সমবর্য ঘটেছে। ২৬৩ আল্লাহর সামনে এমনভাবে দৌড়াও যেমন অনুগত সেবকরা দৌড়ায়।

২৫৯. স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রীর ইন্দিত পালনের যে সময়—কাল এখানে বর্ণিত হয়েছে এটি এমন বিধবাদেরও পালন করতে হবে যাদের সাথে তাদের স্বামীদের বিয়ের পর একান্তে বসবাস হয়নি। তবে গর্ভবতী বিধবাদের এই ইন্দিত পালন করতে হবে না। গর্ভস্থ সন্তান প্রসব হবার সাথে সাথেই তাদের উদ্দিত পূর্ণ হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর পরই অথবা তার কয়েক মাস পরে সন্তান প্রসব হোক না কেন সমান কথা।

“নিজেদেরকে বিবরত রাখতে হবে”—এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, এই সময় বিয়ে করতে পারবে না বরং এই সংগে সংগে নিজেকে কোন প্রকার সাজ-সজ্জা ও অলংকারেও ভূষিত করতে পারবে না। হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্বামী মৃত্যুকালীন ইন্দিত পালনের সময় নারীরা রঞ্জন কাপড় ও অলংকার পরতে পারবে না, মেহেদী, সুর্মা, খুশবু ও খেজোব লাগাতে পারবে না, এমনকি কেশ বিন্যাস করতেও পারবে না। তবে এই সময় নারীরা ঘর থেকে বাইরে যেতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা), হযরত উশ্মে সালমা (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, ইবরাহীম নাখচি, মুহাম্মাদ ইবনে শীরীন এবং চার ইয়ামের মতে স্বামী যে ঘরে মারা গেছে ইন্দিত পালনকালে বিধবা স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকতে হবে। দিনের বেলা কোন প্রয়োজনে সে বাইরে যেতে পারে। কিন্তু এ ঘরের মধ্যেই তার অবস্থান হতে হবে। বিগৱাত পক্ষে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে আবুস (রা), হযরত জাবের ইবনে আবুল্হার (রা), আতা, তাউস, হাসান বসরী, উমর ইবনে আবদুল আয়ীয় এবং সকল আহলু যাহেরের মতে বিধবা স্ত্রী তার ইন্দিতকাল যেখানে ইচ্ছা পালন করতে পারে এবং এ সময় সে সফরও করতে পারে।

২৬০. সম্পর্ক স্থাপন করার পর এভাবে ভেঙে দেয়ার কারণে স্ত্রীলোকের অবশ্য কিছু না কিছু ক্ষতি তো হয়ই। সাধ্যমতো এই ক্ষতি পূরণ করার জন্যই আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছেন।

২৬১. অর্থাৎ মানবিক সম্পর্ককে ঘন্থুর ও প্রীতিপূর্ণ করার জন্য মানুষের পরম্পরারের সাথে উদার ও সহদয় আচরণ অপরিহার্য। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র তার আইনগত অধিকারটুকুই আদায় করার ওপর জোর দিতে থাকে তাহলে কথনোই সুখী সুন্দর সমাজ জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

২৬২. সামাজিক ও তামাদুনিক বিধান বর্ণনা করার পর নামাযের তাগিদ দিয়ে আল্লাহ এই ভাষণটির সমাপ্তি টানছেন। কারণ নামায এমন একটি জিনিস, যা মানুষের মধ্যে আল্লাহর ত্য, সততা, সংকর্মশীলতা ও পবিত্রতার আবেগ এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্যের তাৎক্ষণ্য সৃষ্টি করে। আর এই সংগে তাকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। মানুষের মধ্যে এ বস্তুগুলো না থাকলে সে কখনো আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারতো না। সে ক্ষেত্রে সে ইহুদি জাতির মতো নাফরমানির মৌতে গী ভাসিয়ে দিতো।

২৬৩. মূলে ‘সালাতুল উস্তা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির এর অর্থ করেছেন ফজরের নামায। কেউ যোহুরের, কেউ মাগরিবের। আবার কেউ এশার

فَإِنْ حِفْتَرْ فِرْجَالًا أَوْ رَكْبَانًا فَإِذَا أَمْتُرْ فَأَذْكُرْ وَالله  
كَمَا عَلِمْ مَالِكَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ④ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ  
مِنْكُمْ وَيَلْرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيمَةً لَا زَوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى  
الْحَوْلِ غَيْرَ أَخْرَاجٍ ۝ فَإِنْ خَرَجَنَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي  
مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِنْ مَعْرُوفٍ ۝ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيرٌ ⑤  
وَلِلْمَطَّلِقِيْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ⑥ كُنْ لِكَ  
يَبِينَ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

অশান্তি বা গোলযোগের সময় হলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সঙ্গে  
নামায পড়ো। আর যখন শান্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখন আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে  
শরণ করো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তোমরা  
অনবহিত ছিলে।

তোমাদের<sup>২৬৪</sup> মধ্য থেকে যারা মারা যায় এবং তাদের পরে তাদের স্ত্রীরা বেঁচে  
থাকে, তাদের স্ত্রীদের যাতে এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ করা হয় এবং ঘর-থেকে  
বের করে না দেয়া হয় সে জন্য “স্ত্রীদের পক্ষে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত” করে যাওয়া  
উচিত। তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় তাহলে তাদের নিজেদের ব্যাপারে  
প্রচলিত পদ্ধতিতে তারা যাই কিছু করুক না কেন তার কোন দায়-দায়িত্ব  
তোমাদের ওপর নেই। আল্লাহ সবার ওপর কর্তৃত ও ক্ষমতাশালী এবং তিনি অতি  
বিজ্ঞ। অনুরূপভাবে যেসব স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে তাদেরকেও সংগতভাবে  
কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটা মুস্তাকীদের ওপর আরোপিত অধিকার।

এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান পরিষ্কার ভাষায় তোমাদের জানিয়ে দেন। আশা  
করা যায়, তোমরা তেবেচিষ্ঠে কাজ করবে।

নামাযও মনে করেছেন। কিন্তু এর কোন একটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের  
বক্তব্য নয়। এগুলো কেবলমাত্র ব্যাখ্যা তাদের স্বকীয় উদ্বোধন ছাড়া আর কিছুই নয়। সব  
চাইতে বেশী মত ব্যক্ত হয়েছে আসরের নামাযের পক্ষে। বলা হয়ে থাকে, নবী সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামাযটিকে ‘সালাতুল উস্তা’ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যে

الْمَرْتَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلْوَفُ حَلَرَ  
الْمَوْتِ سَفَقَأَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتَوْا فَتَرَ أَحْيَا هُمْ إِنَّ اللَّهَ لَنَّ وَ  
فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

৩২ রুম্কু'

তুমি ৬৫ কি তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছো, যারা মৃত্যুর তয়ে নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল এবং তারা সংখ্যায়ও ছিল হাজার হাজার? আল্লাহ তাদের বলেছিলেন : মরে যাও, তারপর তিনি তাদের পুনর্বার জীবন দান করেছিলেন। ২৬৬ আসলে আল্লাহ মানুষের ওপর বড়ই অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ঘটনাটি থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে তাতে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে : আহ্যাব যুদ্ধের সময় মুশারিকদের আক্রমণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতদূর ব্যস্ত রেখেছিল যার ফলে বেলা গভীরে একেবারে সূর্য ডুর ডুর হয়েছিল। অথচ তখনো তিনি আসরের নামায পড়তে পারেননি। তখন তিনি বললেন : “আল্লাহ তাদের কবর ও তাদের ঘর আগুনে ভরে দিন। তারা আমাদের ‘সালাতুল উস্তা’ পড়তে দেয়নি।” এ বক্তব্য থেকেই একথা মনে করা হয়েছে যে, রসূল (সা) আসরের নামাযকে সালাতুল উস্তা বলেছেন। অথচ এই বক্তব্যের সবচেয়ে বেশী নির্ভুল অর্থ আমাদের কাছে এটাই মনে হচ্ছে যে, এই ব্যস্ততার কারণে উন্নত পর্যায়ের নামায থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এখন অসময়ে এটি পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। খুশ-খুশ তথা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে ধীরে-স্থিরে এ নামাযটি পড়া যাবে না।

‘উস্তা’ অর্থ মধ্যবর্তী জিনিসও হয়। আবার এ শব্দটি এমন জিনিস সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয় যা উন্নত ও উৎকৃষ্ট। ‘সালাতুল উস্তা’ অর্থ মধ্যবর্তী নামাযও হতে পারে আবার এমন নামাযও হতে পারে, যা সঠিক সময়ে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে মন সংযোগ সহকারে পড়া হয় এবং যার মধ্যে নামাযের যাবতীয় গুণেরও সমাবেশ ঘটে। আল্লাহর সামনে অনুগত বান্দার মতো দৌড়াও—এই প্রবর্তী বাক্যটি নিজেই ‘সালাতুল উস্তা’ শব্দটির ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে।

২৬৪. তাষণের ধারাবাহিকতা ওপরেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। উপসংহার বা পরিশিষ্ট হিসেবে এখানে এ বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয়েছে।

২৬৫. এখান থেকে আর একটি ধারাবাহিক ভাষণ শুরু হচ্ছে। এই ভাষণে মুসলমানদের আল্লাহর পথে জিহাদ ও অর্থ-সম্পদ দান করতে উদ্ব�ৃত্ত করা হয়েছে। যেসব দুর্বলতার কারণে বনী ইসরাইলরা অবশেষে অবনতি ও পতনের শিকার হয় সেগুলো থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে আলোচিত বিষয়টি অনুধাবন

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ④٤٦  
 ذَا الَّذِي يَقْرُضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
 كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْقِطُ مَوْلَاهُ تَرْجِعُونَ ④٤٧

হে মুসলমানরা! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং ভাগোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ শুবণকারী ও সর্বজ্ঞ। তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত, ২৬৭। যাতে আল্লাহ তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন? কমাবার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

করার জন্য এ বিয়টি সামনে রাখতে হবে যে, মুসলমানরা সে সময় মঙ্গা থেকে বহিক্ত হয়েছিল, এক দেড় বছর থেকে তারা যদীনায় আধ্য নিয়েছিল। এবং কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই বারবার যুদ্ধ করার অনুমতি চাইছিল। কিন্তু যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার পর এখন তাদের মধ্যে কিছু লোক ইতস্তত করছিল, যেমন ২৬ রুক্ক'র শেষ অংশে বলা হয়েছে। তাই এখানে বনী ইসরাইলদের ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২৬৬. এখানে বনী ইসরাইলদের মিসর ত্যাগের ঘটনার প্রতি ইঁধিত করা হয়েছে। সূরা মা-য়েদাহর চতুর্থ রুক্ক'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। বিপুর সংখ্যক বনী ইসরাইল মিসর থেকে বের হয়ে গৃহ ও সহায়-সহলহীন অবস্থায় বিস্তীর্ণ ধূ ধূ প্রাত়রে ঘুরে ফিরছিল। তারা একটি নির্দিষ্ট আবাস লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল কিন্তু যখন আল্লাহর ইঁধিতে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাদের জ্বালেম কেনানীদেরকে ফিলিস্তিন থেকে উৎখাত করে এ এলাকাটি জয় করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন তখন তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিল এবং সামনে এগিয়ে যেতে অঙ্গীকার করলো। অবশেষে আল্লাহ তাদের চান্দেশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে ইয়রান-পেরেশান-বিপুর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাবার জন্য ছেড়ে দিলেন। এভাবে তাদের এক পূর্ব শেষ হয়ে গেলো। নতুন বংশধররা মরুভূমির কোলে লালীত হয়ে বড় হলো। এবার আল্লাহ কেনানীদের ওপর তাদের বিজয় দান করলেন। মনে হচ্ছে, এই ব্যাপারটিকেই এখানে 'মরে যাওয়া ও পুনর্বার জীবন দান করা' বলা হয়েছে।

২৬৭. 'করযে হাসানা' এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'তালো ঝণ'। এর অর্থ হচ্ছে : এমন ঝণ, যা কেবলমাত্র সৎকর্ম অনুষ্ঠানের প্রেরণায় চালিত হয়ে নিষ্পার্থভাবে কাউকে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ তাকে নিজের জন্য ঝণ বলে গণ্য করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল আসলটি নয় বরং তার ওপর কয়েকগুণ বেশী দেয়ার ওয়াদা করেন। তবে এ জন্য শর্ত আরোপ করে বলেন যে, সেটি 'করযে হাসানা' অর্থাৎ এমন ঝণ হতে হবে যা দেয়ার পেছনে কোন হীন স্বার্থ বুদ্ধি থাকবে না বরং নিষ্ক

الْمَرْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مَاذَا<sup>١</sup>  
 قَالُوا النَّبِيُّ لَهُمْ أَبْعَثْتَ لَنَا مِلَائِكَاتْ قَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ  
 هَلْ عَسِيتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا تَقَاتِلُوا قَالُوا  
 وَمَا لَنَا أَلَا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا  
 وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا  
 ১৪৬ <sup>٢</sup> مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ رَبُّ الظَّالِمِينَ

আবার তোমরা কি এ ব্যাপারেও চিন্তা করেছো, যা মুসার পরে বনী ইসরাইলের সরদারদের সাথে ঘটেছিল? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল : আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দাও, যাতে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি। ২৬৮ নবী জিজেস করলো : তোমাদের লড়াই করার হকুম দেয়ার পর তোমরা লড়তে যাবে না, এমনটি হবে না তো? তারা বলতে লাগলো : এটা কেমন করে হতে পারে, আমরা আল্লাহর পথে লড়বো না, অথচ আমাদের বাড়ি-ঘর থেকে আমাদের বের করে দেয়া হয়েছে, আমাদের সত্তানদের আমাদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে? কিন্তু যখন তাদের লড়াই করার হকুম দেয়া হলো, তাদের স্বর্গসংখ্যক লোক ছাড়া বাদবাকি সবাই পৃষ্ঠপৰ্দশন করলো। আল্লাহ তাদের প্রত্যেকটি জালেমকে জানেন।

আল্লাহকে স্বৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ঝণ দিতে হবে এবং তা এমন কাজে ব্যয় করতে হবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন।

২৬৮. এটি হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগের ঘটনা। সে সময় আমালিকারা বনী ইসরাইলদের ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছিল। ইসরাইলীদের কাছ থেকে তারা ফিলিস্তিনের অধিকাংশ এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল সামুয়েল নবী তখন ছিলেন বনী ইসরাইলদের শাসক। কিন্তু তিনি বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই ইসরাইলী সরদাররা অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা বানিয়ে তার অধীনে যুদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করছিল। কিন্তু তখন বনী ইসরাইলদের মধ্যে অঙ্গতা এত বেশী বিস্তার লাভ করেছিল এবং তারা অমুসলিম জাতিদের নিয়ম, আচার-আচরণে এত বেশী

প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল যে, খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্যবোধ তাদের মন-মন্তিষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা একজন খলীফা নির্বাচনের নয় বরং বাদশাহ নিযুক্তির আবেদন করেছিল। এ প্রসংগে বাইবেলের প্রথম সামুয়েল গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিজ্ঞারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে :

“সামুয়েল সারা জীবন ইসরাইলীদের মধ্যে সুবিচার করতে থাকেন।.....তখন সব ইসরাইলী নেতা একত্র হয়ে রামাতে সামুয়েলের কাছে আসে। তারা তাঁকে বলতে থাকে : দেখো, তুমি বৃক্ষ ও দুর্বল হয়ে পড়েছো এবং তোমার ছেলে তোমার পথে চলছে না। এখন তুমি কাউকে আমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করে দাও, যে অন্য জাতিদের মতো আমাদের প্রতি সুবিচার করবে।.....একথা সামুয়েলের খারাপ লাগে। তিনি সদাপ্রভূর কাছে দোষা করেন। সদাপ্রভূ সামুয়েলকে বলেন : এই লোকেরা তোমাকে যা কিছু বলছে, তুমি তা মেনে নাও কেননা তারা তোমার নয়, আমার অবমাননা করেছে এই বলে যে, আমি তাদের বাদশাহ থাকবো না।.....সামুয়েল তাদেরকে—যারা তার কাছে বাদশাহ নিযুক্তির দাবী নিয়ে এসেছিল—সদাপ্রভূর সমস্ত কথা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন : যে বাদশাহ তোমাদের ওপর রাজত্ব করবে তার নীতি এই হবে যে, সে তোমাদের পুত্রদের নিয়ে যাবে, তার রথ ও বাহিনীতে চাকর নিযুক্ত করবে এবং তারা তার রথের আগে আগে দৌড়াতে থাকবে। সে তাদেরকে সহমুজনের ওপর সরদার ও পঞ্চাশজনের ওপর জমাদার নিযুক্ত করবে এবং কাউকে কাউকে হালের সাথে জুতে দেবে, কাউকে দিয়ে ফসল কাটাবে এবং নিজের জন্য যুদ্ধাস্ত্র ও রথের সরঞ্জাম তৈরি করাবে। আর তোমাদের কন্যাদেরকে পাচিকা বানাবে। তোমাদের ভালো ভালো শস্যক্ষেত, আংগুর ক্ষেত ও জিতবৃক্ষের বাগান নিয়ে নিজের সেবকদের দান করবে এবং তোমাদের শস্যক্ষেত ও আংগুর ক্ষেতের এক দশমাংশ নিয়ে নিজের সেনাদল ও সেবকদের দান করে দেবে। তোমাদের চাকর-বাকর, ক্রীতদাসী, সুশ্রী যুবকবৃন্দ ও গাধাগুলোকে নিজের কাজে লাগাবে এবং তোমাদের ছাগল-ভেড়াগুলোরও এক দশমাংশ নেবে। সুতরাং তোমরা তার দাসে পরিণত হবে। সেদিন তোমাদের এই বাদশাহ, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য নির্বাচিত করবে তার কারণে তোমরা ফরিয়াদ করবে কিন্তু সেদিন সদাপ্রভূ তোমাদের কোন জবাব দেবেন না। তবুও লোকেরা সামুয়েলের কথা শোনেনি। তারা বলতে থাকে, না, আমরা বাদশাহ চাই, যে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। তাহলে আমরাও অন্য জাতিদের মতো হবো। আমাদের বাদশাহ আমাদের মধ্যে সুবিচার করবে, আমাদের আগে আগে চলবে এবং আমাদের জন্য যুদ্ধ করবে।.....সদাপ্রভূ সামুয়েলকে বললেন : তুমি ওদের কথা মেনে নাও এবং ওদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দাও।” (৭ অধ্যায়, ১৫ শ্লোক থেকে ৮ অধ্যায় ২২ শ্লোক পর্যন্ত)।

“আবার সামুয়েল লোকদের বলতে থাকেন.....যখন তোমরা দেখলে আস্থন সন্তানদের বাদশাহ নাহাশ তোমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তখন তোমরা আমাকে বললে, আমাদের ওপর কোন বাদশাহ রাজত্ব করুক অথচ তোমাদের সদাপ্রভূ খোদা ছিলেন তোমাদের বাদশাহ। সুতরাং এখন সেই বাদশাহকে দেখো, যাকে তোমরা নির্বাচিত করেছো এবং যার জন্য তোমরা আবেদন করেছিলে। দেখো, সদাপ্রভূ তোমাদের ওপর বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। যদি তোমরা সদাপ্রভূকে ভয় করো, তাঁর উপাসনা করো, তাঁর

وَقَالَ لِمَرْ نَبِيِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالِوتَ مَلِكًا  
 قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْقُّ بِالْمُلْكِ  
 مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَهُ  
 عَلَيْكُمْ رُزْدَةٌ بَسْطَةٌ فِي الْعُلُّيِّ وَالْجَسِيرِ وَاللَّهُ يُؤْتِنِي مُلْكَهُ  
 مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

(١)

তাদের নবী তাদেরকে বললো : আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে<sup>২৬৯</sup> বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। একথা শুনে তারা বললো : “সে কেমন করে আমাদের ওপর বাদশাহ হবার অধিকার লাভ করলো? তার তুলনায় বাদশাহী লাভের অধিকার আমাদের অনেক বেশী। সে তো কোন বড় সম্পদশালী লোকও নয়।” নবী জবাব দিল : “আল্লাহ তোমাদের মোকাবিলায় তাকেই নবী মনোনীত করেছেন। এবং তাকে বৃদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উভয় ধরনের যোগ্যতা ব্যাপকহারে দান করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা দান করার ইখতিয়ার রাখেন। আল্লাহ অত্যন্ত ব্যাপকতার অধিকারী এবং সবকিছুই তাঁর জ্ঞান-সীমার মধ্যে রয়েছে।”

আদেশ মেনে চলো এবং সদাপ্রভূর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ না করো আর যদি তোমরা ও তোমাদের বাদশাহ, যে তোমাদের ওপর রাজত্ব করে, সবাই সদাপ্রভূ খোদার অনুগত হয়ে থাকো তাহলে তো ভালো। তবে যদি তোমরা সদাপ্রভূর কথা না মানো বরং সদাপ্রভূর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করো, তাহলে সদাপ্রভূর হাত তোমাদের বিরুদ্ধে উঠবে, যেমন তা উঠতো তোমাদের বাপ-দাদাদের বিরুদ্ধে।.....আর তোমরা জানতে পারবে এবং দেখতেও পারবে যে, তোমরা সদাপ্রভূর সমীপে নিজেদের জন্য বাদশাহ নিযুক্তির আবেদন জানিয়ে কর বড় অনিষ্ট করেছো।....এখন রইলো আমার ব্যাপার, আর খোদা না করুন, তোমাদের জন্য দোয়া না করে আমি সদাপ্রভূর কাছে পাপী না হয়ে যাই। বরং আমি সেই পথটি, যা ভালো ও সোজা, তোমাদের জানিয়ে দেবো।” (১২ অধ্যায়, ১২ থেকে ২৩ শ্লোক পর্যন্ত)।

বাইবেলে সামুয়েল গ্রন্থের এই বিস্তারিত বিবরণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বাদশাহী তথা ব্যক্তি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার এই দাবী আল্লাহ ও তাঁর নবী পছন্দ করেননি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কুরআন মজীদে এ প্রসংগে বনী ইসরাইলের সরদারদের এই দাবীর নিল্মা করা হয়নি কেন? এর জবাবে বলা যায়, এখানে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন তার সাথে এই দাবীটির ঠিক বেঠিক হবার বিষয়টির কোন সম্পর্ক নেই। এখানে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা যে, বনী ইসরাইলরা কতদূর কাপুরূপ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে স্বার্থান্তর কতখানি বিস্তার

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَّةً مُلِكَةَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتَ فِيهِ  
سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبِقِيمَةِ مَا تَرَكَ أَلْ مُوسَى وَآلُ هُرُونَ  
تَحْمِلُهُ الْمَلِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

এই সংগে তাদের নবী তাদের একথাও জানিয়ে দিল : আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বাদশাহ নিযুক্ত করার আলামত হচ্ছে এই যে, তার আমলে সেই সিকুলটি তোমরা ফিরিয়ে পাবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মানসিক প্রশান্তির সামগ্রী, যার মধ্যে রয়েছে মূসার পরিবারের ও হারুনের পরিবারের পরিত্যক্ত বরকতপূর্ণ জিনিসপত্র এবং যাকে এখন ফেরেশতারা বহন করে ফিরছে। ২৭০ যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে এটি তোমাদের জন্য অনেক বড়নিশানী।

শাত করেছিল এবং নৈতিক সংযমের কেমন অভাব পরিসংক্ষিত হয়েছিল যার ফলে অবশ্যে তাদের পতন সৃষ্টি হলো। মুসলমানরা যাতে এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে এই দুর্বলতাগুলোর প্রশংস্য না দেয় সে জন্যই এর উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬৯. বাইবেলে তাকে 'শৌল' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বনী ইয়ামীন গোত্রের একজন ত্রিশ বছরের যুবক। বনী ইসরাইলদের মধ্যে তার চেয়ে সুন্দর ও সুন্ধী পুরুষ ছিলীয়জন ছিল না। তিনি এমনি সুস্থাম ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিলেন যে, লোকদের মাথা বড়জোর তার কাঁধ পর্যন্ত পৌছতো। নিজের বাপের হারানো গাধা ঝুঁজতে বের হয়েছিলেন। পথে সামুয়েল নবীর অবস্থান স্থলের কাছে পৌছলে আল্লাহ তাঁর নবীকে ইঠগিত করে জানালেন, এই ব্যক্তিকে আমি বনী ইসরাইলদের বাদশাহ হিসেবে মনোনীত করেছি। কাজেই সামুয়েল নবী তাকে নিজের গৃহে ঢেকে আনলেন। তেলের কুপি নিয়ে তার মাথায় চেলে দিলেন এবং তাকে চুমো খেয়ে বললেন : "খোদা তোমাকে 'মসহ' করেছেন, যাতে তুমি তার উভরাধিকারের অগ্রন্থায়ক হতে পারো।" অতপর তিনি বনী ইসরাইলদের সাধারণ সভা ঢেকে তার বাদশাহ হবার কথা ঘোষণা করে দিলেন।" (১-সামুয়েল ৯ ও ১০ অধ্যায়)।

বনী ইসরাইলদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশক্রমে 'মসহ' করে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন যিতীয় ব্যক্তি। এর আগে হয়রত হারুনকে পূরোহিত শ্রেষ্ঠ (Chief priest) হিসেবে 'মসহ' করা হয়েছিল। এরপর মসহকৃত তৃতীয় ব্যক্তি হলেন হয়রত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং চতুর্থ হয়রত ইসা আলাইহিস সালাম। কিন্তু তালুতকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছিল বলে কুরআনে বা হাদীসে কোন সূস্পষ্ট বর্ণনা নেই। নিছক বাদশাহী করার জন্য মনোনীত করা একথা মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, যে, তিনি নবীও ছিলেন।

فَلِمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيهِ كُمْ بِذَهَرٍ  
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا  
 مَنِ اغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَلِهِ فَشَرِبَوْا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلِمَا  
 جَاءَوْزَةَ هُوَ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ  
 بِجَاهُولَتِ وَجْنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا  
 عَلَى اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ⑯

৩৩ রংকু

তারপর তালুত যখন সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললো, সে বললো : “আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নদীতে তোমাদের পরীক্ষা হবে। যে তার পানি পান করবে সে আমার সহযোগী নয়। একমাত্র সে-ই আমার সহযোগী যে তার পানি থেকে নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। তবে এক আধ আঁজলা কেউ পান করতে চাইলে করতে পারে। কিন্তু বল্ল সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সবাই সেই নদীর পানি আকষ্ট পান করলো। ২৭১

অতপর তালুত ও তার সাথী মুসলমানরা যখন নদী পেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো তখন তারা তালুতকে বলে দিল, আজ জালুত ও তার সেনাদলের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। ২৭২ কিন্তু যারা একথা মনে করছিল যে, তাদের একদিন আল্লাহর সাথে মোলাকাত করতে হবে, তারা বললো : “অনেক বারই দেখা গেছে, বল্ল সংখ্যক লোকের একটি দল আল্লাহর হৃকুমে একটি বিরাট দলের উপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ সবরকারীদের সাথি।”

২৭০. এ প্রসংগে বাইবেলের বর্ণনা কুরআন থেকে বেশ কিছুটা বিভিন্ন। তবুও এ থেকে আসল ঘটনার যথেষ্ট বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায়, এ সিন্দুকটির জন্য বনী ইসরাইলদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিতায়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি হচ্ছে ‘অংগীকার সিন্দুক।’ এক যুদ্ধে ফিলিস্তিনী মুশরিকরা বনী ইসরাইলদের থেকে এটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মুশরিকদের যে শহর ও যে জনপদে এটি রাখা হতো সেখানেই

وَلَمَّا بَرَزُوا بِجَالُوتَ وَجْنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا  
وَتَبِعْ أَقْلَى أَمَنًا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ﴿٧﴾ فَهَمَزْ مُوهَرْ  
بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَتَلَ دَاؤِدَ جَالُوتَ وَأَتَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ  
وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  
لَفَسَلَتِ الْأَرْضُ وَلِكَنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿٨﴾ تِلْكَ  
آيَتُ اللَّهِ نَمَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٩﴾

আর যখন তারা জালুত ও তার সেনাদলের মোকাবিলায় বের হলো, তারা দোয়া করলো : “হে আমাদের রব! আমাদের সবর দান করো, আমাদের অবিচলিত রাখ এবং এই কাফের দলের ওপর আমাদের বিজয় দান করো।” অবশেষে আল্লাহর হৃকুমে তারা কাফেরদের পরাজিত করলো। আর দাউদ<sup>১৩</sup> জালুতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ তাকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন আর এই সাথে যা যা তিনি চাইলেন তাকে শিখিয়ে দিলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন না করতে থাকতেন, তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাগনা বিপর্যস্ত হতো।<sup>১৪</sup> কিন্তু দুনিয়াবাসীদের ওপর আল্লাহর অপার করণা (যে, তিনি এভাবে বিপর্যয় ঘোধের ব্যবস্থা করতেন)।

এগুলো আল্লাহর আয়াত। আমি ঠিকমতো এগুলো তোমাকে শুনিয়ে যাচ্ছি। আর তুমি নিচিতভাবে প্রেরিত পুরুষদের (রসূলদের) অতরঙ্গুক।

মহামারীর প্রাদুর্ভাব হতে থাকতো ব্যাপকভাবে। অবশেষে তারা সিন্দুকটি একটি গরম্ব গাড়ির ওপর রেখে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। সম্ভবত এ বিষয়টিকে কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে যে, সেটি তখন ফেরেশতাদের ঝঞ্জণাধীনে ছিল। কারণ সেই গাড়িটিতে কোন চালক না বসিয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আল্লাহর হৃকুমে তাকে হাঁকিয়ে বনী ইসরাইলদের দিকে নিয়ে আসা ছিল ফেরেশতাদের কাজ। আর এই সিন্দুকের মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মানসিক প্রশাস্তির সামগ্রী—একথার অর্থ বাইবেলের বর্ণনা থেকে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, বনী ইসরাইল এই সিন্দুকটিকে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং নিষ্ঠেদের বিজয় ও সাফল্যের প্রতীক মনে করতো। এটি তাদের হাতছাড়া হবার পর সমগ্র জাতির মনোবল ভেঙে পড়ে। প্রত্যেক ইসরাইলী মনে করতে থাকে, আমাদের ওপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে গেছে এবং আমাদের

দুর্ভাগ্যের দিন শুরু হয়ে গেছে। কাজেই সিন্দুকটি ফিরে আসায় সমগ্র জাতির মনোবল ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। তাদের ভাঙা মনোবল আবার জোড়া লেগে যায়। এভাবে এটি তাদের মানসিক প্রশান্তির কারণে পরিণত হয়।

“মূসা ও হারশনের পরিবারের পরিত্যক্ত বরকতপূর্ণ জিনিসপত্র” এই সিন্দুকে রাখিত ছিল। এর অর্থ হচ্ছে, ‘তৃ-ই-সিনাই’-এ (সিনাই পাহাড়) মহান আল্লাহ হ্যরত মূসাকে পাথরের যে তথ্তিগুলো দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও হ্যরত মূসা নিজে লিখিয়ে তাওরাতের যে কপিটি বনী সার্ভীকে দিয়েছিলেন সেই মূল পাঞ্চলিপিটিও এর মধ্যে ছিল। একটি বোতলে কিছুটা ‘মানা’ও এর মধ্যে রাখিত ছিল, যাতে পরবর্তী বৎসররা আল্লাহর সেই মহা অনুগ্রহের কথা অবরণ করতে পারে, যা মহান আল্লাহ উয়ার হরন্ত বুকে তাদের বাপ-দাদাদের ওপর বর্ণণ করেছিলেন। আর ‘সম্ভবত অসাধারণ মু’জিয়া তথা মহা অলৌকিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হ্যরত মূসার সেই বিখ্যাত ‘আসা’ও এর মধ্যে ছিল।

২৭১. সম্ভবত এটি জর্দান নদী অথবা অন্য কোন নদী, উপনদী বা শাখা নদী হতে পারে। তালুত বনী ইসরাইলের সেনাবাহিনী নিয়ে এই নদীর তীরে অবস্থান করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন, এই জাতির নৈতিক সংযমের মাত্রা অনেক কম, তাই তিনি কর্ম্ম ও অকর্ম্ম লোকদের আলাদা করার জন্য এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। বলা বাহ্য যারা মাত্র সামান্য ক্ষণের জন্য নিজেদের পিপাসা সংযত করতে পারে না, তাদের থেকে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, তারা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে এমন একদল শক্তির মোকাবিলা করবে, যাদের কাছে তারা ইতিপূর্বে হেরে গিয়েছিল?

২৭২. সম্ভবত এ বাক্যটি তারাই উচ্চারণ করেছিল, যারা নদীর তীরে ইতিপূর্বেই নিজেদের ধৈর্যবীনতার প্রকাশ ঘটিয়েছিল।

২৭৩. দাউদ আলাইহিস সালাম এ সময় ছিলেন একজন কম বয়েসী মুবক। ঘটনাক্রমে তালুতের সেনাবাহিনীতে তিনি এমন এক সময় পৌছেছিলেন যখন ফিলিস্তিনী সেনাদলের জ্বরদণ্ড পাহলোয়ান জালুত (জুলিয়েট) বনী ইসরাইলী সেনাদলকে প্রত্যক্ষ মোকাবিলায় আসার জন্য আহবান জানাচ্ছিল এবং ইসরাইলীদের মধ্য থেকে একজনও তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল না। এ অবস্থা দেখে হ্যরত দাউদ (আ) নির্ভয়ে যয়দানে ঝোপিয়ে পড়লেন এবং জালুতকে হত্যা করলেন। এ ঘটনায় তিনি হয়ে উঠলেন ইসরাইলীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তালুত নিজের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। অবশেষে তিনিই হলেন ইসরাইলীদের শাসক। (বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন ১ম সামুয়েল ১৭ ও ১৮ অধ্যায়।)

২৭৪. পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা অঙ্গুণ রাখার জন্য মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ও দলকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দুনিয়ায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখনই কোন দল সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে তখনই তিনি অন্য একটি দলের সাহায্যে তার শক্তির দর্পণ করে দেন। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যদি চিরস্তনভাবে একটি জাতি ও একটি দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে রাখা হতো এবং তার ক্ষমতার দাপট ও জুলুম-নির্ধারণ হতো সীমাবদ্ধ ও অশেষ, তাহলে নিসদেহে আল্লাহর এই রাজ্যে মহা বিপর্যয় নেমে আসতো।

تَلَكَ الرَّسُولُ فَضَلَّنَا بِعَصْمِهِ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مِنْ كَلْمَرِ اللَّهِ

وَرَفِعْ بِعَصْمِهِ دَرْجَيْهِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرِيمَ الْبَيْتَنِ وَأَيْنَ نَهِ  
بِرُوحِ الْقُلُّسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ  
مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيْتَنِ وَلَكِنْ أَخْتَلَفُوا فِيهِمْ مِنْ أَمْنٍ وَمِنْهُمْ  
مِنْ كُفَّارٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا تَوْلِكَنْ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَرِيدُ

এই রসূলদের (যারা আমার পক্ষ থেকে মানবতার হিদায়াতের জন্য নিযুক্ত) একজনকে আর একজনের ওপর আমি অধিক মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারোর সাথে আগ্নাহ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি অন্য দিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, অবশেষে ঈসা ইবনে মারয়ামকে উজ্জ্বল নিশানীসমূহ দান করেছেন এবং পবিত্র জুহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছেন। যদি আগ্নাহ চাইতেন তাহলে এই রসূলদের পর যারা উজ্জ্বল নিশানীসমূহ দেখেছিল তারা কখনো পরম্পরের মধ্যে যুক্ত লিপ্ত হতো না। কিন্তু (লোকদেরকে বলপূর্বক মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আগ্নাহের ইচ্ছা ছিল না, তাই) তারা পরম্পর মতবিরোধ করলো, তারপর তাদের মধ্য থেকে কেউ ঈমান আনলো আর কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করলো। হাঁ, আগ্নাহ চাইলে তারা কখনো যুক্ত লিপ্ত হতো না, কিন্তু আগ্নাহ যা চান, তাই করেন। ২৭৫

২৭৫. অর্থাৎ রসূলদের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করার পর মানুষের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং মতবিরোধ থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে, এর কারণ এ ছিল না যে, নাউয়বিগ্নাহ আগ্নাহ অক্ষম ছিলেন এবং এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি চাইলে নবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। কেউ কুফরী ও বিদ্রোহের পথে চলতে পারতো না। আগ্নাহের দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করার ক্ষমতা কারো থাকতো না। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ও সংকল্প ছিনিয়ে নিয়ে তাকে একটি বিশেষ কর্মনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করা তাঁর ইচ্ছাই ছিল না। তিনি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষকে এ পৃথিবীতে পয়দা করেছেন। তাই তাকে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও বাছাই করার স্বাধীনতা দান করেছেন। নবীদেরকে তিনি মানুষের উপর দারোগা বানিয়ে পাঠাননি। কাজেই জোর জবরদস্তি করে তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা তাঁরা করেননি। বরং নবীদেরকে তিনি পাঠান যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান জানাবার জন্য। কাজেই যতো মতবিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে তার

يَا يَهُمَا الَّذِينَ أَمْنَوْا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا  
لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكُفَّارُ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑯  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُلْ سِنَةً وَلَا نَوْمًا لَهُ مَا فِي  
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يُشَفَّعُ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ  
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ  
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ  
جِفْنُهُمْ وَهُوَ عَلَىٰ الْعَظِيمِ ⑯

৩৪ রুক্মি

হে ইমানদারগণ! আমি তোমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, ২৭৬ সেই দিনটি আসার আগে, যেদিন কেনাবেচা চলবে না, বঙ্গুত্ত কাজে লাগবে না এবং কারো কোন সুপারিশও কাজে আসবে না। আর জানেম আসলে সেই ব্যক্তি যে কুফরী নীতি অবলম্বন করে, ২৭৭

আল্লাহ এমন এক চিরঝীব ও চিরস্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, ২৭৮ তিনি শুমান না এবং তন্দুও তাঁকে স্পর্শ করবে না, ২৭৯ পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর, ২৮০ কে আছে তাঁর অনুমতি চাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? ২৮১ যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুক ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, ২৮২ তাঁর কর্তৃত ২৮৩ আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্রান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা, ২৮৪

পেছনে এই একটি মাত্র কাজ করেছে যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন আর তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোর কারণ এই ছিল না যে, আল্লাহ তাদেরকে সত্তা ও ন্যায়ের পথে চালাতে চাইছিলেন কিন্তু নাউযুবিল্লাহ এ ব্যাপারে তিনি সফলকাম হতে পারেননি।

২৭৬. অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। বলা হচ্ছে, যারা ইমানের পথ অবলম্বন করেছে, যে উদ্দেশ্যে তারা এই পথে পাড়ি দিয়েছে সেই উদ্দেশ্য সম্পাদনের লক্ষ্যে তাদের আর্থিক ত্যাগ শৈকার করতে হবে।

২৭৭. এখানে কৃফীরী নীতি অবলম্বনকারী বলতে এমন সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর হক্ক মনে চলতে অধীকার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তুলনায় নিজের ধন-সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে অথবা যারা সেই দিনটির ওপর আস্থা রাখে না যে দিনটির আগমনের ত্যাদেখানো হয়েছে। যারা এই ডিত্তিহীন ধারণা পোষণ করে যে, আখ্যেরাতে তারা কোন না কোনভাবে নাজাত ও সাফল্য কিনে নিতে সৃষ্টি হবে এবং বকুত্ত ও সুপরিবেশের সাহায্যে নিজেদের কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম হবে, এখানে তাদেরকেও বুঝানো হতে পারে।

২৭৮. অর্থাৎ মূর্খতা নিজেদের কম্পনা ও ভাববাদিতার জগতে বসে যত অস্থির উপাস্য, ইলাহ ও মাবুদ তৈরি করুক না কেন আসলে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শাসন কর্তৃত নিরঞ্জুশভাবে একমাত্র সেই অবিনশ্বর সন্তান অংশীভূত, যাঁর জীবন কারো দান নয় বরং নিজৰ জীবনী শৃঙ্খিতে যিনি স্বয়ং জীবিত এবং যাঁর শক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এই বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা। নিজের এই বিশ্বাল সীমাহীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন কর্তৃত ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একাই। তাঁর গুণাবণীতে দ্বিতীয় কোন সন্তান অংশীদারীত নেই। তাঁর ক্ষমতা, কর্তৃত ও অধিকারেও নেই দ্বিতীয় কোন শরীক। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বা তার সাথে শরীক করে পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও আর কাউকে মাবুদ ইলাহ ও প্রভু বানানো হলে তা একটি নিরেট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হয় না। এভাবে আসলে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২৭৯. মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তাকে যারা নিজেদের দুর্বল অস্তিত্বের সদৃশ মনে করে এবং যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে, এখানে তাদের চিন্তা ও ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। যেমন বাইবেশের বিবৃতি মতে, আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী ও আকাশ তৈরি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্বাম নেন।

২৮০. অর্থাৎ তিনি পৃথিবী ও আকাশের এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তাঁর মালিকানা, কর্তৃত ও শাসন পরিচালনায় কারো এক বিন্দু পরিমাণও অংশ নেই। তাঁর পরে এই বিশ্ব-জাহানের অন্য যে কোন সন্তান কথাই চিন্তা করা হবে সে অবশ্যই হবে এই বিশ্ব-জগতের একটি সৃষ্টি। আর বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি অবশ্য হবে আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁর দাস। তাঁর অংশীদার ও সমকক্ষ হবার কোন প্রশ্নই এখানে উঠে না।

২৮১. এখানে এক শ্রেণীর মুশরিকদের চিন্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বুঝগ্র ব্যক্তিবর্গ, ফেরেশতা বা অন্যান্য সন্তা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর ওখানে তাদের বিরাট প্রতিপত্তি। তারা যে কথার ওপর অটল থাকে, তা তারা আদায় করেই ছাড়ে। আর আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে কোন কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম। এখানে তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহর ওখানে প্রতিপত্তির তো কোন প্রশ্নই উঠে না, এমনকি

কোন শ্রেষ্ঠতম পয়গবর এবং কোন নিকটতম ফেরেশতাও এই পৃথিবী ও আকাশের মালিকের দরবারে বিনা অনুমতিতে একটি শদও উচারণ করার সাহস রাখে না।

২৮২. এই সত্যটি প্রকাশের পর শিরকের ভিত্তির উপর আর একটি আঘাত পড়লো। উপরের বাকাগুলোয় আগ্রাহীর অসীম কর্তৃত্ব ও তার সাথে সম্পর্কিত ক্ষমতাবলী সম্পর্কে একটা ধারণা পেশ করে বলা হয়েছিল, তাঁর কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে কেউ শরীক নেই এবং কেউ নিজের সুপারিশের জোরে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর প্রতাব বিত্তার করার ক্ষমতাও রাখে না। অতপর এখানে অন্যভাবে বলা হচ্ছে, অন্য কেউ তাঁর কাজে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন তার কাছে এই বিশ্ব-জাহানের ব্যবহাপনা এবং এর অঙ্গনিহিত কার্যকারণ ও ফলাফল বুঝার মতো কোন জ্ঞানই নেই? মানুষ, জিন, ফেরেশতা বা অন্য কোন সৃষ্টিই হোক না কেন সবার জ্ঞান অপূর্ণ ও সীমিত। বিশ্ব-জাহানের সমগ্র সত্য ও রহস্য কারো দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই, তারপর কোন একটি ক্ষুদ্রতর অংশেও যদি কোন মানুষের সাধীন হস্তক্ষেপ অথবা অকড় সুপারিশ কার্যকর হয় তাহলে তো বিশ্ব-জগতের সমগ্র ব্যবহাপনাই উন্ট-পালট হয়ে যবে। বিশ্ব-জগতের ব্যবহাপনা তো দূরের কথা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বুঝারও ক্ষমতা রাখে না। বিশ্ব-জাহানের প্রত্যু ও পরিচালক মহান আগ্রাহীই এই ভালোমন্দের পূরোপুরি জ্ঞান রাখেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের মূল উৎস মহান আগ্রাহীর হিদায়াত ও পথনির্দেশনার উপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া মানুষের জন্য দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

২৮৩. কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ হচ্ছে 'কুরসী'। সাধারণত এ শব্দটি কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তি অর্থে ঝুপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় এরি সমজাতীয় শব্দ হচ্ছে 'গদি'। গদির খড়াই বললে ক্ষমতা কর্তৃত্বের খড়াই বুঝায়।

২৮৪. এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী নামে খ্যাত। এখানে মহান আগ্রাহীর এমন পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি পেশ করা হয়েছে, যার নজীর আর কোথাও নেই। তাই হাদীসে একে কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে কোন প্রসংগে বিশ্ব-জাহানের মালিক মহান আগ্রাহীর সন্তা ও গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে? এ বিষয়টি বুঝতে হলে ৩২ রূম্ভ' থেকে যে আলোচনাটি চলছে তার উপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে হবে। প্রথমে মুসলমানদের ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করে দিহাদে উদ্বৃক্ষ করা হয়; বনী ইসরাইলরা যেসব দুর্বলতার শিকার হয়েছিল তা থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের জোর ত্যাগিদ-দেয়া হয়, তারপর তাদেরকে এ সত্যটি বুঝানো হয় যে, বিজয় ও সাফল্য সংখ্যা ও যুদ্ধাস্ত্রের আধিক্যের উপর নির্ভর করে না বরং ইমান, সবর, সংযম, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সংকলনের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। অতপর যুদ্ধের সাথে আগ্রাহীর যে কর্মনীতি সম্পর্কিত রয়েছে সেদিকে ইধৃগত করা হয়। অর্ধাৎ দুনিয়ার ব্যবহাপনা অঙ্গুষ্ঠ রাখার জন্য তিনি সবসময় মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন করে থাকেন। নয়তো যদি শুধুমাত্র একটি দল স্থায়ীভাবে বিজয় লাভ করে কর্তৃত্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতো তাহলে দুনিয়ায় অন্যদের জীবন ধারা কঠিন হয়ে পড়তো।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قُلْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَن يَكْفُرُ  
بِالظَّاغُوتِ وَبُؤْتَ مِنْ بِإِلَهٍ فَقُلْ أَسْتَمْسِكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى  
لَا أُنْفِسَأُ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهِ<sup>۱۶</sup> أَللَّهُ وَلِلَّهِ يُنْبَغِي  
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ لَيْهُمْ  
الظَّاغُوتُ يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمِ أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُنَّ فِيهَا خَلِونَ<sup>۱۷</sup>

দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। ২৮৫ ভাস্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে ২৮৬ অঙ্গীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিল হয় না। আর আল্লাহ যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে সবকিছু শোনেন ও জানেন। যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অঙ্গীকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। ২৮৭ আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত। ২৮৮ সে তাদেরকে আলোক থেকে অঙ্গীকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী। সেখানে থাকবে এরা চিরকালের জন্য।

আবার এ প্রসংগে অঙ্গ লোকদের মনে আরো যে একটি প্রশ্ন প্রায়ই জাগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লাহ যদি তাঁর নবীদেরকে মতবিরোধ খতম করার ও ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য পাঠিয়ে থাকেন এবং তাদের আসমন্তের পরও মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদ খতম না হয়ে থাকে তাহলে কি আল্লাহ এতই দুর্বল যে, এই গলদণ্ডলো দূর করতে চাইলেও তিনি দূর করতে পারেননি? এর জবাবে বলা হয়েছে, বলপূর্বক মতবিরোধ বন্ধ করা এবং মানব জাতিকে জোর করে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না। যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকতো না। আবার যে মূল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছিল একটি বাকের মধ্যে সেদিকেও ইঠগিত করা হয়েছে। এর পর এখন বলা হচ্ছে, মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, আদর্শ-মতবিদ্যা ও ধর্ম যতই বিভিন্ন হোক না কেন আসল ও প্রকৃত সত্য যার উপর আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত, এই আয়াতেই বিবৃত হয়েছে। মানুষ এ সম্পর্কে তুল ধারণা করলেই বা কি, এ জন্য মূল

০  
সত্যের তো কোন চেহারা বদল হবে না। কিন্তু লোকদেরকে এটা মানতে বাধ্য করানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।..... যে ব্যক্তি এটা মেনে নেবে সে নিজেই গাভবান হবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৮৫. এখানে দীন বলতে ওপরের আয়তে বর্ণিত আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা ও সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। আয়তের অর্থ হচ্ছে, ‘ইসলাম’ এর এই আকীদাগত এবং নৈতিক ও কর্মগত ব্যবস্থা কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। যেমন কাউকে ধরে তার মাথায় জোর করে একটা বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, এটা তেমন নয়।

২৮৬. অভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ‘তাগুত’ বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমানা নংঘন করেছে। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক বাল্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বাল্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। আল্লাহর মোকাবিলায় বাল্দার প্রভৃতির দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় বাল্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ফাসেকী। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফরী। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভূর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর রাজ্যে এবং তাঁর প্রজাদের মধ্যে নিজের হকুম চালাতে থাকে। এই শেষ পর্যায়ে যে বাল্দা পৌছে যায় তাকেই বলা হয় “তাগুত”। কোন ব্যক্তি এই তাগুতকে অবীকার না করা পর্যন্ত কোন দিন সঠিক অর্থে আল্লাহর মুমিন বাল্দা হতে পারে না।

২৮৭. অঙ্ককার মানে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অঙ্ককার। যে অঙ্ককারে পথ হারিয়ে মানুষ নিজের কল্যাণ ও সাফল্যের পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টাকে ভুল পথে পরিচালিত করে, সেই অঙ্ককারের কথা এখানে বলা হয়েছে।

২৮৮. “তাগুত” শব্দটি এখানে বহুচন (তাওয়াগীত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ একটি তাগুতের শৃংখলে আবদ্ধ হয় না বরং বহু তাগুত তাঁর ওপর জৈকে বসে। শয়তান একটি তাগুত। শয়তান তাঁর সামনে প্রতিদিন নতুন নতুন আকাশ কুসুম রচনা করে তাকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রস্তুত করে রাখে। দ্বিতীয় তাগুত হচ্ছে মানুষের নিজের নফস। এই নফস তাকে আবেগ ও লালসার দাস বানিয়ে জীবনের আকাবীকা পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এ ছাড়া বাইরের জগতে অসংখ্য তাগুত ছড়িয়ে রয়েছে। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, বন্ধু, গোত্র, বক্র-বাক্রব, পরিচিতজন, সমাজ, জাতি, নেতা, রাষ্ট্র, দেশ, শাসক ইত্যাকার সবকিছুই মানুষের জন্য মূর্তিমান তাগুত। এদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের স্বার্থের দাস হিসেবে ব্যবহার করে। মানুষ তাঁর এই অসংখ্য প্রভৃতি দাসত্ব করতে করতে এবং এদের মধ্য থেকে কাকে সন্তুষ্ট করবে আর কার অস্বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবে এই ফিকিরের চক্রে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

الَّهُ تَرَأَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ  
 إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يَحْسُنُ وَلَمْ يُمْسِتْ «قَالَ أَنَا أَحْسِنُ  
 وَأَمْسِتْ» قَالَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّهِيدِ مِنَ الْمَشْرِقِ  
 فَأَتَ بِمَا بِهِ الْمَغْرِبُ فَبِمِنْهُ كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهِيءُ لِلنَّاسِ  
 الظُّلْمَيْمَينَ

৩৫ রংকু'

তুমি ৮৯ সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করোনি, যে ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল । ৯০ তর্ক করেছিল এই কথা নিয়ে যে, ইবরাহীমের রব কে? এবং তর্ক এ জন্য করেছিল যে, আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রকর্মতা দান করেছিলেন । ৯১ যখন ইবরাহীম বললো : যার হাতে জীবন ও মৃত্যু তিনিই আমার রব। জবাবে সে বললো : জীবন ও মৃত্যু আমার হাতে। ইবরাহীম বললো : তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে, আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠান, দেবি তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। একথা শুনে সেই সত্য অঙ্গীকারকারী হতবুক্তি হয়ে গেলো । ৯২ কিন্তু আল্লাহ জালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

১৮৯. উপরে দাবী করা হয়েছিল, মুমিনের সহায় ও সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ তিনি মানুষকে অঙ্গকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে যান আর কাফেরের সাহায্যকারী হচ্ছে তাণ্ডত, সে তাকে আলোকের বুক থেকে টেনে অঙ্গকারের মধ্যে নিয়ে যায়। এখানে এ বিষয়টির উপর বিজ্ঞারিত আলোকপাত করার জন্য দৃষ্টিত্ব ব্রহ্ম তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিত্বটি এমন এক ব্যক্তির যার সামনে সুস্পষ্ট দর্শীল প্রমাণ সহকারে সত্যকে পেশ করা হয় এবং সে তার সামনে নিরন্তর হয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু সে আগে থেকেই নিজের লাগাম তাণ্ডতের হাতে সঁপে দিয়েছিল তাই সত্যের উলংগ প্রকাশের পরও সে আলোর রাজ্যে পা দিতে পারেনি। অঙ্গকারের অঈশ সমুদ্রে আগের মতোই সে হাবুক্তু থেতে থাকে। পরবর্তী দৃষ্টিত্ব দু'টি এমন দুই ব্যক্তির যারা আল্লাহর সাহায্যের দিকে হাত বাড়ান। ফলে আল্লাহ তাদেরকে অঙ্গকার থেকে আলোর রাজ্যে এমনভাবে টেনে আনেন যে, অদৃশ্য গোপন সত্যের সাথে তাদের চাকুর সাক্ষাত ঘটেও যায়।

১৯০. সেই ব্যক্তিটি হচ্ছে নমরুদ। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্বদেশভূমি ইরাকের বাদশাহ ছিল এই নমরুদ। এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে বাইবেলে তার প্রতি কোন ইংগিত নেই। তবে তালমুদে এই সমগ্র ঘটনাটিই বিবৃত হয়েছে। কুরআনের

সাথে তার ব্যাপক মিলও রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : হযরত ইবরাহীমের (আ) পিতা নমরূদের দরবারে প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর (Chief officer of the state) পদে অধিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন প্রকাশে শিরকের বিরোধিতা ও তাওহীদের প্রচার শুরু করেন এবং দেব-মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাগুলো ভেঙে দেন তখন তাঁর পিতা নিজেই বাদশাহৰ দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা পেশ করে তারপর বাদশাহৰ সাথে তাঁর যে বিতর্কালাপ হয় তাই এখানে উল্লেখিত হয়েছে।

২৯১. অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে এ বিতর্ক চলছিল সেটি ছিল এই যে ইবরাহীম (আ) কাকে নিজের রব বলে মানেন? আর এ বিতর্কটি সৃষ্টি হবার কারণ ছিল এই যে, বিতর্ককারী ব্যক্তি অর্থাৎ নমরূদকে আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন। এই দু'টি বাকোর মধ্যে বিতর্কের ধরনের প্রতি যে ইংগিত করা হয়েছে তা বুঝবার জন্য নিম্নলিখিত বাণ্ডব বিষয়গুলো সামনে রাখা প্রয়োজন।

এক : প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুশরিক সমাজগুলোর এই সম্মিলিত বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে যে, তারা আল্লাহকে সকল খোদার প্রধান খোদা, প্রধান উপাস্য ও পরমেশ্বর হিসেবে মেনে নেয় কিন্তু একমাত্র তাঁকেই আরাধ্য, উপাস্য, মাবুদ ও খোদা হিসেবে মানতে প্রস্তুত হয় না।

দুই : আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে মুশরিকরা চিরকাল দু'ভাগে বিভক্ত করে এসেছে। একটি হচ্ছে, অতি প্রাকৃতিক (Supernatural) খোদায়ী ক্ষমতা। কার্যকারণ পরম্পরার উপর এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং মুশরিকরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার ও সংকট উভীগ হওয়ার জন্য এর দোহাই দেয়। এই খোদায়ীর ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে অভীতের পুন্যবান লোকদের আত্মা, ফেরেশতা (দেবতা), জিন, নক্ষত্র এবং আরো অসংখ্য সন্তাকে শরীক করে। তাদের কাছে প্রার্থনা করে। পূজা ও উপাসনার অনুষ্ঠানাদি তাদের সামনে সম্পাদন করে। তাদের আন্তর্নায় তেট ও নজরানা দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তামাদুনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের খোদায়ী (অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্ব) ক্ষমতা। জীবন বিধান নির্ধারণ করার ও নির্দেশের আনুগত্য লাভ করার অধিকার তার আয়ত্তাবীন থাকে। পার্থিব বিষয়াবসীর উপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ণ ক্ষমতা তার থাকে। দুনিয়ার সকল মুশরিক সম্প্রদায় প্রায় প্রতি যুগে এই দ্বিতীয় প্রকারের খোদায়ী কর্তৃত্বকে আল্লাহর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অধিবা তার সাথে রাজপরিবার, ধর্মীয় পুরোহিত ও সমাজের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের মনীষীদের মধ্যে বস্তন করে দিয়েছে। বেশীর ভাগ রাজপরিবার এই দ্বিতীয় অর্থে খোদায়ীর দাবীদার হয়েছে। তাদের এই দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য আবার তারা সাধারণভাবে প্রথম অর্থের খোদাদের সন্তান হবার দাবী করেছে। এ ব্যাপারে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো তাদের ষড়যন্ত্রে অংশীদার হয়েছে।

তিনি : নমরূদের খোদায়ী দাবীও এই দ্বিতীয় ধরনের ছিল। সে আল্লাহর অভিত্ত অস্থীকার করতো না। নিজেকে পৃথিবী ও আকাশের সুষ্ঠা ও পরিচালক বলে সে দাবী করতো না। সে একথা বলতো না যে, বিশ্ব-জগতের সমস্ত কার্যকারণ পরম্পরার উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বরং তার দাবী ছিল, আমি এই ইরাক দেশ এবং এর অধিবাসীদের একচ্ছত্র অধিপতি। আমার মুখের কথাই এ দেশের আইন। আমার ওপর আর কারো কর্তৃত্ব নেই। কারো সামনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। ইরাকের যে কোন

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرِيَةً وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا ۝ قَالَ أَنِي  
يَحْسِنُ هُنَّا هُنَّا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ۝ فَامَّا تَهْدِي اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْدَهُ  
قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۝ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۝ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ  
مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسْنَدْ ۝ وَانظُرْ إِلَىٰ جِمَارِكَ  
وَلْنَجْعَلَكَ أَيَّةً لِلنَّاسِ ۝ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرَ هَاشِمَ نَكْسُوهَا  
لَهُمَا ۝ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۝ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

অথবা দৃষ্টান্তবরুপ সেই ব্যক্তিকে দেখো যে এমন একটি লোকালয় অতিক্রম করেছিল, যার গৃহের ছাদগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল। ২৯৩ সে বললো : এই ধৰ্মস্পাঞ্চ জনবসতি, একে আল্লাহ আবার কিভাবে জীবিত করবেন? ২৯৪ একধাৰ্য আল্লাহ তাৰ প্ৰাণ হৱণ কৱলেন এবং সে একশো বছৰ পৰ্যন্ত মৃত পড়ে রাইলো। তাৰপৰ আল্লাহ পুনৰ্বাৰ তাকে জীবন দান কৱলেন, এবং তাকে জিজেস কৱলেন : বলো, তুমি কত বছৰ পড়েছিলে? জবাব দিল : এই, এক দিন বা কয়েক ঘণ্টা পড়েছিলাম। আল্লাহ বললেন : “বৰং একশোটি বছৰ এই অবস্থায় তোমার ওপৰ দিয়ে চলে গেছে। এবাৰ নিজেৰ খাবাৰ ও পানীয়ৰ ওপৰ একবাৰ নজৰ বুলাও, দেখো তাৰ মধ্যে কোন সামান্য পৱিত্ৰনও আসেনি। অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে দেখো (তাৰ পাঁজৰগুলোও পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে)। আৱ এটা আমি এ জন্য করেছি যে, মানুষেৰ জন্য তোমাকে আমি একটি নিৰ্দশন হিসেবে দাঢ়ি কৱাতে চাই। ২৯৫ তাৰপৰ দেখো, এই অশ্বপাঁজৰটি, কিভাবে একে উঠিয়ে এৱ গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দিই।” এভাবে সত্য যখন তাৰ সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন সে বলে উঠলো : “আমি জানি, আল্লাহ সবকিছুৰ ওপৰ শক্তিশালী।”

ব্যক্তি এসব দিক দিয়ে আমাকে রব বলে মেনে নেবে না অথবা আমাকে বাদ দিয়ে আৱ কাউকে রব বলে মেনে নেবে, সে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক।

চার : ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বললেন, আমি একমাত্ৰ রহুল আলামীনকে খোদা, মাবুদ ও রব বলে মানি, তাৰ ছাড়া আৱ সবাৰ খোদায়ী, প্ৰভৃতি ও কৰ্তৃত অৰ্থীকাৱ কৱি, তখন কেবল এতক্ষেত্ৰে প্ৰশ্ন সেখানে দেখা দেয়নি যে, জাতীয় ধৰ্ম ও ধৰ্মীয় মাবুদদেৱ ব্যাপারে তাৰ এই নতুন আৰুদা ও বিশ্বাস কতটুকু সহনীয়, বৰং এই প্ৰশ্নও দেখা দিয়েছে যে, জাতীয় রাষ্ট্ৰ ও তাৰ কেন্দ্ৰীয় ক্ষমতা-কৰ্তৃত্বেৰ ওপৰ এই বিশ্বাস যে আঘাত

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرْنِيْ كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَىْ ۖ قَالَ أَوْلَمْ  
تَرَىْ مِنْ ۖ قَالَ بَلَىْ وَلِكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۖ قَالَ فَخُلِّ أَرْبَعَةَ مِنْ  
الْطَّيْرِ فَصَرَّهُنِ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْتَ عَلَىِ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنْ جَزْءًا ثُمَّ  
أَدْعَنْ يَا تَيْنَكَ سَعِيًّا ۗ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর সেই ঘটনাটিও সামনে রাখো, যখন ইবরাহীম বলেছিল : “আমার প্রভু! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনজীবিত করো।” বললেন : তুমি কি বিশ্বাস করো না! ইবরাহীম জবাব দিল : বিশ্বাস তো করি, তবে মানসিক নিষ্ঠিততা লাভ করতে চাই। ২১৬ বললেন : ঠিক আছে, তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রাখো। এরপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও জ্ঞানয়ে। ২১৭

হানছে তাকে উপেক্ষা করা যায় কেমন করে? এ কারণেই হ্যরত ইবরাহীম (আ) বিদ্রোহের অপরাধে নমরান্দের সামনে আলীত হন।

২১২. যদিও হ্যরত ইবরাহীমের (আ) প্রথম বাক্যে একথা সুশ্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ রব হতে পারে না তবুও নমরান্দ হঠধর্মিতার পরিচয় দিয়ে নির্ণয়ের মতে তার জবাব দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের পর তার জন্য আবার হঠধর্মী হবার আর কোন সুযোগই ছিল না। সে নিজেও জানতো, চন্দ-সূর্য সেই আল্লাহরই হকুমের অধীন যাকে ইবরাহীম রব বলে মেনে নিয়েছে। এরপর তার কাছে আর কি জবাব দ্বাক্তব্য পারে? কিন্তু এভাবে তার সামনে যে দ্যুর্থহীন সত্য আত্মপ্রকাশ করেছিল তাকে মেনে নেয়ার মানেই ছিল নিজের স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রভৃতি ও শাসন কর্তৃত পরিহার করা। আর এই কর্তৃত পরিহার করতে তার নফসের তাণ্ডত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কাজেই তার পক্ষে নির্মতর ও হতবুদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। আত্মপূজার অঙ্ককার তেদে করে সত্য প্রিয়তার আলোকে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। যদি এই তাণ্ডতের পরিবর্তে আল্লাহকে সে নিজের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মেনে নিতো, তাহলে হ্যরত ইবরাহীমের প্রচার ও নসিহত প্রদানের পর তার জন্য সঠিক পথের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেতো।

তালমূদের বর্ণনা মতে তারপর সেই বাদশাহর নির্দেশে হ্যরত ইবরাহীমকে বন্দী করা হয়। দশদিন তিনি কারাগারে অবস্থান করেন। অতপর বাদশাহ কাউপিল তাকে জীবন্ত

পৃড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার যে ঘটনা ঘটে তা সূরা আবিয়ার ৫ম রূক্ত', আনকাবুতের ২য় ও ৩য় রূক্ত' এবং আস সাফ্ফাতের ৪র্থ রূক্ত'তে বর্ণিত হয়েছে।

২৯৩. এই ব্যক্তিটি কে ছিলেন, এবং সোকালয় কোনটি ছিল এ আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। এখানে আসল বক্তব্য কেবল এতটুকু যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সাহায্যকারী ও অভিভাবক বানিয়েছিলেন আল্লাহ কিভাবে তাকে আলোর রাঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই এবং এতে কোন লাভও নেই। তবে পরবর্তী বর্ণনা থেকে প্রকাশ হয় যে, এখানে স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তিনি নিচয়ই কোন নবীই হবেন।

২৯৪. এ প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সংশ্লিষ্ট বৃহৎ মৃত্যুর পরের জীবন অধীকার করতেন অথবা এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল। বরং আসলে তিনি সত্যকে চাক্ষুষ দেখতে চাষ্টিলেন, যেমন নবীদের দেখানো হয়ে থাকে।

২৯৫. দুনিয়াবাসী যাকে মৃত বলে জ্ঞেনেছিল, এমন এক ব্যক্তির জীবিত হয়ে ফিরে আসা তাঁর নিজের সমকালীন জনসমাজে তাকে একটি জীবন্ত নির্দর্শনে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

২৯৬. অর্থাৎ সেই নিচিততা, যা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

২৯৭. এই ঘটনাটি ও পূর্বোক্ত ঘটনাটির অনেকে অন্তু অন্তু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আবিয়া আলাইহিমুস সালামদের ব্যাপারে আল্লাহর যে নীতি রয়েছে, তা ডাক্তেডের হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হলে এ ব্যাপারে কোন প্রকার গৌজামিল দেয়ার প্রয়োজনই দেখা দিতে পারে না। সাধারণ দ্বামানদারদের এ জীবনে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে সে জন্য নিছক ঈমান বিল গাইবেই (না দেখে মেনে নেয়া) যথেষ্ট। কিন্তু নবীদের ওপর আল্লাহ যে দায়িত্ব অপর করেছিলেন এবং যে নির্জল সত্যগুলোর প্রতি দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দেয়ার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হয়েছিলেন সেগুলোকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা তাঁদের জন্য অপরিহার্য ছিল। মানুষের সামনে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের একথা বলার প্রয়োজন ছিল যে, তোমরা তো নিছক আন্দাজ অনুমান করে বলছো কিন্তু আমরা নিজেদের চর্মচক্ষে দেখা বিষয় তোমাদের বলছি। তোমাদের কাছে আছে আন্দাজ, অনুমান, ধারণা, কলনা, কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসের জ্ঞানভাগ। তোমরা অब্দ আর আমরা চক্ষুশান। তাই নবীদের সামনে ফেরেশতারা আসতেন প্রকাশ্যে। তাঁদেরকে পৃথিবী ও আকাশের ব্যবস্থাপনা দেখানো হয়েছে। জ্ঞানাত ও জ্ঞানান্নাম তাঁদেরকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। মৃত্যুর পরের জীবনের প্রদর্শনী করে তাঁদেরকে দেখানো হয়েছে। নবীগণ নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব লাভ করার অনেক আগেই ঈমান বিল গাইবের পর্যায় অভিক্রম করে থাকেন। নবী হবার পর তাঁদেরকে দান করা হয় ঈমান বিশ্ব শাহদাতের (চাক্ষুষ জ্ঞানলক্ষ বিশাস) নিয়ামত। এ নিয়ামত একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। (আরো বেশী জ্ঞানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হৃদের ১৭, ১৮, ১৯ ও ৩৪ টাকা)।

مَثْلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثْلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنْبَلَةٍ مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ  
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٦﴾ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ  
 لَا يَتَبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا إِنَّمَا لَا أَذَى لِهِمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ  
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٧﴾ قُولٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَلْقَةٍ  
 ﴿٤٨﴾ يَتَبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْحِلَّيْمِ

## ৩৬ রুক্ত'

যারা ২৯৮ নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে ২৯৯ তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে : যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, যার প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশতটি করে শস্যকণ। এভাবে আল্লাহ যাকে চান, তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মুক্তিষ্ঠ ও সর্বজ্ঞ।<sup>৩০০</sup> যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদিন রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন দুঃখ মর্মবেদনা ও ভয় নেই।<sup>৩০১</sup> একটি মিষ্টি কথা এবং কোন অত্রীতিকর ব্যাপারে সামান্য উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন এমনি দানের চেয়ে ভালো, যার পেছনে আসে দুঃখ ও মর্মজ্ঞালা। মূলত আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সহনশীলতাই তাঁর শুণ।<sup>৩০২</sup>

২৯৮. ইতিপূর্বে ৩২ রুক্ত'তে যে বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা চলেছিল এখানে আবার সেই একই প্রসংগে ফিরে আসা হয়েছে। সেখানে সূচনাপর্বেই ঈমানদারদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল, যে মহান উদ্দেশ্যের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ, তার জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দলের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিজের দলগত বা জাতীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে নিছক একটি উর্মত পর্যায়ের নেতৃত্ব উদ্দেশ্য সম্পাদনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে উদ্বৃক্ষ করা যেতে পারে না। বৈষম্যিক ও ভোগবাদী লোকেরা, যারা কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য জীবন ধারণ করে, এক একটি পয়সার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং লাভ-লোকসানের খতিয়ানের প্রতি সবসময় শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলে, তারা কখনো মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য কিছু করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে

মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য তারা কিছু অর্থ ব্যয় করে ঠিকই কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বংশীয় বা জাতীয় বৈয়ক্তিক লাভের হিসেব-নিকেশটা আগেই সেরে নেয়। এই মানসিকতা নিয়ে এমন একটি দীনের পথে মানুষ এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না, যার দাবী হচ্ছে, পার্থির লাভ-ক্ষতির পরোয়া না করে নিষ্ক্র আল্লাহর কামেকামে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে নিজের সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করতে হবে। এই ধরনের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভিরতৱ নৈতিক বৃত্তির প্রয়োজন। এ জন্য প্রসারিত দুটি, বিপুল মনোবল ও উদার মানসিকতা বিশেষ করে আল্লাহর নির্ভেজাল সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আর এই সংগে সমাজ জীবনে এমন ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, যার ফলে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী নৈতিকতার পরিবর্তে উপরোক্তভিত্তি নৈতিক গুণবলীর বিকাশ সাধিত হবে। তাই এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী তিনি রূক্ত' পর্যন্ত এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিধান দেয়া হয়েছে।

২৯৯. ধন-সম্পদ যদি নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করা হয় অথবা পরিবার-পরিজন ও সত্তান স্তুতির ভরণ-পোষণের বা আল্লায়-স্বজনের দেখাশুনা করার জন্য অথবা অভাবীদের সাহায্যার্থে বা জনকল্যাণমূলক কাজে এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে, যে কোনভাবেই ব্যয় করা হোক না কেন, তা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করা হয় তাহলে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করার মধ্যে গণ্য হবে।

৩০০. অর্থাত্ যে পরিমাণ অস্তরিকতা, নিষ্ঠা ও গভীর আবেগ-উদ্বীপনা সহকারে মানুষ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতিদানও তত বেশী ধার্য হবে। যে আল্লাহ একটি শস্যকণায় এত বিপুল পরিমাণ বরকত দান করেন যে, তা থেকে সাতশোটি শস্যকণা উৎপন্ন হতে পারে, তাঁর পক্ষে মানুষের দান-খয়রাতের মধ্যে এমনভাবে বৃদ্ধি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করা যার ফলে এক টাকা ব্যয় করলে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিদানে সাতশো গুণ হয়ে ফিরে আসবে, মোটেই কোন অভাবনীয় ও কঠিন ব্যাপার নয়। এই বাস্তব সত্ত্বটি বর্ণনা করার পর আল্লাহর দুটি গুণবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। একটি গুণ হচ্ছে, তিনি মৃত্যুহস্ত। তাঁর হাত সংকীর্ণ নয়। মানুষের কাজ প্রকৃতপক্ষে যতটুকু উন্নতি, বৃদ্ধি ও প্রতিদান লাভের যোগ্য, তা তিনি দিতে অক্ষম, এমনটি হতে পারে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি সর্বজ্ঞ। অর্থাত্ তিনি কোন বিষয়ে বেখবর নন। যা কিছু মানুষ ব্যয় করে এবং যে মনোভাব, আবেগ ও প্রেরণাসহকারে ব্যয় করে, সে সম্পর্কে তিনি অনবহিত থাকবেন, ফলে মানুষ যথার্থ প্রতিদান সাড়ে বক্ষিত হবে, এমনটিও হতে পারে না।

৩০১. অর্থাত্ যাদের প্রতিদান নষ্ট হবার কোন তার নেই এবং তারা নিজেদের এই অর্থ ব্যয়ের কারণে লঙ্ঘিত হবে, এমন ধরনের কোন অবস্থারও সৃষ্টি হবে না।

৩০২. এই একটি বাক্যের মধ্যে দুটি কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহ তোমাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী নন। দুই, আল্লাহ নিজেই যেহেতু সহনশীল, তাই তিনি এমন লোকদের পছন্দ করেন যারা নীচ ও সংকীর্ণমনা নন বরং বিপুল সাহস ও হিম্মতের অধিকারী এবং সহিষ্ণু। যে আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন জীবনের অগণিত উপায়-উপকরণ এবং বহুবিধ ভ্ল-ক্রষ্টি করার পরও তোমাদের বারবার মাফ করে

يَا يَهَا الِّذِينَ أَمْنَوْا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمِنَ وَالْأَذْى «كَالَّذِي  
يُنْفِقُ مَالَهُ رِتَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ  
صَفْوَانِ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَأَبْلَى فَتَرَكَهُ مَلِلًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى  
شَرْعٍ مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهِيءُ لِلنَّاسِ الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ ﴿١٥﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে বেড়িয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাতকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করে দিয়ো না যে নিছক লোক দেখাবার জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অথচ সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না এবং পরকালেও বিশ্বাস করে না।<sup>৩০৩</sup> তার ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে : একটি মসৃণ পাথরখণ্ডের ওপর মাটির আস্তর জমেছিল। প্রবল বর্ষণের ফলে সমস্ত মাটি ধূয়ে গেলো। এখন সেখানে রয়ে গেলো শুধু পরিষ্কার পাথর খণ্ড।<sup>৩০৪</sup> এই ধরনের লোকেরা দান-খয়রাত করে যে নেকী অর্জন করে বলে মনে করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদের সোজা পথ দেখানো আল্লাহর নিয়ম নয়।<sup>৩০৫</sup>

দিচ্ছেন, তিনি কেমন করে এমন লোকদের পছন্দ করতে পারেন, যারা কোন গরীবকে এক মুঠো ভাত খাওয়াবার পর বারবার নিজের অনুগ্রহের কথা সাড়বরে তার সামনে প্রকাশ করে তার আত্মর্মাদাকে ধূলায় ঢুঁটিয়ে দেয়? এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, যে মানুষকে কিছু দান করে তাকে অনুগৃহীত করা হয়েছে বলে তার কাছে প্রকাশ করে এবং একথা উল্লেখ করে মনে খোঁচা দেয়।

৩০৩. আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি তার যে বিশ্বাস নেই, তার রিয়াকারিতাই এর প্রমাণ। নিছক লোক দেখাবার জন্য সে যেসব কাজ করে সেগুলো সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, সৃষ্টিকেই সে আল্লাহ মনে করে এবং তার কাছ থেকেই নিজের কাজের প্রতিদান চায়। আল্লাহর কাছ থেকে সে প্রতিদানের আশা করে না। একদিন সমস্ত কাজের হিসেব-নিকেশ করা হবে এবং প্রতিদান দেয়া হবে, একথাও সে বিশ্বাস করে না।

৩০৪. এই উপর্যায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান খয়রাতকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নিয়ত ও প্রেরণার গলদসহ দান-খয়রাত করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তর বলতে নেকী ও সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নিয়তের গলদ। এই বিশ্বেষণের পর দৃষ্টান্ত সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতারে ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে

وَمِثْلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيَّتَا مِنْ  
 أَنْفِسِهِمْ كَمَثْلِ جَنَّةِ بَرْبُورٍ أَصَابَهَا وَأَبْلَى فَاتَّ أَكْلَهَا ضَعَفَيْنِ ۝ فَإِنْ لَمْ  
 يُصِبْهَا وَأَبْلَى فَطْلٌ ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ۝ أَيُوْدَاحِلَ كِرْمَانَ تَكُونَ  
 لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخْيَلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْمَرُ ۝ لَهُ فِيهَا مِنْ  
 كُلِّ الشَّمْرِتٍ لَا وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذِرِيَّةٌ ضَعَافَاءٌ مَنْ فَاصَابَهَا إِعْسَارٌ فِيهِ  
 نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۝ كَلِّ لِكَ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعْلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

বিপরীত পক্ষে যারা পূর্ণ মানসিক একাগ্রতা ও অবিচলতা সহকারে একমাত্র আগ্নাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টিত্ব হচ্ছে : কোন উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সেখানে দ্বিশণ ফলন হয়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হালকা বৃষ্টিপাতই তার জন্য যথেষ্ট। ৩০৬ আর তোমরা যা কিছু করো সবই আগ্নাহর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রয়েছে।

তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে, তার একটি সবুজ শ্যামল বাগান থাকবে, সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, খেজুর, আংগুর ও সব রকম ফলে পরিপূর্ণ থাকবে এবং বাগানটি ঠিক এমন এক সময় প্রবল উষ্ণ বায়ু প্রবাহে জলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে যখন সে নিজে বৃক্ষ হয়ে গেছে এবং তার সত্তানরাও তখনো যোগ্য হয়ে উঠেনি। ৩০৭ এভাবেই আগ্নাহ তাঁর কথা তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।

মাটিতে সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল শুপরিভাগেই লেপটে থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এ ক্ষেত্রে তার জন্য লাভজনক হবার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান-খয়রাত যদিও নেকী ও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পর্ক কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদেশ্য, সংসংকল্প ও সংনিয়তের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নিয়ত সৎ না হলে কর্মণার বারিধারা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩০৮. এখানে 'কাফের' শব্দটি অকৃতজ্ঞ ও অনুগ্রহ অস্তীকারকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ব্যক্তি আগ্নাহর দেয়া নেয়ামতকে তাঁর পথে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করার পরিবর্তে-মানুষের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করে অধিবা আগ্নাহর পথে কিছু অর্থ ব্যয় করলেও ব্যয় করার সাথে কষ্টও দিয়ে থাকে, সে আসলে অকৃতজ্ঞ এবং আগ্নাহর অনুগ্রহ-

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّفِقُوا مِنْ طِبِيبٍ مَا كَسِبُوا وَمِمَّا أَخْرَجَنَا الْكُرْ  
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمِمُّو الْحَبِيثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيْهِ إِلَّا  
أَنْ تَفْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حِمِيدٌ ⑤٦١ الْشَّيْطَنُ يَعِنُّ كُمْ  
الْفَقْرَ وَيَأْمُرُ كُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِنُّ كُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْسِرٌ ⑤٦٢ يَرْتَقِي الْحِكْمَةُ مِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ  
فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَنُ كُرْ إِلَّا أُولُو الْآلَابِ ⑤٦٣

৩৭ রূক্ষ

হে ইমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না অথচ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাখী হও না, যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বঙ্গ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম শুণে শুণাবিত। ৩০৮ শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি অবলম্বন করতে প্রস্তুক করে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশাস দেন। আল্লাহ বড়ই উদারহস্ত ও মহাজ্ঞানী। তিনি যাকে চান, হিকমত দান করেন। আর যে ব্যক্তি হিকমত লাভ করে সে আসলে বিরাট সম্পদ লাভ করেছে। ৩০৯

এসব কথা থেকে কেবলমাত্র তারাই শিক্ষা লাভ করে যারা বৃদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

বিশৃঙ্খলা বান্দা। আর সে নিজেই যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় না তখন তাকে অথবা নিজের সন্তুষ্টির পথ দেখাবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

৩০৬. প্রবল বৃষ্টিপাত বলতে এমন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে যার পেছনে থাকে চরম কল্যাণকাংখ্যা ও পূর্ণ সদিচ্ছা। আর হালকা বৃষ্টিপাত বলতে কল্যাণকাংখ্যার তীব্রতা বিহীন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে।

৩০৭. অর্থাৎ তোমাদের সারা জীবনের উপার্জনের এমন এক সংকটকালে ধ্বনি হয়ে যাওয়া তোমরা পছন্দ করো না যখন তা থেকে লাভবান হবার তোমাদের সবচেয়ে বেশী

প্রয়োজন হয় এবং নতুন করে অর্থোপার্জনের সুযোগই তোমাদের থাকে না। ঠিক তেমনি দুনিয়ায় জীবনভর কাজ করার পর আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করে তোমরা অকস্মাত যদি জানতে পারো তোমাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড এখানে মৃলত্বীন হয়ে গেছে, যা কিছু তোমরা দুনিয়ায় উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়ায় রয়ে গেছে, আখেরাতের জন্য তোমরা এমন কিছু উপার্জন করে আনতে পরোনি যার ফল এখানে ভোগ করতে পারো, তাহলে তা তোমরা কেমন করে পছন্দ করতে পারবে? সেখানে তোমরা নতুন করে আখেরাতের জন্য উপার্জন করার সুযোগ পাবে না। এই দুনিয়াতেই আখেরাতের জন্য কাজ করার সবটুকু সুযোগ রয়েছে। এখানে যদি তোমরা আখেরাতের চিত্তা না করে সারা জীবন দুনিয়ার ধ্যানে ময় থাকো এবং বৈষ্যিক স্বার্থ লাভের পেছনে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করো, তাহলে জীবনসূর্য অস্তমিত হবার পর তোমাদের অবস্থা হবে ঠিক সেই বৃক্ষের মতো করুণ, যার সারা জীবনের উপার্জন এবং জীবনের সহায় সহল ছিল একটি মাত্র বাগান। বৃক্ষ বয়সে তার এই বাগানটি ঠিক এমন এক সময় পুড়ে ছাই হয়ে গেলো যখন তার নতুন করে বাগান তৈরি করার সামর্থ ছিল না। এবং তার সন্তানদের একজনও তাকে সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

৩০৮. যিনি নিজে উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী তিনি কখনো নিকৃষ্ট গুণের অধিকারীদের পছন্দ করতে পারেন না, একথা সবাই জানে। মহান আল্লাহর নিজেই পরম দাতা এবং সর্বক্ষণ নিজের সৃষ্টির ওপর দান-দাঙ্কিণ্যের ধারা প্রবাহিত করছেন। কাজেই তাঁর পক্ষে কেমন করে সংকীর্ণ দৃষ্টি, ব্রহ্ম সাহস ও নিম্নমানের নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী লোকদেরকে ভালোবাসা সজ্ঞব?

৩০৯. হিকমত অর্থ হচ্ছে, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, হিকমতের সম্পদ যে ব্যক্তির কাছে থাকবে সে কখনো শয়তানের দেখানো পথে চলতে পারবে না। বরং সে আল্লাহর দেখানো প্রশংসন পথ অবলম্বন করবে। শয়তানের সংকীর্ণমনা অনুসারীদের দৃষ্টিতে নিজের ধন-সম্পদ আৰুকড়ে ধরে রাখা এবং সবসময় সম্পদ আহরণের নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করাই বৃদ্ধিমতার পরিযায়ক। কিন্তু যারা আল্লাহর কাছ থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে, তাদের মতে এটা নেহাত নির্বাঙ্কিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মতে, মানুষ যা কিছু উপার্জন করবে, নিজের মাঝেরী পর্যায়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর সেগুলো প্রাণ খুলে সৎকাজে ব্যয় করাটাই বৃদ্ধিমানের কাজ। দুনিয়ার এই হাতে গোণা কয়েকদিনের জীবনে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের তুলনায় হয়তো অনেক বেশী প্রাচুর্যের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু মানুষের জন্য এই দুনিয়ার জীবনটিই সম্পূর্ণ জীবন নয়। বরং এটি আসল জীবনের একটি সামান্যতম অংশ মাত্র। এই সামান্য ও ক্ষুদ্রতম অংশের সমৃদ্ধি ও সচলতার বিনিময়ে যে ব্যক্তি বৃহত্তম ও সীমাবিন্দু জীবনের অসচলতা, দারিদ্র্য ও দৈন্যদণ্ড কিনে নেয় সে আসলে নিরেট বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালের সুযোগ গ্রহণ করে মাত্র সামান্য পুঁজির সহায়তায় নিজের ঐ চিরস্তন জীবনের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে সে-ই আসলে বৃদ্ধিমান।

وَمَا أَنْفَقُتُ مِنْ نَفْقَةٍ أَوْنَدَ رَمَرِ مِنْ نَلٍ رَفَانَ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ  
 مِنْ أَنْصَارٍ ⑩ إِنْ تَبْدُوا الصَّلَقَتِ فَنِعْمَاهِيَ وَإِنْ تَخْفُوهَا  
 وَتُؤْتُوهَا الْفَقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفِرُ عَنْكُمْ مِنْ سِيَاتِكُمْ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ⑪ لَيْسَ عَلَيْكَ هُنْمَوْلِكَنَّ اللَّهُ يَهْدِي مِنْ  
 يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفِسَكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءٍ  
 وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ⑫

তোমরা যা কিছু ব্যয় করেছো এবং যা মানতও করেছো আল্লাহ তা সবই জানেন।  
 আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৩১০ যদি তোমাদের দান-সাদ্কাগুলো  
 প্রকাশ্যে করো, তাহলে তাও ভালো, তবে যদি গোপনে অভাবীদের দাও, তাহলে  
 তোমাদের জন্য এটিই বেশী ভালো। ৩১১ এভাবে তোমাদের অনেক গোনাহ নির্মূল  
 হয়ে যায়। ৩১২ আর তোমরা যা কিছু করে থাকো আল্লাহ অবশ্য তা জানেন।

মানুষকে হিদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অপিত হয়নি। আল্লাহ  
 যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন। তোমরা যে ধন-সম্পদ দান-ব্যয়রাত  
 করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার  
 জন্যই তো অর্থ ব্যয় করে থাকো। কাজেই দান-ব্যয়রাত করে তোমরা যা কিছু  
 অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে  
 কোন ক্রমেই তোমাদের প্রাপ্তি থেকে বর্ধিত করা হবে না। ৩১৩

৩১০. আল্লাহর পথে ব্যয় করা হোক বা শয়তানের পথে, আল্লাহর জন্য মানত করা  
 হোক বা গায়রম্বাহর জন্য, উভয় অবস্থায়ই মানুষের নিয়ত ও তার কাজ সম্পর্কে আল্লাহ  
 ভালোভাবেই জানেন। যারা আল্লাহর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং তাঁর জন্যই মানত করে  
 তারা তাদের প্রতিদান পাবে। আর যেসব জালেম শয়তানের পথে ব্যয় করে থাকে এবং  
 আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের জন্য মানত করে, তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা  
 করার সাধ্য কান্না নেই।

মানত বলা হয় নজরানাকে। কোন একটি মনোবাঙ্গ পূর্ণ হলে মানুষ যখন নিজের ওপর  
 এমন কোন ব্যয়ভার বা সেবাকে ফরয করে নেয়, যা তার ওপর ফরয নয় তখন তাকে  
 মানত বলে। এই মনোবাঙ্গ যদি কোন হালাল জিনিস সম্পর্কিত হয় এবং তা আল্লাহর

لِّلْفَقَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرَبًا فِي  
الْأَرْضِ ذِي حِسْبَمِ الْجَاهِلَ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعْفِ تَعْرِفُهُ  
بِسِيمِهِ لَا يُسْتَلِونَ النَّاسُ إِلَحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيهِ ۝

বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্মত বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই ভূমি তাদের তেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে, এমন লোক তারা নয়। তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে ধাকবে না। ৩১৪

কাছে চাওয়া হয়ে থাকে আর তা পূর্ণ হবার পর যে কাজ করার অঙ্গীকার করা হয় তা আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরনের নজরানা ও মানত হবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন। এই মানত পূর্ণ করলে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করা যাবে। যদি এই ধরনের মানত না হয়, তাহলে তা নিজেই নিজের উপর আরোপিত গোনাহের কারণ হয়ে দাঢ়াবে এবং তা পূর্ণ করলে অবশ্যি আঘাতের অংশীদার হতে হবে।

৩১১. যে দান-খয়রাতটি করা ফরয সেটি প্রকাশে করাই উত্তম। অন্যদিকে ফরয নয় এমন দান-খয়রাত গোপনে করাই তালো। সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। ফরযগুলো প্রকাশে এবং নফলগুলো গোপনে করাই উত্তম হিসেবে বিবেচিত।

৩১২. অর্থাৎ শুকিয়ে সংকাষ্ঠ করলে মানুষের আত্মা ও নৈতিক বৃত্তির অনবরত সংশোধন হয়ে থাকে। তার সংগুণাবলী বিকাশ লাভ করতে থাকে। তার দোষ, ত্রুটি ও অস্বৃতিগুলো ধীরে ধীরে নির্মূল হতে থাকে। এই জিনিসটি তাকে আল্লাহর এমন প্রিয়তাজন করে তোলে, যার ফলে তার আমলনামায় যে সামান্য কিছু গোনাহ লেখা থাকে, তার এই সংগুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহান আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দেন।

৩১৩. প্রথমদিকে মুসলমানরা নিজেদের অমুসলিম আত্মীয়-বজন ও সাধারণ অমুসলিম দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করার ব্যাপারে ইতস্তত করতো। তারা মনে করছিল কেবলমাত্র মুসলিম অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করলেই তা আল্লাহর পথে সাহায্য হিসেবে গণ্য হবে। এই আয়াতে তাদের এই ভূল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে।

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ هُنَّ  
عِنْ رِبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُنْ يَحْزَنُونَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يَا كُلُونَ  
الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ  
الْمِسْكِنِ ذُلِّكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَأَحَلَ اللَّهُ  
الْبَيْعُ وَهَرَامُ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُنَّفِيهَا  
خَلِلُونَ ﴿٧﴾

## ৩৮ রূক্ষ

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দিনরাত গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন ভয় ও দুঃখ নেই। কিন্তু যারা সুদ খায়<sup>৩১৫</sup> তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।<sup>৩১৬</sup> তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে : “ব্যবসা তো সুদেরই মতো।”<sup>৩১৭</sup> অর্থ আল্লাহ ব্যবসাকে হাশাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।<sup>৩১৮</sup> কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপন্দ হয়ে গেছে।<sup>৩১৯</sup> আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে, সে জাহানামের অধিবাসী।

এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এসব লোকের মনে হিদায়াতের মর্মবাণী সুদ্ধতাবে বন্ধমূল করে দেয়া তোমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত নয়। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কেবল এদের কাছে ইককথা পৌছিয়ে দেয়া। ইককথা পৌছিয়ে দিয়েই তুমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। এখন তাদের অন্তরদৃষ্টি দান করা বা না করা আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত। আর তোমরা নিচের তাদের হিদায়াত গ্রহণ না করার কারণে পাথির অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাদের অভাব মোচনের ব্যাপারে ইজ্ঞাত করো না কারণ আল্লাহর সম্মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে কোন অভাবী লোকের সাহায্য করো না কেন, আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্য তোমাদের দেবেন।

৩১৪. এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে এমন একদল লোক যারা আল্লাহর দীনের খেদমতে নিজেদেরকে কায়মনোবাকে সার্বক্ষণিকভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তাদের সমস্ত সময় এই দীনী খেদমতে ব্যয় করার কারণে নিজেদের পেট পালার জন্য কিছু কাজকাম করার সুযোগ তাদের ছিল না। নবী সাল্লাহুব্রাহ আলাইহি শুয়া সাল্লামের যুগে এই ধরনের শ্বেষাসেবীদের একটি বৃত্তি দল ছিল। ইতিহাসে তাঁরা 'আসহাবে সুফ্ফাফ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এরা ছিলেন তিনি চারশো লোকের একটি দল। নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে এরা মদীনায় চলে এসেছিলেন। সর্বক্ষণ নবী সাল্লাহুব্রাহ আলাইহি শুয়া সাল্লামের খেদমতে হায়ির থাকতেন। তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। তিনি যখন যাকে যেখানে কোন কাজে বা অভিযানে প্রয়োজন তাদের মধ্য থেকে নিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। মদীনার বাইরে কোন কাজ না থাকলে তারা মদীনায় অবস্থান করে দীনী ইলম হাসিল করতেন এবং অন্যদেরকে তাঁর তালিম দিতেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন সার্বক্ষণিক কর্মী এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো ব্যক্তিগত উপকরণও তাঁদের ছিল না, তাই মহান আল্লাহ সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে বিশেষ করে তাদেরকে সাহায্য করাকে আল্লাহর পথে যায়ের সর্বোত্তম খাত বলে উল্লেখ করেছেন।

৩১৫. মূল শব্দটি হচ্ছে 'রিবা'। আরবী ভাষায় এর অর্থ বৃদ্ধি। পারিভাষিক অর্থে আরবরা এ শব্দটি ব্যবহার করে এমন এক বর্ধিত অংকের অর্থের জন্য, যা ঝণ্ডাতা ঝণ্ঘণ্ঘাতার কাছ থেকে একটি শ্বিলীকৃত হার অনুযায়ী মূল অর্থের বাইরে আদায় করে থাকে। আমাদের ভাষায় একেই বলা হয় সুদ। কুরআন নাযিলের সময় যেসব ধরনের সুদী লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কোন জিনিস বিক্রি করতো এবং দাম আদায়ের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতো। সময়সীমা অতিক্রম করার পর যদি দাম আদায় না হতো, তাহলে তাকে আবার বাড়িতি সময় দিতো এবং দাম বাড়িয়ে দিতো। অথবা যেমন, একজন অন্য একজনকে ঝণ দিতো। ঝণ্ডাতা সাথে চুক্তি হতো, উমুক সময়ের মধ্যে আসল থেকে এই পরিমাণ অর্থ বেশী দিতে হবে। অথবা যেমন, ঝণ্ডাতা ও ঝণ্ঘণ্ঘাতার মধ্যে একটি বিশেষ সময়সীমার জন্য একটি বিশেষ হার হিস্তি হয়ে যেতো। ঐ সময়সীমার মধ্যে বর্ধিত অর্থসহ আসল অর্থ আদায় না হলে আগের থেকে বর্ধিত হারে অতিরিক্ত সময় দেয়া হতো। এই ধরনের লেনদেনের ব্যাপার এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩১৬. আরবরা পাগল ও দেওয়ানাকে বলতো, 'মজনুন' (অর্থাৎ জিন বা প্রেতগন্ত)। কোন ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, একথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বারা বলতো, উমুককে জিনে ধরেছে। এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছে যার বৃদ্ধিষষ্ঠ হয়ে গেছে। অর্থাৎ বৃদ্ধিষষ্ঠ ব্যক্তি যেমন ভারসাম্যহীন কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করে, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পেছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। নিজের স্বার্থপর মনোবৃত্তির চাপে পাগলের মতো সে কোন ক্ষিত্রেই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে কোনু কোনু পর্যায় মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভাতৃত্ব ও সহানুভূতির শিকড় কেটে গেলো, সামষ্টিক কল্পণের উপর কোনু ধরনের ধৰ্মসক্র প্রভাব পড়লো এবং কতগুলো লোকের দুরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচৰ্যের ব্যবস্থা করলো—এসব বিষয়ে তাঁর কোন মাথা ব্যথাই থাকে না।

দুনিয়াতে তার এই পাগলপারা অবস্থা। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে যে অবস্থায় সে এই দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল, তাই কিয়ামতের দিন সুদোরে ব্যক্তি একজন পাগল ও বৃক্ষিভষ্ট লোকের চেহারায় আভ্যন্তরিক করবে।

৩১৭. অর্থাৎ তাদের মতবাদের গলদ হচ্ছে এই যে, ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটোনো হয়, তার ওপর যে মুনাফা আসে সেই মুনাফালক অর্থ ও সুদের মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করে না। এই উভয় অর্থকে একই পর্যায়ভূক্ত মনে করে তারা যুক্তি পেশ করে থাকে যে, ব্যবসায়ে খাটোনো অর্থের মুনাফা যখন বৈধ তখন এই ঝণবাবদ প্রদত্ত অর্থের মুনাফা অবৈধ হবে কেন? বর্তমান যুগের সুদখোরণাও সুদের ব্যক্ষে এই একই যুক্তি পেশ করে থাকে। তারা বলে, এক ব্যক্তি যে অর্থ থেকে লাভবান হতে পারতো, তাকে সে ঝণ বাবদ দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর এ দ্বিতীয় ব্যক্তি নিসলেহে তা থেকে লাভবানই হচ্ছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে ঝণদাতার যে অর্থ থেকে ঝণগ়হীতা লাভবান হচ্ছে তার একটি অংশ সে ঝণদাতাকে দেবে না কেন? কিন্তু তারা একথাটি চিন্তা করে না যে, দুনিয়ায় যত ধরনের কারবার আছে, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি—যাই হোক না কেন, যেখানে মানুষ কেবলমাত্র শ্রম খাটোয় অথবা শ্রম ও অর্থ উভয়টিই খাটোয়, সেখানে কোন একটি কারবারও এমন নেই যাতে মানুষকে ক্ষতির ঝুকি (Risk) নিতে হয় না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মুনাফা বাবদ অর্জিত হবার গ্যারান্টি কোথাও থাকে না। তাহলে সারা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসায় সংগ়ঠনের মধ্যে একমাত্র ঝণদাতা পুঁজিপতিইবা কেন ক্ষতির ঝুকিমূল্য থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভের হকদার হবে? অলাভজনক উদ্দেশ্যে ঝণ প্রহণ করার বিষয়টি কিছুক্ষণের জন্য না হয় দূরে সরিয়ে রাখুন এবং সুদের হারের কম বেশীর বিষয়টিও সংগৃহণ রাখুন। লাভজনক ও উৎপাদনশীল ঘণ্টের ব্যাপারেই আসা যাক এবং হারও ধরা যাক ক্রম। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা রাতদিন নিজেদের কারবারে সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি খাটিয়ে চলছে এবং যাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপরই এই কারবার ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করছে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট মুনাফার নিশ্চয়তা নেই বরং ক্ষতির সমস্ত ঝুকিটাই থাকছে তাদের মাথার ওপর। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের টাকা তাকে ঝণ দিয়েছে সে নিচিস্তে বসে বসে একটি নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা হাসিল করতে থাকবে, এটা কোন ধরনের বৃক্ষিসম্ভত ও যুক্তিসংগত কথা? ন্যায়, ইনসাফ ও অর্থনৈতির কোন মানদণ্ডের বিচারে একে ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে। আবার এক ব্যক্তি একজন কারখানাদারকে বিশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ ঝণ দিল এবং ঝণ দেয়ার সময়ই সেখানে হিঁরীকৃত হলো যে, আজ থেকেই সে বছরে শতকরা পাঁচ টাকা হিসেবে নিজের মুনাফা গ্রহণের অধিকারী হবে। অর্থ কেউ জানে না, এই কারখানা যে পণ্য উৎপাদন করছে আগামী বিশ বছরে বাজারে তার দামের মধ্যে কি পরিমাণ ওঠানামা হবে? কাজেই এ পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে? একটি জাতির সকল শ্রেণী একটি যুক্তে বিপদ, ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করবে কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে একমাত্র ঝণদাতা পুঁজিপতি গোষ্ঠীই তাদের জাতিকে প্রদত্ত যুক্তিশীলের সুদ উস্তুল করতে থাকবে শত শত বছর পরও, এটাকে কেমন করে সঠিক ও ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে?

৩১৮. ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়ভূক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপ :

(ক) ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার সমান বিনিময় হয়। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি পণ্য কিনে ক্রেতা তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে ক্রেতার জন্য ঐ পণ্যটি বোগাড় করার ব্যাপারে বিক্রেতা নিজের যে বৃক্ষি শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল তার মূল্য গ্রহণ করে। বিপরীতপক্ষে সুনী লেনদেনের ব্যাপারে মুনাফার সমান বিনিময় হয় না। সুন্দর গ্রহণকারী অর্থের একটি নিদিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করে। এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু অন্যদিকে সুন্দর প্রদানকারী কেবলমাত্র 'সময়' লাভ করে, যার লাভজনক হওয়া নিশ্চিত নয়। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য যদি সে ঐ খণ্ড বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিসন্দেহে বলা যায়, ঐ 'সময়' তার জন্যে নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারিগরী সংস্থা অথবা কৃষি কাজে লাগাবার জন্য ঐ অর্থ নিয়ে থাকে, তবুও 'সময়' তার' জন্য যেমন লাভ আনবে তেমনি ক্ষতিও আনবে, দু'টোরই সঙ্গাবন্ধ সমান। কাজেই সুন্দের ব্যাপারটির ডিস্টি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি দলের লাভ ও অন্য দলের লোকসানের উপর অথবা একটি দলের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ ও অন্য দলের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের উপর:

(খ) ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী লাভ গ্রহণ করক্ষমা কেন, সে মাত্র একবারই তা গ্রহণ করে। কিন্তু সুন্দের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী নিজের অর্থের জন্য অনবরত মুনাফা নিতে থাকে। আবার সময়ের পতির সাথে সাথে তার মুনাফাও বেড়ে যেতে থাকে। ঝণগ্রহীতা তার অর্থ থেকে যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি নিদিষ্ট সীমার মধ্যে আবস্থ থাকে। কিন্তু ঝণদাতা এই লাভ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে তার কোন সীমা নেই। এমনও হতে পারে, সে ঝণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ এমনকি তার পরনের কাপড়-চোপড় ও ঘরের বাসন-কোসনও উদ্রূর্ধ্ব করে ফেলতে পারে এবং এরপরও তার দাবী অপূর্ণ থেকে যাবে।

(গ) ব্যবসায়ে পণ্যের সাথে তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতাকে আর কোন জিনিস বিক্রেতার হাতে ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, জমি বা মালপত্রের ভাড়ার ব্যাপারে আসল যে বস্তুটি, যার ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়, তা ব্যয়িত হয় না বরং অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা ভাড়াদানকারীর কাছে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুন্দের ক্ষেত্রে ঝণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পুনর্বার উৎপাদন করে বৃক্ষি সহকারে ফেরত দেয়।

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে মানুষ শ্রম, বৃক্ষি ও সময় ব্যয় করে তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু সুনী কারিগরে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে কোন প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের সিংহভাগের অংশীদার হয়। পারিভাষিক অর্থে থাকে "অংশীদার" বলা হয় লাভ-লোকসান উভয় ক্ষেত্রে যে অংশীদার থাকে এবং লাভের ক্ষেত্রে লাভের হার অনুযায়ী যার অংশীদারীত্ব হয়, তেমন অংশীদারের মর্যাদা সে লাভ করে না। বরং সে এমন অংশীদার হয়, যে লাভ-লোকসান ও লাভের হারের কোন পরোয়া না করেই নিজের নির্ধারিত মুনাফার দাবীদার হয়।

এসব কারণে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সুন্দের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরাট পৰ্যাক্য সূচিত হয়। এর ফলে ব্যবসায় মানবিক তামাদুনের লালন ও পুনর্গঠনকারী

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَ يَرْبِسِ الْصَّلَقِ ۖ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
كُفَّارٍ أَثِيْرٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَاتَّوْا الزَّكُوَةَ لَهُمْ أَجْرٌ هُنَّ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزُنُونَ ۝

সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন। ৩২০ আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দৃক্তকারীকে পছন্দ করেন না। ৩২১ অবশ্য যারা ইমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান নিসন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় ও ঘর্ষণালাভ নেই। ৩২২

শক্তিতে পরিণত হয়। বিপরীত পক্ষে সুদ তার খৎসের কারণ হয়। আবার নৈতিক দিক দিয়ে সুদের প্রকৃতিই হচ্ছে, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্ময়তা, কঠোরতা ও অর্থগুরুতা সৃষ্টি করে এবং সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে দেয়। তাই অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই সুদ মানবতার জন্য খৎসই দেকে আনে।

৩১৯. একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হচ্ছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, “যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই” বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যাকিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ সে খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা-মোকদ্দমার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সুন্নী কারবাবের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্তা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথার্থই আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপর্যুক্ত ধন-সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থ-সম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজৰ পর্যায়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। ইকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব ইকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বীচাতে সাহায্য করবে। তবে যে

ব্যক্তি তার পূর্বেকার সুদূরক অর্থ যথারীতি ভোগ করতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিশ্বয়ের কিছু নেই।

৩২০. এই আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্ত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তামাদুনিক দিক দিয়েও সত্য। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ কমে যাচ্ছে তবুও আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর আকৃতিক বিধান হচ্ছে এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও তামাদুনিক উন্নতির কেবল প্রতিবন্ধকাতাই নয় বরং অবনতির সহায়ক। বিপরীতপক্ষে দান-খয়রাতের (করযা-ই-হাসানা বা উত্তম ঝণ) মাধ্যমে নৈতিক ও অধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং তামাদুন ও অর্থনীতি সবকিছুই উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সুদ আসলে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, নির্যতা ইত্যাকার অসৎ গুণাবলীর ফল এবং এই গুণগুলোই সে মানুষের মধ্যে বিকশিত করে। অন্যদিকে দানশীলতা, সহানুভূতি, উদারতা ও মহানৃত্বতা ইত্যাকার গুণাবলীই দান-খয়রাতের জন্য দেয় এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে আর নিয়মিত দান-খয়রাত করতে থাকলে এই গুণগুলো মানুষের মধ্যে লালিত ও বিকশিত হতেও থাকে। এমন কে আছে যে, এই উভয় ধরনের নৈতিক গুণাবলীর মধ্য থেকে প্রথমগুলোকে নিকৃষ্ট ও শেষেরগুলোকে উৎকৃষ্ট বলবে না?

তামাদুনিক দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিসদেহে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে সমাজের লোকেরা পরম্পরের সাথে স্বার্থবাদী আচরণ করে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ ছাড়া নিষ্ঠার্থভাবে অন্যের কোন কাজ করে না, একজনের প্রয়োজন ও অভাবকে অন্যজন নিজের মুনাফা লুঠনের সূযোগ মনে করে তা থেকে পুরোপুরি লাভবান হয় এবং ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, সে সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। সে সমাজের লোকদের মধ্যে পারম্পরিক প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে হিংসা, বিদেশ, নিষ্ঠুরতা ও অনাগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর বিভিন্ন অংশ হামেশা বিশ্বখলা ও নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। অন্যান্য কারণগুলো যদি এই অবস্থার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এহেন সমাজের বিভিন্ন অংশের পরম্পরের সাথে সংঘাতে লিঙ্গ হয়ে যাওয়াটাও মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। অন্যদিকে যে সমাজের সামষ্টিক ব্যবস্থাগুলি পরম্পরের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যার সদস্যরা পরম্পরের সাথে উদার্যপূর্ণ আচরণ করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন ও অভাবের সময় আন্তরিকতার সাথে ও প্রশংসনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একজন সামর্থ ও সক্ষম ব্যক্তি তার একজন অক্ষম ও অসমর্থ ভাইকে সাহায্য অথবা কমপক্ষে ন্যায়সংগত সহায়তার নীতি অবলম্বন করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পারম্পরিক প্রীতি, কল্যাণাকাঙ্খা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের সমাজের অংশগুলো একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত থাকবে। সেখানে আভ্যন্তরীণ কোনোল, বিরোধ ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠার কোন সূযোগই পাবে না। পারম্পরিক শুভেচ্ছা ও সাহায্য সহযোগিতার কারণে সেখানে উন্নতির গতিধারা প্রথম ধরনের সমাজের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হবে।

এবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করা যাক। অর্থনৈতির বিচারে সুদী লেনদেন দুই ধরনের হয়। এক, জভাবীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাধ্য হয়ে যে ঝণ গ্রহণ করে। দুই, পেশাদার লোকেরা নিজেদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করার জন্য যে ঝণ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম ধরনের ঝণটি সম্পর্কে সবাই জানে, এর ওপর সুদ আদায় করার পদ্ধতি মারাত্মক ধূংসকর। দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেখানে মহাজনরা ও মহাজনী সংস্থাগুলো এই পদ্ধতিতে গৱীব শ্রমিক, মজুর, কৃষক ও শর্ল আয়ের লোকদের রক্ত চুষে ছলছে না। সুদের কারণে এই ধরনের ঝণ আদায় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বরং অনেক সময় অসঙ্গ হয়ে পড়ে। তারপর এক ঝণ আদায় করার জন্য দ্বিতীয় ঝণ এবং তারপর তৃতীয় ঝণ, এভাবে ঝণের পর ঝণ নিতে থাকে। ঝণের মূল অংকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সুদ আদায় করার পরও মূল অংক যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। শ্রমিকদের আয়ের বৃহত্তম অংশ যাহাজনের পেটে যায়। তার নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিনান্তে তার নিজের ও সত্তান-পরিজনদের পেটের আহার যোগাতে সক্ষম হয় না। এ অবস্থায় কাজের প্রতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং একদিন তা শূণ্যের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কারণ তাদের মেহনতের ফল যদি অন্যেরা নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা কোনদিন মন দিয়ে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারে না। তারপর সুদী ঝণের জালে আবক্ষ লোকরা সর্বক্ষণ এমন দুর্ভাবনা ও পেরেশানির মধ্যে জীবন কাটায় এবং অভাবের কারণে তাদের জন্য সঠিক খাদ্য ও চিকিৎসা এমনই দুর্ভ হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের শাস্ত্র কখনো ভালো থাকে না। আয়ই তারা রোগ-পীড়ায় জর্জরিত থাকে। এভাবে সুদী ঝণের নীট ফল এই দাঁড়ায় : গুটিকয় লোক লাখো লোকের রক্ত চুষে মোটা হতে থাকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির অর্থ উৎপাদন সত্ত্বায় পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পরিণামে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ত চোষারাও নিষ্কৃতি পায় না। কারণ তাদের স্বার্থগুরুত্ব সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীকে বিস্ফুল করে তোলে। ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষেত্র, ঘৃণা ও ক্রোধ লালিত হতে থাকে। তারপর একদিন কোন বিপ্লবের তরঙ্গিভাবতে ক্ষেত্রের আঘেয়গিরির বিক্ষেপণ ঘটে। তখন এই জালেম ধনিক সমাজকে তাদের অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে প্রাণ সম্পদও বিসর্জন দিতে হয়।

আর দ্বিতীয় ধরনের সুদী ঝণ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যবসায় খাটোবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে এই ঝণ গ্রহণ করার ফলে যে অসংখ্য ক্ষতি হয় তার মধ্যে উল্লেখ কয়েকটি এখানে বিবৃত করছি।

এক : যে কাজটি প্রচলিত সুদের হারের সমান লাভ উৎপাদনে সক্ষম নয়, তা দেশ ও জাতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় ও উপকারী হোক না কেন, তাতে খাটোবার জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ একযোগে এমন সব কাজের দিকে দৌড়ে আসে, যেগুলো বাজারে প্রচলিত সুদের হারের সমান বা তার চাইতে বেশী লাভ উৎপাদন করতে পারে, সামগ্রিক দিক দিয়ে তাদের প্রয়োজন বা উপকারী ক্ষমতা অনেক কম অথবা একেবারে শূন্যের কোঠায় থাকলেও।

দুই : ব্যবসায়, শিল্প বা কৃষি সৎক্রান্ত যেসব কাজের জন্য সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাদের কোন একটিতেও এ ধরনের কোন গ্যারান্টি নেই যে, সবসময় সব অবস্থায় তার মূনাফা একটি নিদিষ্ট পরিমাণ যেমন শতকরা পাঁচ, ছয় বা দশ অথবা তার উপরে থাকবে এবং এর নীচে কখনো নামবে না। মূনাফার এই হারের গ্যারান্টি তো দূরের কথা সেখানে অবশ্যি মূনাফা হবে, কখনো লোকসান হবে না, এর কোন নিচয়তা নেই। কাজেই যে ব্যবসায়ে এমন ধরনের পুঁজি খাটানো হয় যাতে পুঁজিপতিকে একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী মূনাফা দেয়ার নিচয়তা দান করা হয়ে থাকে, তা কখনো ক্ষতি ও আশংকা মুক্ত হতে পারে না।

তিনি : যেহেতু মূল ঝণ্ডাতা ব্যবসায়ের সাত লোকসানে অংশীদার হয় না, কেবলমাত্র মূনাফার অংশীদার হয় এবং তাও আবার একটি নিদিষ্ট হারে মূনাফার নিচয়তা দেয়ার ভিত্তিতে মূলধন দেয়, তাই ব্যবসায়ের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকে না। সে চরম স্বার্থপ্রতা সহকারে কেবলমাত্র নিজের মূনাফার উপর নজর রাখে। যখনই বাজারে সামান্য মন্দাতাব দেখা দেয়ার আশংকা হয় তখনই সে সবার আগে নিজের টাকাটা টেনে নেয়ার চিন্তা করে। এভাবে কখনো কখনো নিষ্ক তার স্বার্থপ্রতা সুলভ আশংকার কারণে সত্যি সত্যিই বাজারে মন্দাতাব সৃষ্টি হয়। কখনো অন্য কোন কারণে বাজারে মন্দাতাব সৃষ্টি হয়ে গেলে পুঁজিপতির স্বার্থপ্রতা তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চূড়ান্ত ধূঃসের সূচনা করে।

সুদের এ তিনটি ক্ষতি অত্যন্ত সুম্পষ্ট। অর্থনৈতির সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি এগুলো অঙ্গীকার করতে পারবেন না। এরপর একথা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, যথার্থই সুদ অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ায় না বরং কমায়।

এবার দান-খয়রাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও ফলাফলের কথায় আসা যাক। সমাজের সচল লোকেরা যদি নিজেদের অবস্থা ও মর্যাদা অনুসরে নিসংকোচে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেয় এরপর তাদের কাছে যে পরিমাণ টাকা উদ্ধৃত থাকে তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়, যাতে তারাও নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে পারে, তারপরও যে টাকা বাড়তি থেকে যায় তা ব্যবসায়ীদের বিনা সুদে ঝণ দেয় অথবা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে সাত লোকসানে শরীক হয়ে যায় অথবা সমাজ ও সমষ্টির সেবায় বিনিয়োগ করার জন্য সরকারের হাতে সোপার্দ করে দেয়, তাহলে এহেন সমাজে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি চরম উন্নতি লাভ করবে, সমাজের সাধারণ লোকদের সচলতা বেড়ে যেতে থাকবে এবং সুনী অর্থ ব্যবস্থা ভিত্তিক সমাজের তুলনায় সেখানে সামগ্ৰিকভাৱে অর্থ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, একথা যে কেউ সামান্য চিন্তা-ভাবনা কৱলে সহজেই বুঝতে পারবে।

৩১. অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তার মৌলিক প্রয়োজনের চাইতে বেশী অংশ পেয়েছে একমাত্র সেই ব্যক্তিই সুদে টাকা খাটাতে পারে। কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই যে অংশটা পায় কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় আল্লাহর দান। আর আল্লাহর এই দানের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যেভাবে তাঁর বাস্তাকে দান করেছেন বাস্তাও ঠিক সেভাবেই আল্লাহর অন্য বাস্তাদেরকে তা দান করবে। যদি সে এমনটি না করে বরং এর বিপরীতপক্ষে আল্লাহর এই দানকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ كُنْتُمْ  
 مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ وَإِنْ  
 تَبِتُّمْ فَلَا كُمْ رَءُوسَ أَمْوَالِكُمْ ۝ لَا تَظْلِمُونَ ۝ وَإِنْ  
 كَانَ ذُو عَسْرَةً فَنَظِرُهُ إِلَى مِسْرَةٍ ۝ وَإِنْ تَصْلِقُوا خِمْرَ لَكُمْ  
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۝ ثُمَّ تُرْتَبَقُ  
 كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ ۝

হে ঈমানদ্বয়রণণ! আল্লাহকে ডয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ  
 বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো। কিন্তু যদি  
 তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ  
 থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ৩২৩ এখনো তাওবা করে নাও (এবং সুদ  
 ছেড়ে দাও)। তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে  
 না এবং তোমাদের উপর জুলুম করাও হবে না। তোমাদের কংগঢ়াইতা অভাবী হলে  
 সচ্ছলতা আভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সাদৃকা করে দাও, তাহলে  
 এটা তোমাদের জন্য বেশী ভালো হবে, যদি তোমরা জানতে। ৩২৪ যেদিন তোমরা  
 আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে সেদিনের অগম্যান ও বিপদ থেকে বাঁচো। সেখানে  
 প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎকর্মের ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া  
 হবে এবং কারো উপর কোন জুলুম করা হবে না।

এমনভাবে ব্যবহার করে যার ফলে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহর যেসব বান্দা প্রয়োজনের  
 কম অংশ পেয়েছে তাদের এই কম অংশ থেকেও নিজের অর্থের জোরে এক একটি অংশ  
 নিজের দিকে টেনে নিতে থাকে, তাহলে আসলে সে এক দিকে যেমন হবে অকৃতজ্ঞ  
 তেমনি অন্য দিকে হবে জালেম, নিষ্ঠুর, শোষক ও দুর্চরিত।

৩২২. এই ইরাক্ত'তে মহান আল্লাহ বারবার দুই ধরনের লোকদের তুলনা করেছে। এক  
 ধরনের লোক হচ্ছে, বার্থপর, অর্থগুরু ও শাইলক প্রকৃতির, তারা আল্লাহ ও বান্দা  
 উভয়ের অধিকারের পরোয়া না করে টাকা শুণতে থাকে, প্রত্যেকটি টাকা শুণে শুণে তার  
 সম্বন্ধের ব্যবহা করতে থাকে এবং সত্তাহ ও মাসের হিসেবে তা বাড়াবার ও এই  
 বাড়তি টাকার হিসেব রাখার মধ্যে ঢুবে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে, আল্লাহর  
 অনুগত, দানশীল ও মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও তার বান্দার উভয়ের

অধিকার সংরক্ষণের প্রতি নজর রাখে, নিজেদের পরিশ্রমলক্ষ অর্থ দিয়ে নিজেদের চাহিদাগুরণ করে এবং অন্যদের চাহিদা পূরণেরও ব্যবস্থা করে। আর এই সৎগে নিজেদের অর্থ ব্যাপকভাবে সংকোচ্জে ব্যয় করে। প্রথম ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই ধরনের চরিত্র সম্পর্ক লোকদের সাহায্যে দুনিয়ায় কোন সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আখেরাতেও তারা দুঃখ, কষ্ট, যত্নগা, লাঙ্ঘনা ও বিপদ-মুসিবত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। বিপরীতপক্ষে হিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পর্ক লোকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তাদের সাহায্যেই দুনিয়ায় সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠে এবং আখেরাতে তারাই কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হয়।

৩২৩. এ আয়াতটি মুক্তি বিজয়ের পর নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এটিকে এখানে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে সুদকে একটি অপছন্দনীয় বস্তু মনে করা হলেও আইনত তা রহিত করা হয়নি। এই আয়াতটি নাযিলের পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সুন্নী কারবার একটি ফৌজদারী অপরাধে পরিণত হয়। আরবের যেসব গোত্রে সুদের প্রচলন ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের গর্ভারের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, এখন থেকে যদি তারা সুদের কারবার বন্ধ না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে নাজরানের বৃষ্টানন্দের স্বামুন্ত শাসনাধিকার দান করার সময় চুক্তিতে একথা সূপ্তিভাবে উল্লেখ করা হয়, যদি তোমরা সুন্নী কারবার করো তাহলে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আয়াতের শেষের শব্দগুলোর কারণে হ্যারত ইবনে আবাস (রা), হাসান বাসরী, ইবনে সৈরীন ও রুবাঈ' ইবনে আনাস প্রমুখ ফকীহগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে সুদ খাবে তাকে তাওবা করতে বাধ্য করা হবে। আর যদি সে তাতে বিরত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। অন্য ফকীহদের মতে, এহেন ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখাই যথেষ্ট। সুদ খাওয়া পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত তাকে কারারূপে করে রাখতে হবে।

৩২৪. এই আয়াতটি থেকে শরীয়াতের এই বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি খণ্ড পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে ইসলামী আদালত তার খণ্ডাতাদের বাধ্য করবে, যাতে তারা তাকে 'সময়' দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে লোকসান হতে থাকে। তার উপর দেনার বোঝা অনেক বেশী বেড়ে যায়। ব্যাপারটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গড়ায়। তিনি লোকদের কাছে এই ব্যক্তিকে সাহায্য করার আবেদন জানান। অনেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দান করে কিন্তু এরপরও তার দেনা পরিশোধ হয় না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খণ্ডাতাদের বলেন, যা কিছু তোমরা পেয়েছো তাই নিয়ে তাকে রেহাই দাও। এর বেশী তার কাছ থেকে তোমাদের জন্য আদায় করিয়ে দেয়া সত্ত্ব নয়। ফকীহগণ এ ব্যাপারে সূপ্তি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক ব্যক্তির থাকার ঘর, থাবার বাসনপত্র, পরার কাপড়-চোপড় এবং যেসব যত্নপাতি দিয়ে সে রুজি-রোজগার করে, সেগুলো কোন অবস্থাতেই ফ্রেক করা যেতে পারে না।

يَا يَهُوَ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِذَا تَدَّأَنْتَ مِنْ بَلَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسْمَى فَإِكْتُبُوهُ  
 وَلِيَكْتُبَ بَيْنَ كِبَرٍ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
 يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلِيَكْتُبْ هُوَ وَلِيَمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 وَلِيَتَقِنَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
 الْحَقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يَمْلِلَ هُوَ فَلِيَمْلِلَ وَلِيَهُ  
 بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشِهِنَّ وَإِشْهِدْ بَيْنِ مِنْ رِجَالِ الْكَرْمِ

৩৯ রুক্ত

হে ইমানদারগণ! যখন কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা প্রস্পরের মধ্যে ঝণের লেনদেন করো ৩২৫ তখন লিখে রাখো ৩২৬ উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে এক ব্যক্তি দলীল লিখে দেবে। আল্লাহ যাকে লেখাপড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন তার লিখতে অঙ্গীকার করা উচিত নয়। সে লিখবে এবং লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার ওপর খণ্ড চাপছে (অর্থাৎ ঝণগ্রহীতা)। তার রব আল্লাহকে তার ভয় করা উচিত। যে বিষয় হিসেবে হয়েছে তার থেকে যেন কোন কিছু কম বেশি না করা হয়। কিন্তু ঝণগ্রহীতা যদি বৃদ্ধিহীন বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে। তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে ৩২৭ দুই ব্যক্তিকে তার স্বাক্ষৰ রাখো।

৩২৫. এখান থেকে এ বিধান পাওয়া যায় যে, ঝণের ব্যাপারে সময়সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

৩২৬. সাধারণত বঙ্গ-বাঙ্কির ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঝণের লেন-দেনের ব্যাপারে দলীল বা প্রমাণপত্র লেখাকে এবং সাক্ষী রাখাকে দৃশ্যীয় ও আস্থাহীনতার প্রকাশ মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর বাণী হচ্ছে এই যে, খণ্ড ও ব্যবসায় সংক্রান্ত লেন-দেনের চুক্তি সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ লিখিত আকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত। এর ফলে লোকদের মধ্যে লেনদেন পরিকার থাকবে। হাদীসে বলা হয়েছে : তিনি ধরনের লোক আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে কিন্তু তাদের ফরিয়াদ শোনা হয় না। এক, যার স্তৰী অসচরিত্র কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না। দুই, এতিমের বালেগ হবার আগে যে ব্যক্তি তার সম্পদ তার

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأٌ تِنْ مِنْ تِرْضُونَ مِنَ  
الشَّهَدَاءِ أَنْ تَفْصِلَ أَحَدَهُمَا فَتَلْ كِرَاحِلَ بَهْمَا الْأَخْرَى وَلَا يَأْبَ  
الشَّهَدَاءِ إِذَا مَادُعُوا وَلَا تَسْئُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا  
إِلَى أَجْلِهِ مَذِكْرًا قَسْطٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا  
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدْبِرُ وَنَهَا يَنْكِرُ فَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَأْتُمْ وَلَا يَضَارَ  
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتْقُوا اللَّهَ  
وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ رَوَاهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ

আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভূলে গেলে অন্যজন তাকে অরণ করিয়ে দেবে। এসব সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হতে হবে যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়। ৩২৮ সাক্ষীদেরকে সাক্ষ দেবার জন্য বললে তারা যেন অবৈকার না করে। ব্যাপার ছোট হোক বা বড়, সময়সীমা নির্ধারণ সহকারে দলীল নেখাবার ব্যাপারে তোমরা গড়িমসি করো না। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এই পদ্ধতি অধিকতর ন্যায়সংগত, এর সাহায্যে সাক্ষ প্রতিষ্ঠা বেশী সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিখ হবার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে যেসব ব্যবসায়িক লেনদেন তোমরা পরম্পরের মধ্যে হাতে হাতে করে ধাকো, সেগুলো না নিখলে কোন ক্ষতি নেই। ৩২৯ কিন্তু ব্যবসায়িক বিষয়গুলো স্থিরীকৃত করার সময় সাক্ষী রাখো। লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দিয়ো না। ৩৩০ এমনটি করলে গোনাহের কাজ করবে। আল্লাহর গবেষণার মধ্যে আত্মরক্ষা করো। তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন।

হাতে সোপান করে দেয়। তিনি, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের অর্থ খণ্ড দেয় এবং তাতে কাউকে সাক্ষী রাখে না।

وَإِنْ كَنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرْهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 أَمِنْ بعْضُكُمْ بعْضًا فَلِيُؤْدِي الَّذِي أُوتُنَ آمَانَتَهُ وَلَيُتَقَّى اللَّهُ  
 رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثْرَ قَلْبَهُ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ﴿٦٧﴾

যদি তোমরা সফরে থাকো এবং এ অবস্থায় দলীল লেখার জন্য কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধক রেখে কাজ সম্পন্ন করো। ৩২১ যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি অন্যের ওপর ভরসা করে তার সাথে কোন কাজ কারবার করে, তাহলে যার ওপর ভরসা করা হয়েছে সে যেন তার আমানত যথাযথরূপে আদায় করে এবং নিজের রব আগ্নাহকে ভয় করে। আর সাক্ষ কোনক্রমেই গোপন করো না। ৩২২ যে ব্যক্তি সাক্ষ গোপন করে তার হৃদয় গোনাহর সংস্পর্শে কল্পিত। আর আগ্নাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বেখবর নন।

৩২৩. অর্থাৎ মুসলিম পুরুষদের মধ্য থেকে। এ থেকে জানা যায়, যেখানে সাক্ষী রাখা ইচ্ছাধীন সেখানে মুসলমানরা কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে সাক্ষী বানাবে। তবে অমুসলিমদের সাক্ষী অমুসলিমরা হতে পারে।

৩২৪. এর অর্থ হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হবার যোগ্য নয়। বরং এমন সব লোককে সাক্ষী করতে হবে যারা নিজেদের নেতৃত্ব ও বিশৃঙ্খলার কারণে সাধারণতাবে লোকদের মধ্যে নির্ভরশীল বলে বিবেচিত।

৩২৫. এর অর্থ হচ্ছে, যদিও নিয়দিনের কেনা-বেচার ক্ষেত্রে লেনদেনের বিষয়টি লিখিত থাকা ভালো, যেমন আজকাল ক্যাশমেমো লেখার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তবুও এমনটি করা অপরিহার্য নয়। অনুরূপভাবে প্রতিবেশী ব্যবসায়ীরা পরস্পরের মধ্যে রাত দিন যেসব লেনদেন করতে থাকে, সেগুলোও লিখিত আকারে না থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

৩২৬. এর এক অর্থ এও হয় যে, কোন দলীল বা প্রমাণপত্র লেখার বা তাতে সাক্ষী থাকার জন্য কোন ব্যক্তির ওপর জোর খাটানো যাবে না এবং তাকে বাধ্য করা হবে না। আবার এ অর্থও হয় যে, কোন পক্ষ তার স্বার্থ বিরোধী সঠিক সাক্ষ্য দেয়ার কারণে যেন লেখক বা সাক্ষীকে কষ্ট না দেয়।

৩২৭. এর অর্থ এই নয় যে, বন্ধকের ব্যাপারটা কেবলমাত্র সফরেই হতে পারে। বরং এ অবস্থাটা যেহেতু বেশীর ভাগ সফরেই দেখা দেয়, তাই বিশেষ করে এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বন্ধকের ব্যাপারে এ শর্তও এখানে লাগানো হয়নি যে, দলীল লেখা সভ্য না হলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বন্ধকের আশ্রয় নেয়া যায়। এ ছাড়া এর আর একটি

لِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَبْدِلْ وَمَا فِي أَنفُسِكُمْ  
أَوْ تُخْفِوهُ يَحْسَبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُرُ لَمَن يَشَاءُ وَيَعْلَمُ بِمَن  
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلِئَكَتِهِ  
وَكُتُبِهِ وَرَسُلِهِ لَا نَفِقْ بَيْنَ أَهْلِ مِنْ رَسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا  
وَأَطْعَنَا فِي غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمِصِيرُ ﴿٥﴾

৪০ রুক্ত

আকাশসমূহে ৩৩৩ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর /৩৩৪ তোমরা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করো বা লুকিয়ে রাখো, আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের কাছ থেকে তার হিসেব নেবেন /৩৩৫ তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, এটা তাঁর ইখতিয়ারাধীন। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তি খাটোবার অধিকারী /৩৩৬

রসূল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যে হিদায়াত নাখিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যেসব লোক এই রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও এই হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছেঃ ‘আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা করিন্না। আমরা নির্দেশ ওনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু ! আমরা তোমার কাছে গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদের তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে /৩৩৭

পদ্ধতিও হতে পারে। নিছক দলীলের ওপর নির্ভর করে টাকা ধার দিতে কেউ রাজী না হলে ঝণগ্রহীতা নিজের কোন জিনিস বক্ষক রেখে টাকা ধার নেবে। কিছু কুরআন মজীদ তার অনুসারীদের দানশীলতা ও মহানুভবতার শিক্ষা দিতে চায়। আর এক ব্যক্তি ধন-সম্পদের অধিকারী হবার পর কাউকে কোন জিনিস বক্ষক না রেখে তার প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ তাকে ধার দিতে রাজী হবে না, এটা তার উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিপন্থী। তাই কুরআন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির উল্লেখ করেন।

এ প্রসংগে একথাও জেনে রাখা উচিত যে, বন্ধক রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঋণদাতা তার ঋণ ফেরত পাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। নিজের ঋণ বাবদ প্রদণ অর্থের বিনিময়ে প্রাণ বন্ধকী জিনিস থেকে কোন প্রকার লাভবান হবার অধিকার তার নেই। যদি কোন ব্যক্তি বন্ধকী গৃহে নিজে বাস করে বা তার ভাড়া খায়, তাহলে আসলে সে সুদ খায়। ঋণ বাবদ প্রদণ টাকার সরাসরি সুদ গ্রহণ করা ও বন্ধকী জিনিস থেকে লাভবান হবার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। তবে যদি কোন পশু বন্ধক রাখা হয় তাহলে তার দুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং তাকে আরোহণ ও মাল পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ বন্ধক গ্রহণকারী পশুকে যে খাদ্য দেয়, এটা আসলে তার বিনিময়।

৩৩২. সাক্ষ দিতে না চাওয়া এবং সাক্ষে সত্য ঘটনা প্রকাশে বিরত থাকা উভয়টিই 'সাক্ষ গোপন' করার আওতায় পড়ে।

৩৩৩. এখানে তায়ণ সমাপ্ত করা হয়েছে। তাই দীনের মৌলিক শিক্ষাগুলোর বর্ণনার মাধ্যমে যেমন সূরার সূচনা করা হয়েছিল ঠিক তেমনি যে সমস্ত মৌলিক বিষয়ের ওপর দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সূরার সমাপ্তি প্রসংগে সেগুলোও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য সূরার প্রথম রুক্ক'টি সামনে রাখলে বিষয়বস্তু বুঝতে বেশী সাহায্য করবে বলে মনে করি।

৩৩৪. এটি হচ্ছে দীনের প্রথম বুনিয়াদ। আল্লাহ এই পৃথিবী ও আকাশসমূহের মালিক এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁর একক মালিকানাধীন, প্রকৃতপক্ষে এই মৌলিক সত্যের ভিত্তিতেই মানুষের জন্য আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কর্মপদ্ধতি বৈধ ও সঠিক হতে পারে না।

৩৩৫. এই বাক্যটিতে আরো দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর কাছে দায়ি হবে এবং এককভাবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুই, পৃথিবী ও আকাশের যে একচ্ছত্র অধিপতির কাছে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জন্য রাখেন। এমনকি লোকদের গোপন সংকল্প এবং তাদের মনের সংগোপনে যেসব চিত্ত জাগে সেগুলোও তাঁর কাছে অপ্রকাশ নেই।

৩৩৬. এটি আল্লাহর অবাধ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর ওপর কোন আইনের বাধন নেই। কোন বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার ও মাফ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

৩৩৭. বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এই আয়তে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে : আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে ও তার কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া, তাঁর রসূলদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য সূচিত না করে (অর্থাৎ কাউকে মেনে নেয়া আর কাউকে না মেনে নেয়া)। তাদেরকে স্বীকার করে নেয়া এবং সবশেষে আমাদের তাঁর সামনে হায়ির হতে হবে, এ বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া। এ পাঁচটি বিষয় ইসলামের বুনিয়াদী আকীদার অন্তরভুক্ত। এই আকীদাগুলো মেনে নেয়ার পর একজন মুসলমানের জন্য নিম্নোক্ত কর্মপদ্ধতিই সঠিক

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتْ رَبَّنَا  
لَا تَؤَاخِذْنَا إِنَّ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا إِصْرًا كَمَا  
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
لَنَا بِهِ وَاعْفْ عَنَّا دُنْ وَأَغْفِرْ لَنَا دُنْ وَارْحَمْنَا دُنْ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْكُفَّارِينَ

আল্লাহর কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোৰা চাপান না। ৩৩৮  
প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে  
গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলণ তারই ওপর বর্তাবে। ৩৩৯

(হে ইমানদারগণ, তোমরা এভাবে দোয়া চাও !) হে আমাদের রব!  
তুল-ভাস্তিতে আমরা যেসব গোনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না।  
হে প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোৰা চাপিয়ে দিয়ো না, যা তুমি আমাদের  
পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। ৩৪০ হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোৰা  
বহন করার সামর্থ আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। ৩৪১  
আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি  
করুণা করো। তুমি আমাদের অভিভাবক! কাফেরদের মোকাবিলায় তুমি আমাদের  
সাহায্য করো। ৩৪২

হতে পারে : আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশগুলো আসবে সেগুলোকে সে মাথা পেতে  
গ্রহণ করে নেবে, সেগুলোর আনুগত্য করবে এবং নিজের ভালো কাজের জন্য অহংকার  
করে বেড়াবে না বরং আল্লাহর কাছে অবনত হতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

৩৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের সামর্থ অনুযায়ী তার দায়িত্ব বিবেচিত হয়।  
মানুষ কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখে না অথচ আল্লাহ তাকে সে কাজটি না করার জন্য  
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এমনটি কখনো হবে না। অথবা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ বা জিনিস  
থেকে দূরে থাকার সামর্থই মানুষের ছিল না, সে ক্ষেত্রে তাতে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য  
আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে,  
নিজের শক্তি-সামর্থ আছে কিনা, এ সম্পর্কে মানুষ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।  
প্রকৃতপক্ষে মানুষের কিসের শক্তি-সামর্থ ছিল আর কিসের ছিল না—এ সিদ্ধান্ত একমাত্র  
আল্লাহ গ্রহণ করতে পারেন।

৩৩৯. এটি আল্লাহ প্রদত্ত মানবিক ইখতিয়ার বিধির ছিতীয় মূলনীতি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে কাজ করেছে তার পুরস্কার পাবে। একজনের কাজের পুরস্কার অন্যজন পাবে, এটা কথনো: সম্ভব নয়। অনুরূপতাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে দোষ করেছে সে জন্য পাকড়াও হবে। একজন দোষ করবে আর অন্যজন পাকড়াও হবে, এটা কথনো সম্ভব নয়। তবে এটা সম্ভব, এক ব্যক্তি কোন সৎকাজের ভিত্তি রাখলো এবং দুনিয়ায় হাজার বছর পর্যন্ত তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো, এ ক্ষেত্রে এগুলো সব তার আমলনামায় লেখা হবে। আবার অন্য এক ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের ভিত্তি রাখলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত দুনিয়ায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো। এ অবস্থায় এগুলোর গোনাহ ঐ প্রথম জালেমের আমলনামায় লেখা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ যা কিছু ফল হবে, সবই হবে মানুষের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলক্ষণি। মোটকথা যে ভালো বা মন্দ কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা, সংকল্প, প্রচেষ্টা ও সাধনার কোন অংশই নেই, তার শাস্তি বা পুরস্কার সে পাবে, এটা কোনক্রিয়েই সম্ভব নয়। কর্মফল হস্তান্তর হওয়ার মতো জিনিস নয়।

৩৪০. অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীরা তোমার পথে চলতে গিয়ে যেসব পরীক্ষা, তয়াবহ বিপদ, দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হয়, তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। যদিও আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করার সংকল্প করেছে, তাকেই তিনি কঠিন পরীক্ষা ও সংকটের সাগরে নিষ্কেপ করেছেন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মু'মিনের কাজই হচ্ছে, পূর্ণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করা, তবুও মু'মিনকে আল্লাহর কাছে এই দোয়াই করতে হবে যে, তিনি যেন তার জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা সহজ করে দেন।

৩৪১. অর্থাৎ সমস্যা ও সংকটের এমন বোরা আমাদের উপর চাপাও, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যে পরীক্ষায় পুরোপুরি উন্নীণ হবার ক্ষমতা আমাদের আয়তৃধীন তেজনি পরীক্ষায় আমাদের নিষ্কেপ করো। আমাদের সহ্য ক্ষমতার বেশী দুঃখ-কষ্ট-বিপদ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ো না। তাহলে আমরা সত্য পথ থেকে বিচ্ছুত হয়ে যাবো।

৩৪২. এই দোয়াটির পূর্ণ প্রাণসত্তা অনুধাবন করার জন্য এর নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটটি সামনে রাখতে হবে। হিজরাতের প্রায় এক বছর আগে মি'রাজের সময় এ আয়তটি নাযিল হয়েছিল। তখন মুক্তায় ইসলাম ও কুফরের লড়াই চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। মুসলমানদের মাথায় বিপদ ও সংকটের পাহাড় তেজে পড়েছিল। কেবল মকাতেই নয়, আর বৃ-ঘণ্টের কোথাও এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে কোন ব্যক্তি দীন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার জন্য আল্লাহর যমীনে, বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েনি। এ অবস্থায় মুসলমানদের আল্লাহর কাছে ভাবে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হলো। দানকারী নিজেই যখন চাওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেন তখন তা পাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই এই দোয়া সেদিন মুসলমানদের জন্য অসাধারণ মানসিক নিচন্ততার কারণ হয়। এ ছাড়াও এই দোয়ায় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে কখনো অসংগত ও অনুপযোগী ধারায় প্রবাহিত করো না বরং সেগুলোকে এই দোয়ার ছাঁচে ঢালাই করো। একদিকে নিষ্ক সত্যানুসারিতা ও সত্যের প্রতি সমর্থন দানের

কারণে লোকদের উপর যেসব হৃদয় বিদ্যারক ভুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে শক্তদের বিরুদ্ধে সামান্য তিক্ততার নামগঙ্কও নেই। একদিকে এই সত্যানুসারীরা যেসব শারীরিক দুর্ভোগ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে পার্থিব বার্তার সামান্য প্রত্যাশাও নেই, একদিকে সত্যানুসারীদের চরম দুরবস্থা দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়ায় উৎসাহিত উন্নত ও পবিত্র আবেগ—উদ্দীপনা দেখুন। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সে সময় ইমানদারদের কোন্ ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন দেয়া হচ্ছিল, তা সঠিক ও নির্ভুলভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

---